মানব সমাজ

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

(মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ত্রিপিটকাচার্য)

অনুবাদক

সুবোধ চৌধুরী

স্বপন প্রকাশনী

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

৭বি, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৯

নতুন সংস্করণ

বৈশাখ ১৩৬৫

ভারতী বুক স্টল ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীহৃষীকেশ বারিক
কর্তৃক প্রকাশিত ও ২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস
হইতে জি. পাল কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

মানব সমাজের বিকাশ

মানবের উদ্ভব

বন্য মানব সমাজ

বর্বর মানব সমাজ

জনযুগ

সভ্য মানব সমাজ (১)

সভ্য মানব সমাজ (২)

সামন্তবাদী যুগ

সভ্য মানব সমাজ (৩)

পুঁজিবাদী যুগ

প্রথম অধ্যায়

মানব সমাজের বিকাশ

মানবের উদ্ভব

এক সময়ে পৃথিবী জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড ছিল, তাহাতে অণু বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিত; কিন্তু অণুরাশি ক্রমে পরস্পরের নিকটে আসিল, ফলে অণুগুচ্ছের সৃষ্টি হইল। ধীরে ধীরে জীবনাণু* জন্মলাভ করিল এবং পনীরের মত কোমল অস্থিবিহীন প্রাণীরা† আবির্ভাব ঘটিল। প্রকৃতি হইতে প্রত্যক্ষভাবে আহার গ্রহণ করিয়া স্থাবর বনস্পতির দল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির একাত্মতামুক্ত জঙ্গম প্রাণীরও সৃষ্টি হইল। ইহারা জলচারী মৎস্য-মীনের যুগ পার হইয়া আসিল; কেহবা আবার জল-স্থল—উভচরের রূপ নিল; কেহ নূতন করিয়া আকাশের পথ ধরিল এবং কেহ আদিম স্থলভূমিতেই বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। ক্রমে ইহাদের কণ্ঠ হইতে ধ্বনি নির্গত হইল; এবং ধীরে ধীরে স্তনধারী জীবের উদ্ভব হইল। তখন বানর হইতে বনমানুষ এবং পরে বনমানুষ হইতে আধামানুষ, অর্থাৎ নরবানব আসিয়া দ্বিপদ বংশের সংখ্যা বাড়াইল।

বিকাশ পথে ইহাদেরই কয়েকটি গুচ্ছ বা জোড়া জাতি পরিবর্তনের‡ স্তরে পৌঁছিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই কয়টি নরবানরই মানববংশের আদি জনয়িতা। সময় নিরূপণ করিতে গেলে ইহাদের কাল বিশ লক্ষ বৎসরের কম হইবে না। আজ হইতে দশ লক্ষ বৎসর আগে মানুষকে অস্ত্রধারী দেখা যাইতেছে এবং তাহার পাঁচ লক্ষ বৎসর পরে আমাদের পূর্বজ সেপিয়ন মানবের§ পরিচয় মিলিতেছে।

১। মানব সমাজ

মানুষের প্রারম্ভিক বিকাশ খুব মন্থর ছিল; কিন্তু তখনকার অবস্থায় ঐ বিকাশেরই যথেষ্ট মূল্য আছে। মানুষের হাত, মাথা এবং বাক্‌ক্ষমতার বিকাশ দেখিয়া আজ তাহাকে পশু হইতে স্বতন্ত্র জীব বলিয়া ঘোষণা করি। কিন্তু, আদিমানব হইতে এখন পর্যন্ত এত আশ্চর্য পরিবর্তনের কারণ কি? বিকাশসিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিবেন, চেষ্টা অর্থাৎ জীবের বাঁচিবার চেষ্টাই তাহার বিকাশের প্রধান সহায়ক। কিন্তু, এই চেষ্টা প্রকৃত পক্ষে শ্রম; তাই বলিতে পারি, শ্রমই

---

* Virus, Bacteria; † Amœba; ‡ Mutation; § Sapien.

মানুষের বিকাশ সম্পাদন করিয়াছে; তবে ইহাও সত্য, তাহা প্রকৃতির সহায়তা ছাড়া সম্ভব হয় নাই।

ভূগর্ভ শাস্ত্রীর কথিত তৃতীয়কাল* কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বে অতীত হইয়াছে। ইহার যুগান্ত সময়ে বনমানুষের একটি বিকশিত জাতি পৃথিবীর কোন মহাদ্বীপে বাস করিত। এই মহাদ্বীপ ভারত মহাসাগরের কোন অধুনালুপ্ত ভূভাগও হইতে পারে। ইহার অধিবাসীরা মানব জাতির পূর্বজ। ইহাদের সকল শরীর লোমে আবৃত থাকিত; ইহাদের কানের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ছিল এবং যূথবদ্ধ হইয়া ইহারা বৃক্ষের শাখায় বসবাস করিত। বৃক্ষবাসের ফলে তাহাদের হাত তখন নূতন কর্মশক্তি লাভ করে; সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পা হইতে হাতের কর্মগত বিভিন্নতারও সৃষ্টি হয়। গাছ হইতে ফল পাড়া, গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরা এবং এইরূপ অন্যান্য কাজে নিযুক্ত থাকিয়া হাত শরীর বহনের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া যায়। এখন সমতল ভূমিতে চলিবার সময় ইহারা হাত উঁচাইয়া, শুধু পায়ের উপর ভর দিয়াই চলিতে থাকে; টাল সামলাইবার জন্য কাঁধ দুইটিকেও আরও সোজা করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। বনমানুষের মানুষ হওয়ার মধ্যে হাতের মুক্তি আর কাঁধ সোজা রাখার চেষ্টা—এই দুইটি কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আজকালের বনমানুষও কাঁধ উঁচু করিয়া দাঁড়ায়; হাতে ভর না করিয়া শুধু পায়ের জোরেই চলিতে পারে; তবুও তাহার চলন মানুষের মত এত আয়াস-হীন হয় না। শরীরের ভার সামলাইবার কাজ হইতে মুক্ত হইয়া হাত অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হইতে থাকে। বনমানুষের মধ্যেও হাত ও পায়ের কাজের পার্থক্য আছে। গাছে চড়িবার সময় ইহারা হাত ও হাতের আঙুল দিয়া গাছ আঁকড়াইয়া ধরে—পিছনের পা দুইটিতে সত্যই এই কাজ হয় না। হাতের সাহায্যে বনমানুষ গাছের ফল ছিঁড়িয়া লয়, হাত দিয়া আহৃত বস্তু একস্থানে স্তূপীকৃত করে,—পিছনের পা দিয়া ইহার কিছুই হইতে পারে না। কোন কোন জাতির বানর হাত দিয়া গাছের উপর ঝুপড়ির মত বাসা তৈয়ার করে; শিম্পাজী রৌদ্র, বৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্য গাছের ডালে ছাদ বানাইয়া লয়। প্রয়োজন হইলে হাতে ডাণ্ডা লইয়া সে শত্রুর মুখামুখিও হইতে পারে; হাতে ফল বা পাথর ছুঁড়িয়া মারার অভ্যাসও তাহার আছে। তবু মানুষের হাতের সঙ্গে বনমানুষের তুলনা হয় না; মানুষের হাতের নিপুণতা হাজার হাজার বৎসরের পরিশ্রমের ফল। বনমানুষ এবং মানুষের হাতের শিরা, জোড়া বা হাড়ে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; তবু বিকাশের প্রথম স্তরের মানুষের হাতও বনমানুষের চেয়ে অনেকগুণ কুশলী। আজ পর্যন্ত বনমানুষ পাথরের কোন তুচ্ছতম অস্ত্রও তৈয়ার করিতে পারে নাই।

* **Tertiary Period.**

বনমানুষের মানুষে রূপান্তর আরম্ভ হইবার আগে লক্ষ বৎসর ধরিয়া জীব-প্রগতি বড় ধীর গতিতে চলিতেছিল—আজ ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই। চকমকি পাথর দিয়া মানু যেদিন প্রথম অস্ত্র তৈয়ার করিয়াছিল, তাহাও আজ হইতে খুব কাছের কথা নহে ;—আমাদের ঐতিহাসিক সময় হইতে ইহা বহু যুগ পূর্বের। তবে কথা এই, হাত যখন একবার মুক্ত হইয়াছে, তখন আর কোন বাধা নাই ; মানুষ হাতের সাহায্যে এখন অস্ত্র তৈয়ার করিতে পারে, সৌধ গড়িতে পারে, সেতার বাজাইতে পারে, দরকার হইলে টাইপরাইটারও চালাইতে পারে।

(১) **শ্রমই বিধাতা**—হাত যে শুধু শ্রমের হাতিয়ার এমন বলিতে পারি না ; হাত বস্তুতপক্ষে শ্রমের উপজ, শ্রমই ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে। হাতের নিত্য নূতন ব্যবহারে তাহাতে নূতন পেশী ও শিরা গঠিত হইয়াছে, ক্রমে হাড়ের উপর ইহাদের প্রভাব পড়িয়াছে ; সেই প্রভাব আবার আনুবংশিক হইয়া পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে। বংশলব্ধ প্রভাব পরে হাতের আরও নূতন নূতন ব্যবহার আয়ত্ত করিয়াছে। এইভাবে মানুষের হাত আজ হাজার কাজের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে ; অজন্তার চিত্রকলায়, গুপ্ত কালের মূর্তিশিল্পে, কিংবা তানসেন বা বৈজু বাবরের সপ্ততন্ত্রী স্বরে মানুষের কুশলী হাত সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু হাত শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন কোন পদার্থ নয় ; ইহা শরীর-যন্ত্রেরই একটি অঙ্গ। সমগ্র শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকিলে শুধু হাতের বিকাশে বিশেষ কোন লাভ হইত না। শরীরের এক অংশ অপর অংশকে প্রভাবিত করে। স্তনধারী জীব ডিম্ব প্রসব করে না ; তাই ডিম্বাণুর বৃদ্ধি ও পরিপাকের জন্য তাহাদের গর্ভাশয় থাকে ; আবার প্রসবান্তে স্বাভাবিক ভাবেই স্তনধারিণীর স্তনে দুধেরও সঞ্চার হয়। নীলচোখ বিড়ালের শরীর সাদা হইলে তাহারা বধির হয় ; অর্থাৎ অপর অবয়বের প্রভাবে তাহার শ্রবণ শক্তির বিকাশে বাধা পড়ে। এইভাবে মানুষের হাতের বিকাশে তাহার অন্যান্য অঙ্গও প্রভাবিত হয়।

সমাজ—হাতের শ্রমশক্তি বিকাশ পাইবার পর প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব বাড়িয়া চলে। ইহাতে তাহার প্রগতিরও পথ খুলিয়া যায়। মানুষ এখন হাত এবং হাতের শ্রমের নিত্য নূতন ব্যবহার আয়ত্ত করে ; সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন প্রাকৃতিক বস্তুর ব্যবহারও তাহার আয়ত্ত হয়। শ্রম-বিকাশের মূল প্রেরণা ছিল—বস্তুর অধিকতর অর্জন এবং তাহার অধিক উপযোগ বা ব্যবহার। এই কাজে অধিক ব্যক্তির সহযোগ এবং তাহাদের সহভোগেরও প্রয়োজন ছিল। হাত মুক্ত হইবার পর মানুষ তাহার শ্রমের উপযোগিতা বুঝিতে পারে,—তখন

হাজার নূতন কাজে এই শক্তিকে নিয়োজিত করা হয়। ঠিক এইভাবে, সহযোগের সুবিধা বুঝিবার পর মানুষও তাহাকে আর ছাড়িতে পারে নাই—দিন দিন এই সহযোগিতাকে তাহারা বাড়াইয়া তুলিতেই চেষ্টা করিয়াছে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কোন সাজানো গুছানো সমাজের কর্তা হইয়া বসে নাই। প্রকৃতিকে পরাজিত করিয়া ভোগ উৎপাদনের জন্য তাহাকে শ্রম করিতে হইয়াছে, আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতে হইয়াছে এবং এই শ্রমে ও সংগ্রামে সর্বদা সহযোগিতারও প্রয়োজন হইয়াছে। এইভাবের সহযোগী শ্রমে ও সংগ্রামে মানুষের মুক্ত হাতের শক্তি আরও বাড়িয়া গিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ইহা হইতেই সে সমাজ-সৃষ্টির প্রেরণা পাইয়াছে।

(২) **ভাষার উৎপত্তি**—সমাজবদ্ধ হইবার পর মানুষ তাহার মনের ভাব অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে চাহিল। ইহার ফলে তাহার উচ্চারিত ধ্বনির সংখ্যা বাড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিযন্ত্রেরও পরিবর্তন আরম্ভ হইল। বায়ুনাড়ীর ঝিল্লিতে এইবার বহু নূতন জটিলতা দেখা দিল ; আর জিহ্বা এবং মখবিবরও পূর্বের তুলনায় বহুগুণ সংস্কৃত হইয়া গেল। তারপর ধ্বনি ছাড়িয়া মানুষ রীতিমত বর্ণ উচ্চারণ করিতে শিখিল। মানুষের শ্রমের দান যেমন সমাজ, তেমনি সমাজের দান হইল ভাষা। পশু অবশ্য আমাদের ভাষা বলিতে পারে না ; কারণ পশুর নিকট বিকশিত শব্দযন্ত্র নাই। কিন্তু মানুষের সমাজে আসিলে পশুও মানুষের শব্দ চিনিতে পারে। পালিত হাতী, ঘোড়া, কুকুর মানুষের শব্দের ইঙ্গিতে কাজ করে। কুকুর যে অঞ্চলের অধিবাসীর কাছে থাকে, ঠিক সেই অঞ্চলের ভাষায় সে সাড়া দেয়। মানুষের সমাজে আসিয়া পশুর স্নেহ, ভক্তির মানও উন্নত হয়। অনেকক্ষণ পর মালিকের দেখা পাইলে কুকুর চমৎকার হর্ষসূচক ধ্বনি করে ;—ইহাতে মনে হয়, তাহার ধ্বনিযন্ত্র উন্নত হইলে মনের ভাব সে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারিত। প্রাণীর মধ্যে পাখীর ধ্বনিযন্ত্র মানুষের ঠিক পরেই স্থান পায়। ইহাদের কাকলি মানুষের আনন্দের বস্তু ; কিন্তু তোতা, ময়না প্রভৃতির ধ্বনিযন্ত্র আরও বিশেষরূপে উন্নত ; মানুষের বহু শব্দ ইহারা পরিষ্কার উচ্চারণ করে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, পাখী শব্দের অর্থ না বুঝিয়া শুধু মানুষের ধ্বনিটুকু শিখিয়া লয়। তাই তোতা নিজের খুশিমত যখন তখন তাহার শেখা-বুলি আওড়াইয়া যায়। এইজন্য শিক্ষা দিলেও যে পাখী কোন শব্দের অর্থ বুঝে না এমন নয়। পাখী তাহার নিজের ক্ষমতামত শব্দের অর্থও বুঝিতে পারে। তোতাকে গালি শিখাইবার সময় এমন ভাবে শিখান, যাহাতে রাগ হইলে এই কথা বলিতে হয়, ইহা তোতা বুঝিতে পারে। একদিন কোন উপায়ে উহাকে বিরক্ত করুন ; দেখিবেন, পাখী ঠিক

জায়গায় তাহার শেখা-বুলি আওড়াইতেছে। তোতাকে প্রথমে 'খেতে দাও' খেতে দাও' বলিতে শিখান; পরে খাবার দিবার সময় কিছুদিন ঐ কথা বলিয়া যান; দেখিবেন, খাইতে হইলে এই বাক্যই যে সর্বাপেক্ষা উপযোগী, তাহা তোতা বুঝিয়া যাইবে এবং পরে ক্ষুধা পাইলে 'খেতে দাও' বলিয়া আপনার নিকট খাদ্য যাজ্ঞাও করিবে।

(৩) **মস্তিষ্ক-বিকাশ**—প্রথমত হাত অর্থাৎ শ্রমের উদ্ভব হয়; আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌ক্ষমতা এবং শব্দধ্বনি বিকাশ লাভ করে। এই দুইটি বিকাশের ফল আবার মস্তিক বিকাশের সহায়ক হয়। মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশের সঙ্গে হাতের নিকট সম্বন্ধ আছে এবং অপর অংশের সঙ্গে কান ও ধ্বনিযন্ত্রের ঠিক সেইরূপ সম্পর্ক দেখা যায়। তাই মস্তিকের এক অংশের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্য অংশের বিকাশও অবশ্যম্ভাবী। বিকাশতত্ত্বের এই অবিচ্ছেদ্যতা ধরিতে পারিলে মানুষের ইন্দ্রিয়ের বিকাশ খুব সহজেই বোঝা যায়; যেমন ধ্বনির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণযন্ত্রের বিকাশ নিশ্চিত,—তখন উচ্চারণের সূক্ষ্ম তারতম্য, বর্ণমালার বিভেদ কিংবা তাহাদের আরোহ অবরোহ বুঝিতে আর কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিকাশ শুধু ইন্দ্রিয়মাত্রেই সীমিত নয়—ইন্দ্রিয় মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে, তাই ইন্দ্রিয়ের বিকাশে মস্তিষ্কও বিকাশপ্রাপ্ত হয়। শকুন মানুষ অপেক্ষা বহু বেশি দূর দেখিতে পায়; কিন্তু দৃষ্ট বস্তু সম্পর্কে গৃধ্রের জ্ঞান মানুষের তুলনায় নগণ্য। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি মানুষের চেয়ে তীক্ষ্ণ; কিন্তু আঘ্রাত বস্তুর জ্ঞান আবার মানুষের বেশি। ইহা হইতে বোঝা যায় মানুষের মস্তিষ্ক অন্যান্য জীবের তুলনায় অনেক বেশি বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। পিছনে তাকাইয়া এই বিকাশকে আমরা আর একবার লক্ষ্য করিয়া লইতে পারি। শরীর বহনের দায়িত্ব হইতে হাত একদিন মুক্তি পাইয়াছিল। শ্রমের জন্য হাতের মুক্তিকে এক কথায় সমগ্র প্রগতির মূল বলিতে পারি। মানুষের শ্রম এবং তাহাদের শ্রমগত সহযোগিতায় ভাষার সৃষ্টি হয়; তারপর শ্রম এবং ভাষা এই দুইটির প্রভাবে আবার মস্তিষ্ক এবং তৎসম্বন্ধী ইন্দ্রিয়েরও বিকাশ হয়; ইহার সঙ্গে সঙ্গে চেতনা, কল্পনা, নিশ্চয়শক্তি এবং মস্তিষ্কসঞ্জাত অন্যান্য গুণও আগের তুলনায় বাড়িয়া যায়। তখন সেই সফলতার আধারের উপর শ্রম ও ভাষা আবার নূতন করিয়া উন্নতির পথ পায়। তাই বনমানুষ মানুষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানব প্রগতি থামিয়া যায় নাই। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গতি ও মাত্রায় ইহা অব্যাহত রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে প্রতিকূল কারণের জন্য প্রগতি বাধাপ্রাপ্তও হইয়াছে; কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিতে এই বাধা যে সাময়িক এবং খুব তুচ্ছ তাহা বোঝা যায়। উপরে প্রগতির যে সব কারণ বলা হইল তাহা ছাড়া

আর একটি বিশেষ কারণও আছে : ইহা মানুষের মানুষ হওয়া অর্থাৎ সমাজবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা। সমাজজীবন আরম্ভ হইবার পর মানবপ্রগতিতে সামাজিক প্রভাব খুবই বেশি।

(৪) **বনমানুষ হইতে মানুষ**—পৃথিবীর আয়ুর মাপে* মানুষের উদ্ভব ও বিকাশের কয়েক লক্ষ বৎসর এক মুহূর্তের মত। এই সময় শাখাচারী বনমানুষের কয়টি যূথ মানুষে পরিবর্তিত হয়। আজ বনমানুষের যূথের সঙ্গে সমাজের যে প্রভেদ দেখা যায় তাহার কারণ শ্রম। বনমানুষ খাদ্যের জন্য দলবদ্ধ হইয়া বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত। ভৌগোলিক প্রতিকূলতা এবং পড়শীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা—এই দুইটি জিনিস তাহাদের নির্বাধ বিচরণের পক্ষে তখন বাধা ছিল। তবু খাদ্যের অভাব উপস্থিত হইলে নূতন চরভূমি দখল করা ছাড়া তাহাদের উপায় ছিল না। ইহাতে অন্যান্য যূথের সঙ্গে তাহাদের প্রায় সংঘর্ষ হইত। কিন্তু নূতন ভূমি দখল করিয়াও প্রকৃতি সেখানে যে পরিমাণ খাদ্য রাখিয়াছে শুধু ততটুকুই তাহারা ভোগ করিতে পারিত। ভূমিকে অধিক খাদ্য দিবার উপযোগী করিবার কৌশল তাহাদের জানা ছিল না। তবে মলমূত্রের দ্বারা তাহাদের অজ্ঞাতে কিছু ভূমি উর্বরা হইয়া থাকিলে তাহা স্বতন্ত্র কথা। এইভাবে সমস্ত সুলভ ভূমি অধিকারে আসার পর বানরের আর সংখ্যাবৃদ্ধি হইল না। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, বানর তাহার চরভূমিকে ফলদ করিতে জানিত না—তাই সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে বানর-সমাজে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিল। তখন ভূমি উর্বরা করা ত দূরের কথা—ভূমির ফলনশক্তি তাহারা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিল। চারিদিকের কাঁচা দানা ও উদ্গত অঙ্কুর এবং শস্য সমস্ত নিঃশেষে গ্রাস করিয়া বসিল। চতুর শিকারী তাহার শিকারক্ষেত্রের হরিণীকে বধ করে না; কারণ সে বুঝে—আগামী বৎসর এই হরিণী নূতন শিশুর জন্ম দিবে। কিন্তু চিতা বা নেকড়ের কবল হইতে হরিণীরও মুক্তি নাই; কারণ শিকারীর মত বাঘ ভবিষ্যতের চিন্তা করিতে পারে না। য়ুনানের শ্যামশোভাময় পাহাড় আজ নগ্ন হইয়া পড়িয়াছে;—য়ুনানী ছাগমেষের পাল কয়েক শতাব্দীতে তাহার সমস্ত শস্য শেষ করিয়া দিয়াছে; এমনকি ভবিষ্যৎ জননের জন্য বীজটুকুও আর অবশিষ্ট রাখে নাই।

এইভাবে পরিবেশ কখনও কখনও প্রাণীর জীবনধারণের প্রতিকূল হইয়া উঠে। জাতি পরিবর্তনের মধ্য দিয়া জীব তখন তাহার ভবিষ্যৎ বংশধরকে নূতন অবস্থায় বিন্যস্ত করিয়া দেয়। 'বিশ্বের রূপরেখা' গ্রন্থে আরসোলার অবস্থান্তর গ্রহণের বর্ণনা করিতে গিয়া পূর্বে ইহার কারণ বলিয়া আসিয়াছি।

* দুইশত কোটি বৎসর

নূতন অবস্থায় নূতন রাসায়নিক তত্ত্বের মিশ্রণ ও তাহার অনুপাতের উপর ইহা কি ভাবে নির্ভরশীল তাহাও সেখানে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সব কারণ এবং অবস্থাই বনমানুষকে মানুষে রূপান্তরিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। পরিবেশকে ব্যতিক্রম, খাদ্যবস্তুতে রাসায়নিক তত্ত্বের পরিবর্তন—ইহার কোনটাই কিন্তু মানুষের শ্রমের উপর নির্ভর করে নাই। মানুষের শ্রম—সে হাতিয়ারধারী হইবার পর হইতে পরিবর্তনের সহায়ক হইয়াছে। তাহার আদিম অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে পশু ও মৎস্য শিকারের উপকরণগুলিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহাদের দ্বারা সেই যুগের যুদ্ধবিগ্রহেরও কাজ চলিয়া যাইত। এই সব অস্ত্রের একটি বিশেষ ইঙ্গিত এই যে, মানুষ তখন ফলাহার ত্যাগ করিয়া মাংসভোজী হইয়াছে। মানববিকাশে এই মাংসাহারের গুরুত্ব অপরিসীম। মাংস মানুষের শরীরে বহু আবশ্যক নূতন পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার পরিপাকের জন্য মানুষের পাকস্থলীর পরিশ্রমও বাড়িয়া গিয়াছে। আর বনস্পতির স্বামী মানুষ এখন মাংসাহারের তাগিদে পশুরও স্বামী বনিয়াছে। মাংসাহারের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব পড়িল কিন্তু মস্তিষ্কের উপর। এই নূতন খাদ্যরস কেরাসিনের রাজ্যে পেট্রল লইয়া আসিল। মস্তিকের বিকাশে বহুপুরুষ ধরিয়া ইহার প্রভাব চলিল। এদিকে মাংসাহারে অভ্যস্ত হইয়া মানুষ নরভক্ষণে সিদ্ধ হইয়া উঠিল; এই প্রথা বহু জাতির মধ্যে এখনও একেবারে লোপ পাইয়া যায় নাই। কিন্তু মাংসাহারের দুইটি খুব বড় দান আছে—ইহা বনমানুষের বংশধর মানুষকে আগুনের নিকট পৌঁছাইয়াছে, এবং তাহাকে পশুপালনে মনোযোগী করিয়াছে। আগুনের সাহায্যে পাচনক্রিয়ার অনেকটা বাহির হইয়া যাওয়ায় পাকস্থলীর শ্রম বহু লাঘব হইয়াছে। অন্যদিকে পশুপালন শিকারের অনিশ্চিত সফলতার স্থানে একটি নিশ্চিত সাধন মানুষের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। ইহার ফলে শুধু মাংস নয়, দুধ এবং দুধের আনুষঙ্গিক অন্যান্য জিনিসও মানুষের জুটিয়া গিয়াছে।

এইভাবে মানুষ একদিকে তাহার চিন্তায় ও শ্রমে পরিবেশকে বদলাইয়া লইয়াছে, আবার অন্যদিকে পরিবেশও তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মানুষের প্রত্যেক সফলতাই প্রকৃতির উপর নূতন অধিকার—নূতন বিজয়। মানুষের জন্ম হইয়াছিল উষ্ণপ্রদেশে; কিন্তু আহার্যের খোঁজে তাহাকে শীতময় দেশে চলিয়া যাইতে হয়। সেখানকার জলবায়ু তখন তাহাকে আবাস ও পরিচ্ছদ নির্মাণে বাধ্য করে। এইভাবে শ্রমের নূতন পদ্ধতি স্তরে স্তরে মানুষকে পশু হইতে পৃথক করিয়া দেয়। ক্রমে হাত, ভাষা এবং মস্তিক —এই তিনটির সহযোগিতায় মানুষ জটিলতর কাজের উপযুক্ত হয়। আর ইহা

শুধু ব্যক্তিগত নয়, সমাজগতভাবেই মানুষ তাহার উচ্চ লক্ষ্যকে তখন সার্থক করিতে পারে। মানুষের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমপ্রণালী এইভাবেই বহুমুখী হইয়াছে এবং ক্রমেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। প্রসঙ্গান্তরে আমরা ইহার বিশদভাবে আলোচনা করিব; সেখানে দেখিব, ফল সঞ্চয়নের পর মানুষ শিকারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তারপর ইহার আনুষঙ্গিক ভাবে আসিয়াছে পশুপালন; এবং ইহার পর কৃষি, সীবন, বয়ন, ধাতুশিল্প এবং মৃৎশিল্প; ইহার পর আবার ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্পোদ্যোগ, এবং সর্বশেষে সায়েন্স বা বিজ্ঞান। দেখুন, মানুষের দুইটি মুক্ত হাত তাহাকে কোথা হইতে কোথায় পৌছাইয়া দিয়াছে।

এইরূপ আবার বনমানুষের যূথ হইতে মানব সমাজ; তারপর গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী হইতে রাষ্ট্র ও রাজা। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আইন এবং রাজনীতিও বিকাশ লাভ করিয়াছে; সঙ্গে মানব-মস্তিষ্কের অলীক কল্পনা ধর্মও আছে। এই কল্পনার সঙ্গে পাল্লা দিয়া প্রকৃতি, হাত, শ্রম, সমাজ সমস্তই পিছনে পড়িয়া যাইতেছে। অথচ ইহাদের সহায়তায়ই মানব-মন আজ সর্বেসর্বা। এখন তাহার সার্বভৌমত্বের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তুচ্ছ হাত যে একদিন তাহার গঠনে সাহায্য করিয়াছিল ইহা বুঝিবার উপায় নাই। এখন মন প্রথমেই সকল কাজের পরিকল্পনা ঠিক করিয়া রাখে; পরে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলিয়া তাহাকে কার্যরূপে পরিণত করে।

কিন্তু, মানুষ আর পশুতে পার্থক্য কি—এই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম। পশু প্রকৃতিকে ব্যবহার মাত্র করে,—পশু দ্বারা প্রকৃতিতে যে পবিবর্তন হয় তাহা শুধু পশুর উপস্থিতির জন্য। কিন্তু মানুষ প্রকৃতিকে বদলাইয়া লইয়া তাহাকে নিজের সেবক বানাইয়া লয়। এইভাবে মানুষ প্রকৃতির উপর স্বামীত্ব করে এবং এখানেই পশু হইতে তাহার পার্থক্য। এই পার্থক্যের মূল বিষয়টি অবশ্য শ্রম; শ্রমই মানুষকে পশু হইতে পৃথক করিয়াছে।

মানুষের বিকাশে পরিবেশের প্রভাবও অবশ্য অসামান্য। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত লইয়া বিষয়টা আমরা বুঝিতে পারি। এশিয়া, আফ্রিকা ও য়ুরোপের মহাদ্বীপগুলি পরস্পর সংবদ্ধ—এই সব স্থানে পালনযোগ্য বন্য গরু, ঘোড়া বা অন্যান্য পশুর অভাব ছিল না। এইজন্য শুধু পশুপালনই নয়, কৃষি প্রভৃতি বিষয়েও এই সব দেশের অধিবাসীরা অনেক উন্নত হইয়াছে। কিন্তু আমেরিকার জঙ্গলে এই রকমের পশু সুলভ ছিল না—তাই কৃষি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রগতিও সম্ভব হয় নাই।

২। বিভিন্ন জাতির মানব

প্রাচীন পাষাণ যুগের* অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হইয়া উঠিবার সময় আজ হইতে প্রায় দুই লক্ষ বৎসর পূর্বে হইবে। তখন নেঅণ্ডর্থল† জাতীয় মানুষ পৃথিবীতে বাস করিত। খ্রীষ্ট জন্মের বিশ হাজার বৎসর আগে অরিগ্‌নেশিয়ন মানবেরা পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

ইহারা সমস্ত পূর্ববর্তীর তুলনায় বেশি উন্নত ছিল বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীতে তখন চতুর্থ হিমযুগের সময় চলিতেছিল; তুষারপাতে য়ুরোপের সমগ্র ভূভাগ তখন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। খ্রীষ্ট-পূর্ব আট সহস্রাব্দের কাছাকাছি সময়ে চতুর্থ হিমযুগের অন্ত হয়। অরিগ্‌নেশিয়ন‡ মানব এই হিংস্র যুগকে কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল—তাই তাহাদের শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ইহারা চামড়ার পোষাক পরিত; এবং সূচীকার্যেও তাহাদের কিছু কিছু পারদর্শিতা ছিল। শীত হইতে বাঁচিবার জন্য তাহারা গুহায় বাস করিত। নেঅণ্ডর্থলদের কোন শিল্প ছিল না; কিন্তু অরিগ্‌নেশিয়নদের নিজস্ব শিল্পকলাও খানিকটা ছিল। তাহাদের আবাস-গুহায় কিছু অঙ্কিত চিত্র এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অরিগ্‌নেশিয়নরা প্রথমত লাল ও কাল রঙ দিয়া পশুর চিত্র আঁকিতে পারিত। আদিম শিল্পী প্রথমে রেখা আঁকা শিখিয়াছিল, তারপর তাহাতে উহারা বর্ণ ফলাইতে শিখিয়াছে এবং ইহার পর অঙ্কনে অভ্যস্ত হইয়া গেলে, কাঠ, পাথর, এমন কি লাকড়ির টুকরায়ও তাহারা কৃতিত্ব দেখাইতে ছাড়ে নাই। অরিগ্‌নেশিয়নদের চিত্রের মধ্যে লোমশ গণ্ডার, হরিণ এবং বন্য ঘোড়ার প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। শেষ সময়ে এই জাতি ধনুর্বাণেরও উদ্ভাবন করিয়াছিল। ইহাদের গুহায় প্রাপ্ত অস্থি ও অন্যান্য অবশেষ হইতে মনে হয়, ইহারা কয়েক পুরুষ ধরিয়া একস্থানেই বাস করিত। সম্ভবত হিমযুগের প্রভাবই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ।

চতুর্থ হিমযুগের সমাপ্তির সঙ্গে পুরাতন পাষাণ যুগের অবসান হইল। তাহার পর মানব নূতন সম্ভাবনা ও আশা লইয়া নূতন যুগে পা দেয়। হিমপাতের শেষে য়ুরোপে তখন আবার নূতন বনের সৃষ্টি হয়। তৃণপ্রান্তরগুলি আবার ধীরে ধীরে দিগন্তবিস্তারী হইয়া পড়ে। পশুরাও নূতন ভূমিতে চারিদিকে বিচরণ শুরু করিয়া দেয়—সঙ্গে সঙ্গে মাংসাহারী মানুষও পশুর অনুগামী হয়। ইহার পর পৃথিবীতে আবার নূতন যুগ অর্থাৎ নব পাষাণ যুগের§ আবির্ভাব ঘটে। এই যুগ প্রধানত কৃষি ও ধাতুর আবিষ্কারের যুগ।

* Paleolithic Age; † Neanderthal; ‡ Aurignasian; § Non-Paleolithic.

৩। পশু ও প্রকৃতিতে সংঘর্ষ

প্রাচীন যুগের মানুষের যে সব অবশেষ আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহার মধ্যে জাভার দ্বিপদদের নিদর্শনই সর্বপ্রাচীন। ইহার সময় আজ হইতে প্রায় পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বে অতীত হইয়াছে। 'বিশ্বের রূপরেখা'য় এই সম্পর্কে আমি আগেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। শরীর বিকাশের দিক্ হইতে জাভার দ্বিপদ ঠিক পরিপূর্ণ মানুষ ছিল না। এমন কি, এখন পর্যন্ত ইহাদের কাঁধের বিকাশ অসম্পূর্ণই আছে—অন্য জাতির মানুষের মত তাহাদের কাঁধ খুব ভালরূপ সোজা হইতে পারে নাই। গত পাঁচ লক্ষ বৎসরে মানুষ পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় সকল স্থান ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। জাভা, চীন, ভারত ও আফ্রিকায় ইহার প্রমাণস্বরূপ 'প্রচুর জীবাশ্ম* পাওয়া যাইতেছে; ইংলণ্ড, জার্মাণী, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশেও এইরূপ প্রমাণের কোন অভাব হইতেছে না। বর্তমানের তুলনায় তখনকার মানুষ খুবই অল্প-সাধন ছিল; নদী, বন, পর্বত, সমুদ্র সমস্তই তখন তাহাদের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু এই বাধা তাহাদের গতি একেবারে স্থগিত করিয়া দিতে পারে নাই। পুরাতন পাষাণ যুগের কিছু কিছু অস্ত্র† কাশ্মীর, মধ্য-এশিয়া এবং চীনে পাওয়া গিয়াছে। ডক্টর বীরবল সাহনী এই সম্পর্কে গবেষণা করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। সাহনীর মতে পুরাতন পাষাণযুগের মানুষ হিমালয়ের এপারে ওপারে যাতায়াত করিত। তখন হিমালয়ের উচ্চতা অবশ্য বর্তমানের অর্ধেক ছিল—তাই চলাচলের বাধা এখনকার মত বিরাট ছিল না। ইহা হইলেও, অপর একটি অসুবিধার তাহাদিগকে সর্বদা সম্মুখীন হইতে হইত; অজ্ঞাত স্থানে যাইবার পূর্বে আদিম মানব সেখানে তাহার সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিত না; নূতন স্থানে পৌঁছিয়া নূতন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে বিন্যস্ত করিয়া লইতে তাহাদের অনেক সময় লাগিত। তবে কথা এই, তাহাদের হাতে সময়ের তখন কোন অপ্রাচুর্য ছিল না।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মানুষ জীবনের অধিকাংশই সময়ই আহার অন্বেষণে ঘুরিয়া কাটাইয়া দিত। আজ বানর, শিম্পাঞ্জী কিংবা আফ্রিকার পিগ্‌মি জাতীয় মানুষের জীবনও অনেকটা এইরূপ। পূর্বেকার খাদ্যান্বেষী জীবের আরও একটি বিশেষ অসুবিধা ছিল—পৃথিবীর সকল স্থানে তাহাদের খাইবার মত পর্যাপ্ত ফল মিলিত না; আর মিলিলেও সকল ঋতুতে তাহা এক রকম সুলভ থাকিত না। তারপর অবশ্য শিকারের চলন হইল—কিন্তু শিকারের হাতিয়ার অর্থাৎ মানুষের কাঠ-পাথরের আয়ুধ‡ তখনও আদিম অবস্থায় রহিয়া

* প্রস্তরীভূত জীবকঙ্কাল, Fossil; † পাথরের আদিম অমসৃণ অস্ত্র; ‡ Tool.

গিয়াছে। তাই ইহাদের সহায়তায় অল্প সময়ে উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। আদিম মানবের সুবিধার মধ্যে ছিল এই যে—সমস্ত পৃথিবী তাহার নিকট খোলা পড়িয়া আছে; তখন পৃথিবীতে ভূমির অভাব ছিল না, অভাব ছিল মানুষের—মানুষ তখন সত্যই একটি দুর্লভ বস্তু ছিল।

মানুষের বাধা-বিপত্তির কথা অবশ্য এইখানেই শেষ হইল না। তখন মানুষের শত্রুর সংখ্যা ছিল অপরিসীম। মধ্য-য়ুরোপের বাসিন্দাদের খাদ্যসূচীতে মহাগজেরও* স্থান ছিল। মহাগজের আকার আজকালকার হাতী হইতে অনেকগুণ বড় হইবে। তাই এই প্রাণীটিকে শিকার করা তখন যে কত বিপজ্জনক ছিল তাহা বোঝা যায়। বিশেষত মানুষের হাতে তখন অমসৃণ কাঠ আর পাথরের টুক্‌রা ছাড়া আর অস্ত্র ছিল না। ইহাদের শিকারে সমতল ভূমির গহ্বর এবং খড়ের সাহায্য নিশ্চয়ই লইতে হইত। তাহা হইলেও শিকারীর জীবন যে এই কাজে একেবারে নিরাপদ থাকিত—তাহা মনে হয় না। সিংহ, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সংখ্যাও তখন এখনকার তুলনায় বেশি ছিল। আদিম মানুষকে প্রতিনিয়ত পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে এবং এই যুদ্ধে তাহাকে জয়ীও হইতে হইয়াছে।

ইহা ছাড়া পৃথিবীর জলবায়ু সব সময় একরকম ছিল না। এমন এক সময় ছিল যখন বাঙলার প্রান্তসীমায় আসানসোলেই বরফ পড়িত। আবার এক সময় সেখানে দেবদারুর গভীর বনও ছিল। পাটনা মিউজিয়মে তখনকার দেবদারু গাছের একটি ফসিল রক্ষিত আছে। আজ যে সব অঞ্চলে মানব অবশেষ পাওয়া যায় তাহার বর্তমান জলবায়ু দেখিয়া আদিম মানুষের বিপত্তির কথা কল্পনা করা যায় না। উদাহরণরূপে শুধু এইটুকু মনে রাখিতে পারি, পৃথিবীর আয়ুষ্কালের মধ্যে চার চারটি হিমযুগ পার হইয়া গিয়াছে; আর ইহার সর্বশেষটি শেষ হইয়াছে মাত্র দশ হাজার বৎসর আগে। বিভিন্ন জাতির মানুষের চক্ষু ও ত্বকের রঙ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। ইহা তাহাদের উপর নানা রকমের জলবায়ুর প্রভাবের প্রমাণ দেয়। গ্রীষ্মমণ্ডলের অধিবাসীদের চোখের তারা সাধারণত কৃষ্ণবর্ণ হয়; কারণ সেখানে সূর্যের প্রখর আলোক নিবারণের জন্য এই তারকারই প্রয়োজন। শীত প্রদেশের লোকের চোখের তারা আবার তেমনি নীল। সেখানে সূর্যের তেজও মন্দ; তাই চক্ষুর জন্য কৃষ্ণবর্ণের কোন আবরকের দরকার নাই। শীত ও গ্রীষ্মমণ্ডলের সুবিধা অসুবিধা প্রায়ই ভিন্ন রকমের;—বনমানুষের মত গায়ে লোম না থাকায় শীতের দেশের মানুষের খুব কষ্ট হইত। চামড়ার পরিচ্ছদ উদ্ভাবন করিবার পর তাহাদের এই কষ্টের

* Mammoth.

অনেকটা লাঘব হইয়াছিল। দাবাগ্নির সান্নিধ্যে আসিয়া তখন আগুনকেও হয়ত তাহারা শীতের প্রতিষেধক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। কিন্তু আগুনের সঙ্গে পরিচয়ের পরও আগুন জ্বালানো তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল না। কাঠে কাঠে ঘষায় যে আগুন জ্বলে—এই তথ্য আদিম মানবের পক্ষে শুধু আবিষ্কার নয়, ইহা তাহার পক্ষে এক শক্তিশালী দেবতার আবির্ভাবের মত। আগুনের পরিচয় পাইয়া আগুন সৃষ্টি করিতে মানুষকে অনেকদিন প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছে। কাঠ হইতে আগুনের উদ্ভব দেখিয়া আদিম মানুষ যে কতটা অভিভূত হইয়াছিল, বেদমন্ত্র হইতে তাহা বোঝা যায়। চার হাজার বছর আগে ঋষি অরণি ঘর্ষণের সময় অগ্নিদেবকে প্রকট হইবার প্রার্থনা জানাইতেন।

সমাজ—মানুষ সামাজিক জীব ; কিন্তু ইহা আদিকাল হইতে নহে, মানুষ মানুষ হইবার পর হইতে। জীববিকাশে মানুষের সমীপ জীব—বানর, বনমানুষ প্রভৃতি যূথবদ্ধ হইয়া বাস করিত। প্রাকৃতিক শক্তি এবং অন্যান্য প্রাণধারী শত্রুর বিপক্ষে ইহা আত্মরক্ষার উপায় ছিল। তাই পশুদের যূথবদ্ধতা কোনদিনই পরিত্যক্ত হয় নাই। জীববিকাশে যূথের অপরিসীম প্রভাব আছে ; পরে অবশ্য এই প্রভাব আসিয়াছে সমাজ হইতে। তখন ব্যক্তির প্রযত্ন আর বৈ্যক্তিক থাকে নাই, সমাজের অঙ্গ হিসাবেই তাহা সার্থক হইয়াছে। সমাজ কিভাবে সৃষ্টি হয়—ইহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। ভাষার বিকাশে সমাজ কিভাবে সাহায্য করিয়াছে ইহাও সেখানে বলা হইয়াছে। ভাষাশাস্ত্রী নোয়েরের* কথায়—

'সামাজিক লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য বংশবৃদ্ধদের প্রাচীন শ্রম এবং সামাজিক প্রযত্ন হইতেই মানুষের ভাষা ও চিন্তার সূত্রপাত।'....

ভাষা-সম্বন্ধী অনুসন্ধানে জানা যায় যে, প্রাচীন শব্দ মাত্রই ক্রিয়াদ্যোতক ; আর এই ক্রিয়াদ্যোতক শব্দও প্রায়ই ধ্বনির অনুকরণে† সৃষ্ট। নামবাচক শব্দ ধাতু বা ক্রিয়াবাচক শব্দের বহু পরে সৃষ্ট হইয়াছে।

মানুষ তাহার সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। থাকিলে শুধু তাহার ভাষা নহে, তাহার চিন্তার সূত্রও ছিন্ন হইয়া পড়িত ; কারণ চিন্তা ধ্বনিরহিত শব্দের সমষ্টি। মানুষের সমস্ত কাজেই এইরূপ সমাজের গভীর ছাপ আছে। শিশুকালে মাতৃস্তন্যের সঙ্গে আমরা সমাজের নিয়ম-নিষেধগুলিও পান করিয়া লই। তাই সমাজের অধিকাংশ বন্ধনই আমাদের কাছে ভূষণ স্বরূপ হইয়া উঠে। সমাজ আমাদের কায়িক বাচিক সকল রকম ক্রিয়ার উপর তাহার ব্যবস্থা ফলায়। কোন কারণে এই ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিলে অন্যের চোখে আমরা

* Ludwig Noire. † পত্‌=পতন।

অসভ্য, অসামাজিক হইয়া পড়ি। শুক্তির অন্তরে মুক্তির বিকাশ হয়; মানুষও নিজের সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সেইরূপ বিকশিত হইয়া উঠে। পরিবার, পাঠশালা, হাটবাট, ক্রীড়া ও ক্রিয়াক্ষেত্র—সকল স্থানেই তাহার শিক্ষা হয়। এই শিক্ষার সহায়ক মানুষের সমাজ-সম্পর্কে বিকাশপ্রাপ্ত ভাষা।

তাই বলিয়া সমাজ কোন অস্পৃশ্য অপরিবর্তনশীল লৌহপ্রাচীর নয়। মানুষের মত সমাজও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। এই পরিবর্তনের রূপ কখনও অব্যাহত ঢেউএর মত—ইহারই নাম হইল ক্রমবিকাশ। আবার কখনও ইহার বেগ আকস্মিক—অনেকটা সদ্যমুক্ত প্রপাতের মত—তখন ইহার নাম হইল বিপ্লব। সমাজ এই দুই গতিতে—বিকাশে বিপ্লবে—নিত্যই পরিবর্তিত হইতেছে। ইহাতে তাহার বাহ্য গঠন বা আভ্যন্তরিক গুণ কোনটাই স্থির থাকিতেছে না; বস্তু, ব্যক্তি, বিচার সমস্তই রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে।

আদিম যুগের মানুষের মধ্যে অন্তঃকলহও কম ছিল। তবু সম্মিলিত শত্রুর সম্মুখীন হইতে ঐক্যের যে প্রয়োজন আছে—ইহা মানুষ অল্পদিনেই বুঝিতে পারে। প্রকৃতি ও পশুজগতের সঙ্গে অসংখ্য সংঘর্ষের ফলে মানুষের এই সত্য উপলব্ধ হয়। জীবন রক্ষার জন্য পশুও বিরোধী প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু এই দিক দিয়া মানুষ ও পশুর ব্যবহারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। পশু প্রাকৃতিক বিপত্তি হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া আনিতে চায়; কিন্তু মানুষ শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচাইয়া ক্ষান্ত থাকে না—প্রকৃতির বাধক শক্তির উপর সে নিজের অধিকারও প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। যেমন, পশু আগুন দেখিয়া শুধু পলাইতে জানে—কিন্তু মানুষ আগুনের ধ্বংসক গুণ দেখিয়াই তাহাকে বর্জন করে না—সে আগুনের রক্ষক গুণকেও খুঁজিয়া বাহির করে। এইভাবে আগুন একদিন মানুষের নিশীথ প্রহরীর কাজ পায়; আগুনের শিখা দেখিয়া হিংস্র পশু তখন মানুষের আবাস হইতে দূরে সরিয়া থাকে। তুষারপাতের সময় আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া মানুষ এইরূপে দুরন্ত শীতকে জয় করে। তারপর পোড়া মাংস এবং ভুনা ফলমূলের স্বাদ পাইয়া মানুষ রন্ধনবিদ্যাও আয়ত্ত করে—ইহার ফলে তাহার পাকস্থলীর শ্রমও অনেকটা লঘু হইয়া যায়।

৪। পশু ও মানুষে পার্থক্য

পূর্বেই* বলিয়াছি, বনমানুষ, কুকুর প্রতি মনুষ্যেতর প্রাণীর মস্তিষ্কের সম্মুখের বস্তুর প্রতিবিম্ব ফলিত হয় এবং ইহার সাহায্য তাহারা সামান্য সামান্য চিন্তাও করিতে পারে। তবে এই সমস্ত জীবের চিন্তা শুধু বর্তমান বস্তু সম্পর্কেই সম্ভব

* 'বিশ্বের রূপরেখা' দ্রষ্টব্য।

হয়। মানুষ অগ্রদ্রষ্টা—সে ভবিষ্যতের সুখ-সুবিধার কথা সকল সময়েই স্মরণ রাখে; এমন কি ভবিষ্যৎ সুখের জন্য উপস্থিত দুঃখকে বরণ করিয়া লইতেও মানুষ কুণ্ঠা বোধ করে না। সম্মুখের তুচ্ছ লাভ ভবিষ্যৎ সুখের কণ্টক হইবে মনে করিলে—উহা মানুষ অক্লেশে ত্যাগ করে। মানুষের সামাজিক সদাচার এইরূপ ভবিষ্যৎ দৃষ্টিরই ফল। বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ সামাজিক অবস্থায় এক এক রূপ আচার চলিতে থাকে; পরে সময় ও অবস্থা পরির্বতনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আচার-নিয়মেরও রূপান্তর হয়। পশুজগৎ নিজের অস্তিত্ব, শুধু বর্তমান অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষে তাহার সহজ জন্মজাত প্রেরণাগুলিই আয়ুধ হিসাবে কাজ করে। কিন্তু মানুষ শুধু বর্তমানের চিন্তা করিয়া প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষ করে না এবং সেই সংঘর্ষে তাহার জন্মজাত প্রেরণারই শুধু সাহায্য নেয় না;—মানুষ বর্তমানকে স্বীকার করিয়াও নিজের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তান্বিত হয়; তাহার সমাজ এবং বংশধরদের জন্য সে সহজাত প্রেরণা ছাড়াও বহু নূতন অস্ত্র ও নূতন সাধন আবিষ্কার করিয়া রাখে। এইজন্য মানুষ পশু হইলেও সামাজিক পশু ও সর্বোপরি সে অস্ত্রধারী পশু; প্রকৃতির সহিত সংঘর্ষে সে অবশ্য পশুর মতই যূথবদ্ধ, কিন্তু পশুর তুলনায় বহু সহস্র গুণ কৌশলী।

৫। মানুষের বিশেষত্ব

মানুষের মস্তিষ্কের গঠন অর্থাৎ তাহার সেরেব্রম* খুবই বিকাশপ্রাপ্ত। মানুষ চিন্তা করিতে পারে, বিশ্লেষণ করিতে পারে, সমস্যার সমাধান করিয়া নূতন পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বের ক্রোমেগ্নন† এবং নেঅণ্ডর্থল‡ মানবেরও চিন্তাশক্তি ছিল। তাহারাও অনুভব হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিত এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে ভবিষ্যতের চিত্র কল্পনা করিয়া পূর্ব হইতেই তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিত। আহার অর্জনের জন্য নূতন কৌশল কিংবা শীতাতপের নূতন প্রতিষেধক আবিষ্কার করিতে ইহাদের কষ্ট হইত না। মস্তিষ্কের পূর্ণতার জন্যই মানুষ তাহার ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে না; অনিশ্চয়ের ভীতি ও উদ্বেগ মানুষের পক্ষে স্বভাবতই পীড়াপ্রদ। মস্তিষ্কের বিকাশ মানব বিকাশের সর্বাপেক্ষা বড় সহায়ক; কিন্তু এই মস্তিষ্কের বিকাশে মানুষের অপরাঙ্গের সাহায্যও ভুলিবার নয়। মানুষের নখ, পাঞ্জা প্রভৃতি পশুর মত তীক্ষ্ণ এবং দৃঢ় নয়। বাঘ ভালুকের মত দাঁতের ব্যবহারও মানুষ করিতে পারে না। কিন্তু পায়ের দিক দিয়া মানুষের উৎকর্ষ

* Cerebram; † Cromagnon; ‡ Neanderthal.

বেশি ; মানুষের পা একা শরীর বহিবার দায়িত্ব নিয়া হাতকে মুক্তি দিয়াছে। ইহা না হইলে শুধু মস্তিষ্কের চিন্তায় হাত কখনও হাতিয়ার ধরিতে পারিত না; আর অমসৃণ পাথরের যুগ হইতে বর্তমান বোমাবর্ষণ পর্যন্ত মানুষের অস্ত্রের উন্নতিও হইত না। তাই শুধু মাথা নয়, হাত ও মাথা এই দুই মিলিয়া মানুষকে সত্যকার মানুষ করিয়াছে এবং মানুষের চিন্তা ও ভাষা তাহার হাতের ক্ষমতা অর্থাৎ কার্য-ক্ষমতাকেও বাড়াইয়া দিয়াছে। ইহার সঙ্গে সমাজ-সম্পর্কের কথা আমরা আগেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

মানুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নয়, সে প্রকৃতিরই অঙ্গ; তবে এই অঙ্গ বিকাশের শিখরে পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাই প্রকৃতির অপর অঙ্গের সঙ্গে ইহার ভেদও স্বাভাবিক। মানুষ প্রকৃতির সাবালক পুত্রের মত; সেইজন্য প্রকৃতি সম্পর্কে তাহার জিজ্ঞাসা আছে, তাহার আচরণে 'নমু' 'ন চ' প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। প্রকৃতির দেওয়া জিনিষ মানুষ চক্ষু মুদিয়া গ্রহণ করে না; প্রকৃতির দান সে সংশোধন করিয়া আরও অধিক উপযোগী করিয়া লয়।

(১) **মস্তিষ্কের অপূর্ব শক্তি**—আদিম মানুষ* হইতে কয়েক হাজার বৎসর পূর্বের মানুষ† পর্যন্ত হাতিয়ার-পত্রের বিশেষ বিকাশ হয় নাই। দীর্ঘ সময় ধরিয়া চকমকি কিংবা অন্য কোন শক্ত পাথরে শান দিয়াই হাতিয়ার তৈয়ারী হইত। ইহাতে বোঝা যায় যে, বিকাশের প্রথম দিকে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাওয়া খুব সহজ ছিল না। অবশ্য সেইজন্য এই দীর্ঘ সময় মানবমস্তিষ্ক যে একেবারে অলস বসিয়া রহিয়াছে তাহাও নয়। তখনও বহু নূতন আবিষ্কার উদ্ভাবন সম্ভব হইয়াছে। এখনকার তুলনায় তাহা নগণ্য হইতে পারে; কিন্তু মানুষের প্রারম্ভিক বিকাশে তাহারও যথেষ্ট দাম ছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি,‡ নব পাষাণ যুগের মানুষ কাঠ, পাথর ও অস্থি দিয়া হাতিয়ার তৈয়ার করিত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সীবন-বয়নেও তাহাদের কিছু কিছু হাত ছিল; গৃহনির্মাণ বা আগুনের বিভিন্ন ব্যবহারও তাহাদের অজানা ছিল না। ইহা হইতে মানব-মস্তিষ্ক যে এই দীর্ঘ যুগ অলস থাকে নাই তাহা বুঝিতে পারি। তবে যত পিছনে যাওয়া যায়, মানুষের আবিষ্কারের গতিও তত মন্থর হইয়া আসে। বর্তমান কালে ইহার বেগ অবশ্য খুবই তীব্র; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মানুষ শক্তিসঞ্চালিত যন্ত্রের কথা ভাবিতে শিখে; উনবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া যন্ত্রের পরিপূর্ণ উপযোগ আরম্ভ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আবার বিদ্যুৎও ব্যবহারে লাগিয়া যায়—আজ পর্যন্ত ইহার বিকাশের

---

* তিন লক্ষ বৎসর পূর্বের হায়ডেলবর্গীয় (Heidelberg) মানুষ ; † আমাদের স্বজাতি মানুষ ; ‡ 'বিশ্বের রূপরেখা' দ্রষ্টব্য।

কথা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বিমানপোত, বেতারবার্তা, রঞ্জনরশ্মি—সমস্তই বর্তমান শতাব্দীর আশ্চর্য আবিষ্কার; মাত্র বার বৎসর আগের সৃষ্টি কথাচিত্রই বা ইহা হইতে কম কিসে?

সমাজ—সমাজের লক্ষণ নির্ণয় করিতে গিয়া একজন লেখক বলিয়াছেন—

"....আপন আপন ক্রিয়া দ্বারা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তারকারী মানুষের বিস্তৃত সংগঠনের নাম সমাজ....পরস্পরের উপর প্রভাবকারী সকল রকম বৈ্যক্তিক ক্রিয়াই সমাজের উপর স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়....সমাজ প্রকৃতপক্ষে মানুষের পরিশ্রম অর্থাৎ ক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর স্থাপিত।"

প্রকৃতি আদিম কাল হইতেই মানুষকে সম্মিলিত ও সংগঠিত থাকিতে বাধ্য করিয়াছে। ইহা না হইলে তাহাদের পক্ষে মানুষ হিসাবে নিজের অস্তিত্ব রাখা সম্ভব হইত না। মানুষের এই সংগঠন-সম্মিলন তাহার সমাজ জীবনে প্রয়োজনীয় বস্তুপাতির উৎপাদন-সম্বন্ধের মধ্য দিয়া সৃষ্টি হইয়াছে। সমাজ প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সমষ্টি। এখানে নিরন্তর একে অন্যকে প্রভবিত করিয়া আসিতেছে। একটি অধুনাতন উদাহরণ দেখুন:—এক ব্যক্তি হাটে গিয়া জিনিস খরিদ করিতেছে। ইহার ফলে বাজারের দরের উপর তাহার প্রভাব পড়িবে। কারণ, তাহার উপস্থিতিতে ক্রেতার সংখ্যা কিছুটা বাড়িয়া গেল এবং তাহার ক্রয়ের ফলে বিক্রয়বস্তুর অংশও কিছু হ্রাস পাইল। এইভাবে ক্রেতার বৃদ্ধি এবং বস্তুর হ্রাসে মূল্যেরও বৃদ্ধি ঘটিল। বাজার-দরের উপর একজন ক্রেতার প্রভাব খুব সামান্য সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাও প্রভাব—পরে একক প্রভাবগুলিই সমষ্টিগত হইয়া কাজ করে। পুকুরে ঢিল ছুঁড়িলে ছোট ছোট ঢেউ উঠিয়া তাহা তীর স্পর্শ করে; পণ্যমূল্যের প্রভাবও এইভাবে হাট হইতে রাষ্ট্র এবং অন্তঃ-রাষ্ট্রীয় জগতে প্রতিফলিত হয়। হিন্দুদের বিবাহের সময় পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র পড়ান; ইহাতে পাড়াপড়শীর মনে ধর্ম বিষয়ে অনুকূল প্রভাব পড়ে। পরে অন্যান্য সদৃশ প্রভাবের সঙ্গে মিলিয়া ইহা পৃথিবীতে ধর্মের ভিত পাকা করিয়া দেয়। তারপর দক্ষিণা লইয়া পুরোহিত বাজারে গেলে তিনি বাজার-দরের উপরও প্রভাব বিস্তার করেন। সমাজের কোটি কোটি ব্যক্তি এইভাবে এই প্রবাহে জলবিন্দুর মত একত্র হইয়া আছে।

সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি; কিন্তু শুধু ব্যক্তির সমষ্টি বলিলেই সমাজের পূর্ণ রূপ প্রকাশ হয় না। পরিমাণ অর্থাৎ মাত্রা বস্তুর গুণে কিভাবে পরিবর্তন ঘটায়—তাহা অন্যত্র* আলোচনা করিয়াছি। ব্যক্তির সহযোগে সৃষ্ট সমাজের মধ্যেও এইরূপ গুণাত্মক পরিবর্তন হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথক্ ভাবে যেরূপ কাজ বা

* 'বিশ্বের রূপরেখা' এবং 'বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ'।

চিন্তা করে—সামাজিক পরিবেশে আসিয়া তাহা আর ঠিক সেইরূপ থাকে না; কারণ সমাজ তাহার চিন্তা এবং কার্য সমস্তই প্রভাবিত করিয়া ফেলে। সভা, মিছিল প্রভৃতি জনসন্নিবেশে মানুষ প্রকৃতই স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়; আর উহা না হইলে অন্তত ইহা দ্বারা প্রভাবিত যে হয় তাহা নিঃসন্দেহ। ঘড়ির কলকব্জার যোগফল হইতে আসল ঘড়িটি গুণের দিক দিয়া অনেক বেশি; —ঠিক সেইরূপ সমাজও শুধু ব্যক্তির সমষ্টিমাত্রই নয়, তাহাও ব্যক্তির যোগফল হইতে গুণের দিক দিয়া বড়। এইজন্যই সমাজ = মানুষ + মানুষ নয়; সমাজ = মানুষ × মানুষ।

ব্যক্তির প্রত্যেক ক্রিয়াকর্মের প্রভাবই সমাজের উপর পড়ে—কিন্তু তাহা একটু পরিবর্তিত রূপে। সমাজ যত ছোট হয় তাহার উপর ব্যক্তির ক্রিয়ার প্রভাবও তত বেশি পড়ে এবং সময়ও তাহাতে কম লাগে। কারণ এই সমাজে ব্যক্তি পরস্পরের নিকটে আসিতে পারে, ইহাতে তাহাদের পারস্পরিক বিচার-বিনিময়ের সুবিধা হয়। ব্যক্তি যে সমাজের উপর প্রভাব ফলায় তাহা একক-ভাবে নয়—ইহাও সংঘবদ্ধ ভাবে। ভাষা, রাজনীতি, কলা, বিজ্ঞান, দর্শন—এমন কি ফ্যাশন, রীতি-রেওয়াজ পর্যন্ত সমস্তই সমাজের উপজ। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্বন্ধ, তাহাদের পারস্পরিক প্রভাব এবং এই প্রভাবের নিরন্তর সঙ্গতির মধ্য দিয়া এই সবের সৃষ্টি। সমাজের মানস-জীবনও বহু ব্যক্তির বিচার-ভাবনার যোগফলমাত্র নয়। ইহাও ব্যক্তির পরস্পর-সম্পর্কের দান এবং তাহা বৈয়ক্তিক চিন্তা হইতে বহুলাংশে পরিবর্তিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বন্য মানব সমাজ

এঙ্গেল্‌স্‌ মানব সমাজকে তিন যুগে বিভক্ত করিয়াছেন—বন্য, বর্বর ও সভ্য। ইহাদের মধ্যে বন্য মানব সমাজের ভাগই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। নেঅণ্ডর্থল, গ্রিমাল্‌দী, ক্রোমেগ্নন প্রভৃতি মানুষের সমস্ত জীবন বন্য যুগে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। নানা প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীতে চারবার হিমযুগ নামিয়া আসিয়াছিল; ইহার সর্বশেষ হিমযুগটি মাত্র দশ হাজার বৎসর আগে শেষ হইয়াছে। এই চারটি হিমযুগের মধ্যে পৃথিবীতে বহু মানবজাতির উত্থান ও বিলয় হইয়াছে। চতুর্থ হিমযুগ হইতে আজ পর্যন্ত যে জাতি নিজের অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহারা সেপিয়ন মানব; সেপিয়ন মানব বর্তমান মানবজাতি সমূহের পূর্বপুরুষ। অন্যান্য আদিম জাতির মত ইহারাও ফলমূল খাইয়া বাঁচিয়া থাকিত; এবং মাছ-মাংস ভোজনের জন্য অমসৃণ পাথরের অস্ত্র দিয়া শিকারও করিত। এই সমস্ত জীবনপ্রণালী তাহাদিগকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতে হয় নাই—বংশানুক্রমের ফলে এই সব পূর্ব হইতেই তাহাদের আয়ত্ত ছিল।

(ক) আদিম সাম্যবাদ

বন্য মানবের নিকট সাধন অর্থাৎ তাহার জীবনযাত্রার উপযোগী অস্ত্র-শস্ত্র ও কলাকৌশল কম ছিল। তাই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যক্তি হইতে তাহাকে সমাজের উপর বেশি নির্ভরশীল হইতে হইত। এইজন্য বন্য সমাজে যে যৎসামান্য সম্পত্তি হইত তাহাতেও সমূহেরই অধিকার থাকিত। এখানে সম্পত্তি বলিতে যাহা বুঝায় তাহার প্রায় সমুদয় বস্তুই খুবই তাড়াতাড়ি অব্যবহার্য হইয়া পড়িত। ফলসঞ্চয়ের পর শিকারের যুগে আসিয়াও নিহত পশুর মাংস তাহারা বেশি-দিন সঞ্চিত রাখিতে পারিত না। এইভাবে সংগ্রহ ও সঞ্চয় উভয়ই কম হওয়াতে তাহাদের সম্পত্তিও কম ছিল। তবে এই সামান্য সম্পত্তিতেও সমাজের সকলের সম্মিলিত অধিকার থাকিত—কারণ এই সব সম্পত্তি সকলের সম্মিলিত শ্রমে সৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সামাজিক অবস্থার নাম আদিম সাম্যবাদ। আদিম সাম্যবাদী যুগে উচ্চ নীচ শ্রেণীভেদ ছিল না, ধর্ম ছিল না; এমন কি সমাজ ছাড়া মানুষের পৃথক অস্তিত্বও ছিল না।* তখন শত্রুর আক্রমণ হইতে একে

---

* ভাষাশাস্ত্রীদের মতে ভাষায় প্রথম উত্তমপুরুষের বহুবচনান্ত পদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার পরে একবচনান্ত পদ অর্থাৎ 'আমি' শব্দের উদ্ভব হইয়াছে।

অপরকে রক্ষা করিত; সকলে একত্র হইয়া খাদ্য সংগ্রহ করিত এবং একত্রই ভোজন করিত। সামাজিক প্রয়োজনে তখন সকলে একসঙ্গে শ্রম করিত; আবশ্যক বস্তুপাতির উৎপাদনও সামূহিক ভাবেই হইত। এইজন্য তখন সম্পত্তি সামূহিক না হইয়া কোন উপায় ছিল না। আদিম সাম্যবাদী সমাজের শেষাশেষি এই অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়—তখন হইতে সম্পত্তি অর্থাৎ ব্যৈক্তিক সম্পত্তি এবং অসমানতার সূত্রপাত হইতে থাকে।

১। মাতৃসত্তা ও বিবাহ

আদিম সাম্যবাদী সমাজের আর এক বিশেষত্ব স্ত্রীজাতির প্রাধান্য। এইজন্য সেই সমাজকে মাতৃতান্ত্রিক বা মাতৃসত্তাক সমাজ বলা হয়। বানর বা বনমানুষের যূথস্বামী সর্বদাই পুরুষ হইত; কিন্তু আদিম মানুষের যূথকর্ত্রী ছিল স্ত্রী। প্রথমত ইহা খুব আশ্চর্যজনক মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই। প্রাচীন ও আধুনিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে এ যাবৎ বহু গবেষণা হইয়াছে। ইহাতে নৃতত্ত্ববিদেরা মাতৃতন্ত্রের কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন। তাই এখন ইহাকে কোন বুদ্ধিবিরুদ্ধ সংবাদ বলিয়া মনে করিলে চলিবে না। বানর বা অন্যান্য জাতির জীবের মধ্যে তাহাদের কোন দোর্দণ্ড-প্রতাপ সাথী যূথস্বামিত্ব করে। কিন্তু ইহারই বা কারণ কি? কারণ এই যে, যূথের মধ্যে সে সর্বাপেক্ষা বলবান। তাহার দাপট হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া যূথের আর যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের সংখ্যা অবশ্য বেশি; কিন্তু সংঘশক্তির মূল্য তাহারা ততটা বুঝে না, অথচ এই যূথস্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া একা আত্মরক্ষার সামর্থ্যও তাহাদের নাই। এইজন্য পশুসমাজে শেষ পর্যন্ত বলই সর্বজয়ী হয় এবং বলবানের হাতে গিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপেই যূথের নেতৃত্ব পড়ে। কিন্তু মানুষের সমাজে ব্যক্তির বল তত প্রাধান্য পায় না। মানুষ বহু আগেই সংঘশক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারিয়াছে; তাই আদিম অবস্থায়ও তাহার কোন যূথপতির প্রয়োজন হয় নাই। ইহার পরিবর্তে মানুষ পরিবার সৃষ্টি করিয়াছে—এবং সেই পরিবারের অধ্যক্ষা হইয়াছে স্ত্রীলোক অর্থাৎ পত্নী এবং মাতা।

ফলসঞ্চয় মানুষের প্রথম জীবনোপায়, ইহার পর মৎস্য ও পশু শিকার করিয়া মানুষের জীবিকা-নির্বাহ হইত। এই দুই অবস্থাতেই সমাজে স্ত্রী-নেতৃত্ব প্রচলিত ছিল। এই সময়ে নিশ্চিত বিবাহ বা পতিপত্নী-সম্পর্কের অস্তিত্ব ছিল না। মাতৃপরিবারের যে কোন পুরুষের সংসর্গেই তখন স্ত্রীলোক গর্ভিনী হইত। কিন্তু পরিবারের কর্ত্রী ইহাকে বড় সুনজরে দেখিত না; তাহাদের কোপের

কারণ অবশ্য অন্যরূপ। তখন মাতা মাত্রেই ভবিষ্যতে পরিবারের নেতৃত্ব গ্রহণের আশা করিত ; ইহাতে পুরাতন কর্ত্রীর কর্তৃত্বের কাল দীর্ঘ হইতে পারিত না। মাতৃকর্ত্রীক পরিবার এই কারণে প্রায়ই ছোট হইত। একজন জীবিতা মাতা এবং তাহার সন্তানসন্ততি লইয়াই এই পরিবারের গঠন। এঙ্গেল্‌স্‌ এই যুগের স্ত্রীপুরুষ-সম্পর্কে যূথবিবাহ* আখ্যা দিয়াছেন। কারণ বিবাহ তখন ব্যক্তিগত হইত না এবং এই বিবাহে ব্যক্তির স্থানে যূথেরই প্রাধান্য থাকিত। যৌন-সম্পর্কের দিক দিয়া মাতৃকর্ত্রীক পরিবার মাত্র দুই ভাগে বিভক্ত; অর্থাৎ শুধু স্ত্রী এবং পুরুষ। ইহার এক বর্গের সঙ্গে অন্য বর্গের যৌথ পতিপত্নী-সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। পরিবারের সমস্ত স্ত্রীলোক এই হিসাবে নরযূথের পত্নী এবং সমস্ত পুরুষও সেইরূপ নারীযূথের পতি।

অনেক পণ্ডিত মাতৃসত্তাক পরিবারের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও যূথবিবাহকে মানিতে চান না। কিন্তু বহু ভ্রাতার এক পত্নী বিবাহ করার প্রথা তিব্বতে এবং আরও অন্যান্য দেশে এখনও পর্যন্ত প্রচলিত আছে। বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে এক বর্গ অর্থাৎ, পুরুষবর্গের দিক হইতে যূথবিবাহই বলিতে হয়। নারীকর্তৃত্বের সমাজেও অবশ্য ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন আসিয়া গেল। জীবিকা অর্জন ব্যাপারে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া পুরুষ নারীর কর্তৃত্ব কাড়িয়া লইল। পুরুষের বৈয়ক্তিক বিশেষত্বগুলিও যে এই বিষয়ে তাহার সহায়ক হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আদিম যুগের শিকার বা ফলসঞ্চয়ের কাজে নারী পুরুষের পশ্চাতে ছিল না। তখন ঘরে ও বাহিরে কিংবা চুল্লীতে ও হাল্‌কা কাজে নারী-পুরুষের কোন কর্মবিভেদ হয় নাই। মাতৃকর্ত্রীক সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি পরিবারের কর্ত্রী অর্থাৎ মাতার পরিচয় জানিত। যূথবিবাহের সন্তান বলিয়া তাহাদের পক্ষে পিতৃনিরূপণ সম্ভবও ছিল না। তাই পিতা বা পুরুষের সঙ্গে পরিবারের ব্যক্তিদের মাতার মত ঘনিষ্ঠতা হইত না। সেই সময় স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গাদি ব্যাপার নিজ নিজ পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেই সম্পন্ন হইত। কারণ সমগ্র পরিবারকে মিলিত হইয়া তখন জীবিকা অর্জন করিতে হইত এবং শত্রুর সম্মুখীনও সামূহিক ভাবেই হইতে হইত। তখন জীবিকার জন্য মানুষকে সকল সময় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না। নূতন অর্জনক্ষেত্রের প্রয়োজন হইলে সেখানে বর্তমান যাযাবরের মত দুই পরিবারের কলহ বাধিয়া যাইত। এই অবস্থায় পরিবারের বাহিরে গিয়া যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করা ব্যভিচার বলিয়াই গণ্য হইত। ইহাতে পরিবারের অল্পসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক-জনিত বিধিনিষেধ থাকা সম্ভব ছিল না। নিকট-সম্পর্কিতের সহিত বিবাহ

* Group Marriage.

শুধু আদিম যুগে নহে, ঐতিহাসিক যুগেও প্রচলিত ছিল। অনেক স্থানে এই প্রথা এখনও একেবারে রহিত হয় নাই। মাদ্রাজে তামিলদের মধ্যে, এমন কি তামিল ব্রাহ্মণদের মধ্যেও মাতুলের সঙ্গে ভাগিনেয়ীর বিবাহ হয়।* মিশর ও ইরাণের শাসকবর্গের মধ্যে ভ্রাতাভগিনীর বিবাহের বহু দৃষ্টান্ত মেলে। ইরাণে একসময় মাতৃবিবাহের প্রথাও প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের ভারতীয় গ্রন্থকার পারসীকদের মাতৃবিবাহ সম্বন্ধীয় লোকোপবাদ উল্লেখ করিয়াছেন।

২। উৎপাদনের সাধন ও হাতিয়ার

আদিম সাম্যবাদী সমাজ অনেকগুলি মাতৃকর্ত্রীক পরিবারে বিভক্ত ছিল— ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ কাঠ, পাথর এবং হাড়ের অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে জীবিকা অর্জন করিত। শীতের জন্য চামড়ার পোষাক তৈয়ার করিবার কৌশলও তাহাদের জানা ছিল। তখন খাদ্যের মধ্যে ফলমূল এবং মৎস্যমাংস উভয়ই প্রচলিত; তবে দেশভেদে তাহার মধ্যে বস্তুগত তারতম্যও কিছু কিছু ছিল। সুইজার-ল্যাণ্ডের লোকের তখন বিশেষ খাদ্য ছিল ভল্লুকের মাংস; শতের অনুপাতে ইহার স্থান তাহাদের মোট খাদ্যবস্তুর নব্বই ভাগ হইবে। মোরাভিয়ার লোকেরা তাহাদের খাদ্যের মধ্যে তখন মহাগজকে ঐরূপ স্থান দিয়াছিল এবং ডেনমার্কের অধিবাসীরা শুক্তি, শামুক এবং মৎস্যের সাহায্যে খাদ্যের পূর্বোক্ত পরিমাণ পূর্ণ করিত।**

৩। সম্পত্তি

এঙ্গেল্‌স্ লিখিয়াছেন যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজেও সম্পত্তির উদ্ভব হইয়াছিল। প্রথম অবস্থায় পরিবারগুলিতে শুধু নিজেদের উপযোগী জিনিস-পত্রই তৈয়ার হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে উৎপাদন বণ্টনের এই স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থা কাটিয়া যায়। তখন বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে জিনিসপত্রের অদল-বদল হইতে থাকে এবং এইভাবে বিনিময় হইতে ধীরে ধীরে বিক্রয়ের নূতন প্রথা আবিষ্কৃত হয়। বিক্রয় শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপযোগী বস্তু ছাড়া মানুষ পণ্য নির্মাণে মন দেয়। ইহাতে সমাজে নূতন অসমানতা আসিয়া যায় এবং কম্যুনের † সদস্যদের মধ্যে সম্পত্তিগত তারতম্যেরও সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা অবশ্য

---

* শুক্রনীতিতে উদ্ধৃত বৃহস্পতির উক্তিতে আছে:—পূর্বে মৎস্য ভোজনম্, মধ্যদেশে শিল্পী কর্মকারচ গবাচীম। দক্ষিণে মাতুলকন্যাবিবাহ, উত্তরে ব্যভিচাররতা স্ত্রীলোক মদ্যপ।

** 'বিশ্বের রূপরেখা' দ্রষ্টব্য। † পরিবার সমবায় (Commune).

আদিম সাম্যবাদের অন্তিম সময়ের। তখনকার দিনে ঐতিহাসিক যুগবিভাগের সীমা খুব স্পষ্ট হইতে পারে না। কোথাও কোনও অবস্থা দশ হাজার বৎসর পূর্বে লোপ পাইয়াছে; আবার কোথাও তাহা বর্তমান কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আজ পৃথিবীতে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের যুগ; কিন্তু ভারতবর্ষে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার বিলোপ হইয়াছে কি? পৃথিবীর বহু স্থান হইতে দাসপ্রথা অনেক আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু নেপাল রাজত্বে ১৯২৫ খ্রীস্ট সন পর্যন্ত ইহা আইনসঙ্গত ছিল।

বিকাশক্রম হইতে মোটামুটি দেখা যায়, আদিম সাম্যবাদী সমাজ অর্থাৎ আদিম কম্যুন এবং জনসত্তা—এই উভয়েই মাতৃকর্তৃত্ব প্রচলিত ছিল। আর, বৈয়ক্তিক সম্পত্তির স্থান ইহাদের মধ্যে বড় একটা ছিল না। কিন্তু জনসত্তার পরই পিতৃসত্তা বা পিতৃকর্তৃত্বের কাল; এই সময় হইতে দাসতা এবং ইহার পর ক্রমে সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়। আদিম কম্যুনগুলিতে শ্রেণীভেদ ছিল না—সেখানে 'শ্রমজীবী'* এবং 'শ্রমসেবী' † এই দুইটি বিরোধী শ্রেণীর সৃষ্টি হয় নাই। তাই সমাজে শোষণ বলিয়া কিছু ছিল না; আর শোষণ কায়েম রাখিবার জন্য সমাজের এক বিশেষ শ্রেণী অর্থাৎ শোষকশ্রেণীর শাসনও ছিল না।

* শ্রমজীবী, যে আত্মশ্রমে জীবিকা অর্জন করে; † শ্রমসেবী, যে অপরের শ্রম ভোগ করে।

তৃতীয় অধ্যায়

বর্বর মানব সমাজ

আদিম কম্যুনগুলির পরবর্তী অবস্থায় এঙ্গেল্‌স্ কথিত বর্বর মানব সমাজের উদ্ভব হয়। বর্বর মানব সমাজে প্রথমত মাতৃসত্তা প্রচলিত ছিল। পরে পরিবার ও কম্যুনগুলির পরিণতির ফলে জনসত্ত্ব বা গোত্রবাদের সৃষ্টি হয়। জনসত্তার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃসত্তা লোপ পায় এবং তাহাদের স্থলে পিতৃকর্তৃত্ব বা পিতৃসত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতেই স্ত্রীজাতির অবস্থা যে সমাজে খুব হীন হইয়া গেল এমন নহে; কিন্তু পিতৃসত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে শ্রেণীভেদের গোড়াপত্তন হয়।

(ক) জনযুগ

১। জন কি?

বন্য অবস্থার পরবর্তী সামাজিক স্থিতিকে এঙ্গেল্‌স্ 'জন' বলিয়া লিখিয়াছেন। 'জন' প্রাচীন হিন্দী-য়ুরোপীয় শব্দ * ইহার অর্থ মনুষ্য বা মনুষ্য জাতি। কিন্তু এঙ্গেল্‌সের অর্থে 'জন' মনুষ্য জাতি নহে; তাঁহার অর্থে 'জন' একবংশাগত মনুষ্য সম্প্রদায়। ভারতীয় ভাষায়ও 'জন' শব্দের এইরূপ প্রয়োগ ছিল; কিন্তু সমাজ-বিকাশের কোন বিশেষ অবস্থা বুঝাইবার জন্য তাহার প্রয়োগ হইত না। হিন্দী আর্যেরা আফগানিস্থানে কিংবা সিন্ধুসমীপে পৌঁছিবার সময় বিভিন্ন 'জন' বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। তাহারা যে সব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহার নাম তাহাদের 'জনে'র নাম হইতে প্রাপ্ত। শিবি জন** যে দেশে বাস করিত তাহার নাম শিবি জনপদ †; পক্‌থ অর্থাৎ পাঠানগণের অধ্যুষিত দেশের নাম হইয়াছিল পর্কথ জনপদ; এইরূপ মদ্রদের অধিবাস স্থলের নাম ছিল মদ্র জনপদ; এবং মল্লদের বসতির নাম ছিল মল্ল জনপদ। আর্যরা পঞ্জাব সীমা অতিক্রম করিলে যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা, বিহার প্রভৃতি প্রদেশেও তাহাদের জনের নাম অনুযায়ী জনপদের নামকরণ আরম্ভ হয়। সংস্কৃত ভাষায় জনপদ এবং জন এই দুই শব্দের অভিন্নার্থক প্রয়োগও আছে। বহু ব্যক্তির সমষ্টি বলিয়া জন শব্দের স্থলে ইহার অর্থ বুঝাইবার জন্য জনের নামের বহুবচনান্ত ব্যবহারও দেখা যায়। এইরূপ

* **Indo-European**

** শিবি গোষ্ঠীর মানুষ; † শিবি দেশ।

মদ্রাঃ, মল্লাঃ প্রভৃতি শব্দে শুধু জন বা গোষ্ঠী না বুঝাইয়া জনপদকেও বুঝাইয়া থাকে। তাই মদ্রাঃ বলিতে শুধু মদ্রজনীয়কেই বুঝাইবে না,—মদ্রজনের অধ্যুষিত জনপদকেও বুঝাইবে। এইভাবে ভারতীয় জন শব্দটি হিন্দী-য়ুরোপীয় জন শব্দের সমার্থবাচক, তবে পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা সমাজবিকাশের কোন বিশেষ অবস্থা বুঝায় না। হিন্দী-য়ুরোপীয় ভাষায় জন বলিতে আদিম-কম্যুনের পরবর্তী শ্রেণীভেদহীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দীআর্যেরা পঞ্জাব বা আফগানিস্থানে বাস করিবার সময় সেই সমাজে মাতৃসত্তা ছিল না, তাহাদের সমাজব্যবস্থা পিতৃসাত্তিক ছিল। ইহার উৎপাদন-বণ্টন ঠিক কম্যুনের নিয়ম অনুযায়ী হইত না, কারণ আর্যদের মধ্যে তখন ব্যৈক্তিক সম্পত্তির বিকাশ ঘটিয়াছিল। তাহা হইলেও সপ্তসিন্ধুনিবাসে অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশে থাকিবার সময় আর্যদের সমাজে বৈষম্য বিশেষ ছিল না। অনুগঙ্গদেশে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আর্যসমাজে বিষমতার সৃষ্টি হয়। কুরুপঞ্চালে বসতি স্থাপনের পর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অর্থগত ও জাতিগত শ্রেণীভেদ এবং বর্ণভেদের উদ্ভব ঘটে।

ভারতীয় সমাজের বর্ণনায় জন অপেক্ষা গোত্র শব্দই সামাজিক অবস্থা বুঝাইতে বেশি সহায়ক হইবে। গোত্র বলিতে গোরক্ষার সাধন অর্থাৎ চারণভূমি এবং গোপালকদিগকে বুঝায়। হিন্দী আর্যসমাজে গো-ধনই প্রধান ধন ছিল ; এইজন্য একবংশজ সমুদয় ব্যক্তিকে বা সেই বংশকেই গোত্র বা গোযূথের রক্ষক বলা চলিত। জন অবস্থায় আসিয়া য়ুরোপীয় সমাজে পশুপালন সবে আরম্ভ হয় ; কিন্তু ভারতবর্ষে সেই সময় গো-পালন রীতিমত উন্নত এবং সমৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এঙ্গেল্‌সের পরিভাষায় এই যুগকে তাই পিতৃসত্তার যুগ বলিয়া ধরিতে হয়। ভারতীয় পিতৃসত্তা বা তাহার গোত্রকালের জ্ঞান আমাদের প্রকৃতই খুব কম। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ প্রভৃতি বিখ্যাত গোত্রের নাম আমরা জানি ; কিন্তু ইহাদের একটিও প্রাচীন গোত্রযুগ বা পিতৃসত্তাকালের পরিচয় নয়। এইসব গোত্রকর ঋষি সকলেই ১৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের সমসাময়িক—তাঁহারা গঙ্গার আশপাশের প্রদেশগুলিতে বাস করিতেন। সম্ভবত কুভা[১] এবং সুবাস্তু[২] উপত্যকায় থাকিবার সময় আর্যদের মধ্যে গোত্রসত্তা সৃষ্টি হয়। এই সময়টি ভারতীয় সমাজের জনসত্তা ও পিতৃসত্তার মধ্যবর্তী কাল হইতে পারে।

বর্বর যুগের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে জনসত্তার প্রতিষ্ঠা হয়। ক্রমে এই অবস্থা বিকাশের চরম শিখরে পৌছিলে সমাজদেহে নূতন রূপান্তর ঘটে। জনসাত্তিক সমাজ হইতে তখন নূতন শিশু পিতৃসত্তার জন্ম হয়। সমাজ-লক্ষণের দিক দিয়া পিতৃসত্তা জনসত্তার বৈরী স্বরূপ। তাই ইহার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সমাজ-

১। কাবুল ; ২ স্বাত

ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়। জনসাত্তিক সমাজের মানুষ লিপি আবিষ্কার করে নাই; ছন্দ বা গীতেও তাহাদের তেমন পারদর্শিতা ছিল না,—অথবা হইতে পারে, তাহাদের গীতকুশলতার পরিচয় আমাদের কাছে পৌঁছে নাই—হাজার বৎসর[1] পূর্বের জনযুগীন নিদর্শন সত্যই আমাদের নিকট খুব কম। কিন্তু তবু সমাজের বিকাশ পৃথিবীর সর্বত্র একভাবে ঘটে নাই। বহুজাতির মধ্যে এখনও আদিম জনসত্তা ও পিতৃসত্তার যুগ চলিতেছে। ইহাদের সমাজ-লক্ষণ পাঠ করিয়া অতীত যুগের অনেক মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। মর্গেন আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়নদের জীবনরীতি অন্বেষণ করিয়া এইরূপ বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। মর্গেনের গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়া এঙ্গেল্‌স্ জনসত্তার যুগ[2] সম্পর্কে বলিতেছেন—

"আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়নদের অবস্থা জনসমাজের[3] পরিপূর্ণ বিকাশের নিদর্শন। ইহাদের প্রত্যেক গোষ্ঠী[4] বহুভাগে, মূলত দুই ভাগে অর্থাৎ দুই জনতে[5] বিভক্ত থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রত্যেক জনতও বহু জনতে বিভক্ত হইয়া যায়, তখন এইসব নূতন জনতের সঙ্গে প্রথম জনতের ভ্রাতৃক[6] সম্বন্ধ হয়। পুরাতন গোষ্ঠী সেখানে এই ভাবে বহু ছোট গোষ্ঠীর রূপ নেয়; কিন্তু প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই সেই পুরাতন জনত বজায় থাকে। কোন স্থানে সম্বন্ধী গোষ্ঠীগুলি একটি সংঘ দ্বারা পরস্পর সম্পর্কিত হয়। এই অবস্থায় যে সংগঠন উপযোগী, রেড ইণ্ডিয়নদের সংগঠন ঠিক তাহাই এবং তাহাদের ঝগড়া মতভেদ প্রভৃতির মীমাংসার জন্য এই সংগঠনই পর্যাপ্ত। বাহিরের ঝগড়া তাহারা যুদ্ধ দিয়া মীমাংসা করে;—তাহাতে একটি গোষ্ঠী একেবারে নাশ হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়; কিন্তু নির্জিত গোষ্ঠীকে ইহারা কখনও পরতন্ত্র করে না। ইহা জনসত্তার সত্য, কিন্তু সীমিত, স্বরূপ—এখানে পরতন্ত্র বা দাসতার কোন স্থান নাই। জনসমাজের মধ্যে অধিকার এবং কর্তব্য পৃথক বস্তু নয়.... সার্বজনিক কাজে সামিল হওয়া, বংশগত ভাবে প্রতিশোধ লওয়া, কিংবা অন্য কোন প্রকার শান্তি বা স্বস্তির জন্য কাজ করা—ব্যক্তির অধিকার না কর্তব্য এই বিচার সেখানে অর্থহীন। আহার, নিদ্রা এবং শিকারের মত এইসব বিষয়েও অধিকার বা কর্তব্যের কোন ভেদাভেদ নাই।

"ইণ্ডিয়নদের মধ্যে জনসংখ্যা খুব কম; তাই তাহাদের আবাদী ভূমিও খুবই কম। ইহাদের মধ্যে বসতিগুলিতে জনসংখ্যা ঘন। তাহাদের আবাদী জমির চারিদিকে বিস্তৃত শিকারক্ষেত্র এবং শিকারক্ষেত্রের চারিদিকে আবার অরণ্যের বেষ্টন; এই প্রাকৃতিক অবরোধ জনবসতির রক্ষাপ্রাচীরের মত কাজ করে; এক

১। এক হাজার নয়, কয়েক হাজার; ২। বর্বর সমাজের পূর্ববর্তী; ৩। Gens; ৪। Tribe; ৫। Gentes; ৬। Phratry.

গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর সীমান্ত হিসাবেও ইহার মূল্য আছে। রেড ইণ্ডিয়নদের মধ্যে শ্রমবিভাগ খুবই স্বাভাবিক, অর্থাৎ ইহা শুধু স্ত্রী-পুরুষের কাজ সম্পর্কে। পুরুষ সেখানে যুদ্ধ করে, মাছ এবং পশু শিকার করে এবং প্রয়োজনমত অস্ত্র নির্মাণ করে ও খাগ্য সংগ্রহ করে। স্ত্রী ঘরের কাজের তত্ত্ব নেয়, খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করে এবং সীবন, বয়ন ও রন্ধনে ব্যাপৃত থাকে। স্ত্রী-পুরুষের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ইহাদের পূর্ণ আধিপত্য আছে। ইণ্ডিয়ন সমাজে পুরুষ অরণ্যের স্বামী এবং স্ত্রী গৃহের কর্ত্রী। ইহাদের নিজেদের* নির্মিত বা ব্যবহৃত হাতিয়ারপত্রে ইহাদের নিজেদেরই অধিকার। এইভাবে মাছ কি পশু মারিবার হাতিয়ারের কর্তা হইল পুরুষ এবং ঘরের তৈজসপত্রের মালিকা হইল স্ত্রী। ইহাদের কয়েকটি পরিবারে মিলিয়া একটি ঘর থাকে। কখনও কখনও ঘর এত বড় হয় যে তাহাতে ৭০০ লোক একত্র বাস করে। উত্তর-পশ্চিম তটের ইণ্ডিয়ন বা রাণী শার্লটে দ্বীপের হুইদো ও সুংকা গোষ্ঠীর মধ্যে এই লক্ষণ বেশি দেখা যায়।....সকলে মিলিয়া কোন বস্তু তৈয়ার করিলে কিংবা ব্যবহার করিলে...তাহা ইণ্ডিয়নদের সাংঘিক সম্পত্তি-রূপে গণ্য হয়। ঘর, বাগ, নৌকা প্রভৃতি সেখানে এইরূপ সাংঘিক সম্পত্তির অন্তর্গত।"

২। বিবাহ

জনসত্তা যুগে, বিশেষ করিয়া তাহার আরম্ভ সময়ে, সমাজে মাতৃ-কর্তৃত্ব প্রচলিত ছিল। তখন সম্পত্তির অধিকাংশ সাংঘিক হইত; পারিবারিক সম্পত্তি যাহা কিছু থাকিত, তাহাতে শুধু কন্যারই অধিকার বর্তাইত। বাহিরের বিরোধী অবস্থার সংস্পর্শে না আসিলে সামাজিক রীতির পরিবর্তন হয় না। কেরলের† নায়রদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীতেও সম্পত্তির উপর শুধু কন্যার অধিকার স্বীকৃত হইত। অব্রাহ্মণনেতা ডাঃ টি, এম, নায়রের বিশেষ চেষ্টায় এই প্রথা রহিত হইয়াছে; এখন নূতন আইনে নায়রদের সম্পত্তিতে পুত্রের দাবিও গ্রাহ্য হয়। কেরলে অব্রাহ্মণদের উপর আদিম বন্য সমাজের দায়ভাগ চাপাইয়া রাখার কারণ কি? অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে কেরলী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের যথেষ্ট স্বার্থ ছিল। কেরলে নম্বুদরী ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই জমিদার, জায়গীরদার;—শতকরা একশত জনই তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত। ইহাদের ক্ষেতখামার বা কোনরূপ শারীরিক শ্রমের এলেকা রাখিতে হয় না। তাই স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থাকিবার সুযোগ ইহাদের বেশি। এই নম্বুদরী ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি কন্যাদের মধ্যে বণ্টিত হয় না। এমন কি তাঁহাদের পুত্রদের মধ্যেও

* স্ত্রীর অথবা পুরুষের। † মালাবার।

একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির অধিকারী হয়। অন্য পুত্রেরা সাধারণত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আশ্রিত হইয়া থাকে; অথবা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির একমাত্র কন্যা খুঁজিয়া তাহার পাণিপীড়ন করে। কেহ অবশ্য নিজের বিদ্যাবুদ্ধিতে নূতন উপার্জনের পথও খুঁজিয়া লয়। কিন্তু ইহার মধ্যে শেষোক্তদের সংখ্যা যে খুবই কম তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একক উত্তরাধিকার পরিত্যক্ত হইয়াছে; এই দৃষ্টান্তে নম্বুদরী ব্রাহ্মণের সন্তানেরাও নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণদের পক্ষে ইহার সমাধান খুঁজিয়া বাহির করা মোটেই কঠিন নয়; কারণ ধর্মের আখ্যান ব্যাখ্যান—এই উভয়েরই ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত আছে। নায়রদের মধ্যে পুত্রীর উত্তরাধিকার প্রথম হইতেই চলিয়া আসিতে পারে; কিন্তু তাহাকে সহস্র বৎসর চিরায়ু রাখার মধ্যে ব্রাহ্মণদের হাত আছে; আর ব্রাহ্মণেরা যে একেবারে নিঃস্বার্থভাবে এই প্রথা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এমনও নহে। নম্বুদরী ব্রাহ্মণদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র সম্পত্তির অধিকারী হয়;—এইজন্য ব্রাহ্মণকন্যাব পাণিগ্রহণের অধিকারও একমাত্র তাহারই। অন্যেরা সম্পত্তিহান বলিয়া ব্রাহ্মণকুমারীর পাণি-পীড়নের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। ইহার ফলে নম্বুদরী ব্রাহ্মণদের বহু কন্যা চিরকুমারী থাকিতে বাধ্য হয়। সমাজ ইহাদের জন্য অন্য কোন গতি নির্দেশ করিতে পারে নাই; আর আর্থিক লাভ না থাকায় হয়ত বা বিশেষ চেষ্টাও করে নাই। কিন্তু সম্পত্তিহীন অনুজ পুত্রদের বেলায় সমাজ বেশ কৌশলী হইয়াছে; ব্রাহ্মণকুমার ইচ্ছা করিলেই নায়রকন্যার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। এই সম্পর্কের মধ্যে কতকগুলি সামাজিক সর্তও খাড়া করা হইয়াছে; এখানে নায়রকন্যা নিজেকে ব্রাহ্মণকুমারের পরিণীতা পত্নী বলিয়া স্বীকার করিবে; কিন্তু স্বামীর দিক হইতে এইরূপ কোন অঙ্গীকারের প্রয়োজনীয়তা নাই। এই বিবাহে স্বামী স্ত্রীকে সংসর্গকাল ছাড়া সকল সময়ই অস্পৃশ্য জ্ঞান করিবে--কখনও তাহার হাতের অন্নজল পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না। এমন কি, বিবাহজাত সন্তানের ভরণপোষণের জন্যও বর্ণশ্রেষ্ঠ পিতার দায়িত্ব নাই; এই ভার গ্রহণের জন্য নায়রপুত্রীদিগকে পূর্ব হইতে সম্পত্তির অধিকারিণী করা হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তে বোঝা যায়, কেরলে কন্যার উত্তরাধিকার স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য চলিত রাখা হয় নাই; সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণের জন্যই ইহার প্রচলন রহিয়াছে।

কেরলের রাজবংশেও এই প্রথার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সেখানে রাজার পত্নী শুধু পত্নীই, তাঁহার রাণী হইবার কোন ক্ষমতা নাই। রাজপুত্রেরাও এইভাবে শুধু পুত্রের অধিকারই পাইয়া থাকে, তাহারা কখনও যুবরাজ

হইতে পারে না। এই সমস্ত রীতিতেও পূর্বের স্বার্থ-সংরক্ষণের ব্যাপারই লক্ষিত হয়। কেরলরাজ্যে রাজার উত্তরাধিকারী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়; আর রাণী হইবার অধিকার রাজার ভগিনী বা মা-মাসীর জন্য রক্ষিত থাকে। কেরলের রাজপুত্রীরা সাধারণত ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে পরিণীতা হয়; কারণ ইহা সমাজের ঈপ্সিত সম্পত্তি প্রথার বিশেষ অনুকূল।

জনসাত্তিক সমাজে প্রাচীন সাম্যবাদী বিবাহ প্রথার পরিবর্তন হয়। এই সময় যূথবিবাহের প্রচলন উঠিয়া যায় এবং নিজের জন অর্থাৎ গোত্রের মধ্যে বিবাহকার্য নিষিদ্ধ হয়। মাতাপুত্র, পিতাপুত্রী এবং ভ্রাতা ও ভগ্নীর সংসর্গ তখন হইতে অন্যায় বিবেচিত হইতে থাকে; এমন কি এক রক্ত-সম্পর্কিত অনেক আত্মীয়ের মধ্যেও তাহা আর পূর্বের মত সমর্থিত হয় না। তবে ইহার ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও অবশ্য যথেষ্টই আছে; বর্তমান যুগেও এই প্রথা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই—ইহাকে আমরা সমাজের অসম গতির নিদশন বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। জন বা গোত্রযুগের বিবাহ প্রকৃতপক্ষে মিথুন-বিবাহ; *ইহা একপত্নী বিবাহের একটি শিথিল রূপভেদ। এই বিবাহে একজন স্ত্রী একমাত্র পুরুষেরই পত্নী হইতে পারে; তবে কালিক স্থায়িত্ব সম্পর্কে ইহাতে কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নাই। মহাভারতের শ্বেতকেতু উপাখ্যানে† আমরা এইরূপ বিবাহের নিদশন পাইতেছি। শ্বেতকেতুর মাতাকে এক ঋষি যৌনক্রিয়ার জন্য লইয়া যাইতে চান। শ্বেতকেতু তখন বাধা দিলে তাঁহার পিতা ঋষির ইচ্ছাকে ধর্ম‡ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া শ্বেতকেতু এই প্রথা রহিত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন এবং পরে ঋষি হইয়া তিনি মিথুন বিবাহের স্থলে স্থায়ী বিবাহ প্রতিষ্ঠা করেন।

৩। অস্ত্র ও হাতিয়ার

জনযুগে আসিয়া মানুষ তাহার পুরাতন পাষাণ অস্ত্রকে আরও একটু শাণিত করিয়া লইল। আদিম অমসৃণ প্রস্তরাস্ত্রের স্থলে এইবার দৃঢ়, মসৃণ ও তীক্ষ্ণ অস্ত্রপাতির আবির্ভাব ঘটিল। প্রাচীন নিক্ষেপাস্ত্র ছাড়া এই সময় কাঠের হাতল দেওয়া পাথরের কুঠারেরও প্রচলন হয়। ইহার উপযোগিতা ও সুলভতার জন্য তাম্র, পিতল, এমন কি লৌহযুগ পর্যন্ত তাহার ব্যবহার দেখা যায়। ইংলণ্ডে ১০৬৬ খ্রীষ্ট সনে হেষ্টিংসের যুদ্ধের সময়ও ইহা যুদ্ধাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

*Pairing Marriage; † আদিপর্ব, ১৮ অধ্যায়; ‡ সমাজ অনুমোদিত কর্ম।

কোন কোন স্থানে ধনুর্বাণের আবিষ্কার অবশ্য বহু পূর্বেই হইয়া গিয়াছিল; তবে পৃথিবীর সকল স্থানে ইহার প্রচলন এক সময়ে হয় নাই। হিন্দু-য়ুরোপীয়দের মধ্যেও ধনুর্বাণের ব্যবহার বহু পরে আরম্ভ হয়। ইরাণী, হিন্দু, স্লাভ প্রভৃতি ভাষায় ধনুর্বাণের জন্য কোন একমূল শব্দ নাই। রোমক, গ্রীক, স্লাভ এবং পশ্চিম য়ুরোপের প্রাচীন ভাষায়ও ইহার কোন নিদর্শন মিলিতেছে না। হিন্দু ও ইরাণী ভাষায় গোধূম, ব্রীহি, যব প্রভৃতি বহু শস্যবাচক প্রাচীন শব্দ আছে। ইহাতে মনে হয়, এই দুই জাতি বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বে তাহাদের সমাজে কৃষিকর্মের প্রসার হইয়াছিল। হিন্দীআর্যদের মধ্যে কৃষির পর ধনুর্বাণের চলন সমাজের ভিন্নমুখী বিকাশেরই পরিচয়। জন্মযুগে ধনুর্বাণ ও কুঠারাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে খননকর্তনের জন্য অন্যান্য ক্ষুদ্র অস্ত্রও ছিল। তখন পর্যন্ত তামা, পিতল, বা লোহার আবিষ্কার হয় নাই; এইজন্য কাঠ, পাথর এবং হাড়ের সাহায্যেই ইহাদের নির্মাণ চলিত। জনযুগে সীবন ও বয়নের অনেকটা উন্নতি হয়; নূতন হাতিয়ারের সহায়তায় মানুষ চর্ম যুগ হইতে একপাদ আগাইয়া আসে।

৪। সম্পত্তি

শিকারলব্ধ মৎস্য অথবা মাংসকে কখনও স্থায়ী সম্পত্তির অন্তর্গত করা চলে না। এইজন্য পশুর শৃঙ্গ, চর্ম এবং শুষ্ক ফল-মূলকেই জনযুগের সম্পত্তি বলিতে হয়। এই সম্পত্তি দীর্ঘদিন ধরিয়া রক্ষিত হইতে পারিত এবং প্রয়োজন হইলে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে ইহাদের বিনিময়ও হইত। ধনুর্বাণ আবিষ্কারের পর শিকার এবং স্বরক্ষা ব্যাপারে মানুষের শক্তি বাড়িয়া যায়; কিন্তু ইহাতে সমাজে বিরাট পরিবর্তন তেমন কিছু হয় নাই। পুরাতন হাড় বা পাথরের অস্ত্র দিয়াও এই কাজ একরকম চলিয়া যাইত।

কিন্তু শিকার জীবিকার উপায় হইলে কতকগুলি আনুষঙ্গিক অসুবিধা আছে। প্রথমত, শিকারের সফলতা খুবই অনিশ্চিত; তার উপর জনসংখ্যা বাড়িয়া গেলে শিকারলব্ধ দ্রব্যে গোষ্ঠীর সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। ফলের সাহায্যে যে এই সংখ্যা পূরণ করিয়া লওয়া যাইবে, তাহাও আবার সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না; কারণ ফলের ফসল বৎসরের বারমাস এক রকম থাকে না। এইসব অসুবিধার জন্য জনযুগের মানুষকে নূতন জীবনোপায় চিন্তা করিতে হইয়াছে। ইহা প্রথমেই তাহাদের চোখে পড়িয়াছে—চরভূমিগুলিতে তৃণের অভাব হইলে সমস্ত শিকারও দেশছাড়া হইয়া যায়; তাই ইহার নিবারণের জন্য তৃণের উৎপাদন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার রক্ষণেরও প্রয়োজন। আজ শিকারী বনপশুর সদ্যোজাত বাচ্চা পাইলে প্রায়ই তাহাকে গৃহে লইয়া আসে;

তখনও মানুষ এইভাবে গরু, ঘোড়া এবং ছাগ-ভেড়ার বাচ্চা আনিয়া গৃহে প্রতিপালন করিত। প্রথমত, হইতে পারে যে, ইহাতে কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না, তখন শুধু মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যই পশুপালন করা হইত; কিন্তু ক্রমে ইহার আর্থিক সুবিধার দিকও মানুষের চোখে পড়িল এবং তখন হইতে পশু মানুষের জীবিকার নূতন সাধন হইয়া উঠিল। এইভাবে পশু মানুষের ধন হইয়া জনের সাংঘিক সম্পত্তিতে পরিণত হইল; ঘর এবং চরভূমি প্রভৃতির মত ইহার উপরও আর বৈয়ক্তিক কোন অধিকার রহিল না। আজ মানুষ সামূহিক সম্পত্তির কথা ঠিক ভাবিয়া উঠিতে পারে না; ঠিক এইরূপ, তখনও বৈয়ক্তির সম্পত্তির কথা চিন্তা করিতে মানুষের কষ্ট হইত।

৫। শিল্প ও ব্যবসায়

জনযুগের ঘরবাড়ী, ঘাসক্ষেত, শিকারস্থল এবং পশু—সমস্তই সংঘের সম্পত্তি ছিল। আদিম যুগের মানুষ কাঁচা মাংস খাইত;—কিন্তু জনযুগে পৌছিবার পূর্বেই তাহারা পোড়া মাংসেরও স্বাদ পাইয়া গিয়াছিল। কাঁচা মাংসের সঙ্গে পোড়া বা ভূনা মাংসের স্বাদের যে প্রভেদ আছে, ইহা তাহারা দাবদগ্ধ পশুপক্ষীর মাংস হইতে প্রথম বুঝিয়া থাকিবে। কিন্তু পোড়া মাংস হইতে সিদ্ধ মাংসের স্বাদ যে আরও বেশি—ইহা বুঝিতে মানুষকে বহুদিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইয়াছে। ধাতু ও মৃৎশিল্পের বিকাশ ঘটিবার পূর্বে রন্ধনপাত্রের কোন অস্তিত্ব ছিল না—তাই রন্ধনের কলাকৌশল সম্পর্কেও কোন প্রকার উন্নতি পূর্ববর্তী যুগে সম্ভব হয় নাই। পশুর চামড়া ও মাংসের প্রয়োজনে শিকারের বিকশিত স্তর হিসাবে প্রথম পশুপালন আরম্ভ হয়। কিন্তু দুধ, মাখন বা দুগ্ধজাত অন্যান্য জিনিসের ব্যবহার আরম্ভ হইতে ইহার পরও অনেক দেরি লাগে।

জনসমাজে শিল্প বা কলা-সংক্রান্ত বিষয়ে খুব বেশি পরিবর্তন হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু এই সময় শিকারের অতিরিক্ত পশুপালনের প্রচলন হয়; ইহাতে সমাজে পশুর ব্যবসায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী শ্রেণী গড়িয়া উঠে। তখন অন্যের জিনিসের সঙ্গে নিজ নিজ জিনিস বিনিময়ের জন্য বিনিময়-বস্তুরও নির্মাণ আরম্ভ হয়। ইহাতে গৃহশিল্প, অনুপাতে না হইলেও অন্তত বিশেষতার দিক দিয়া, অনেক উন্নতি লাভ করে। পূর্ব অভ্যাসের জন্য এই সময় পোস্তিন* হয়ত আরও বেশি করিয়া নির্মাণ হয়,—আর ইহার সঙ্গে জুতা এবং অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তুর নির্মাণকৌশলও উন্নতি লাভ করে।

---

* পূর্বের শীতবাস স্মরণীয়; ইহা চামড়ার তৈয়ারী একপ্রকার কোট; আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং রুশ দেশের কোন কোন অঞ্চলে এখনও উহার ব্যবহার আছে।

*　*　*　*

ক্রোমেগ্নন মানবের চিত্রকলা সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। জনযুগের মানুষও তাহাদের মত রেখা এবং বর্ণচিত্র অঙ্কনে পারদর্শী ছিল। বর্তমানে গঙ্গপুরো কয়েকটি প্রস্তরোৎকীর্ণ চিত্রের আবিষ্কার হইয়াছে; এই চিত্রগুলির সমুদয়ই শিকারের দৃশ্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অনুরূপ চিত্রের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু দেবতা, প্রেত বা ধর্মসম্বন্ধী কোন ইঙ্গিত ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই চিত্রগুলি বস্তুত মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল;—আর চিত্রকলার ব্যবসায়ের যুগও ইহার বহু পরে আসিয়াছে। কাপড়, পোস্তিন, জুতা, প্রভৃতি ব্যবহার্য দ্রব্যও তখন পর্যন্ত ঠিক পণ্যরূপ‡ পায় নাই। এইসব জিনিস তখন বিশেষভাবে পরিবারের জন্য তৈয়ারী হইত, তবে ইহার কিছু অংশ অবশ্য বিনিময়েও লাগিত। বিনিময়ের বেলায় নিপুণ হাতের জিনিসেরই চাহিদা বেশী হয়; এইজন্য জনযুগে শিল্পচাতুরী অনেকটা প্রোৎসাহন পাইয়াছিল।

৬। শাসন

জন বলিতে একবংশাগত মানুষের প্রাচীন সমাজকে বুঝাইয়া থাকে। ইহারা তখন অরণ্য বা পর্বতের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সীমার ভিতর গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাস করিত। বসতির স্থায়িত্ব না থাকিলেও প্রত্যেক জনের বিচরণভূমি তখন নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত থাকিত। তখন জনের আভ্যন্তরিক কলহ বিবাদ মিটাইতে তাহাদের পঞ্চায়েতই পর্যাপ্ত ছিল। অন্য জনের উপর প্রতিশোধ লইতে হইলে, কিংবা নিজেদের ভূমি রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে, জনের প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষই কাঠ, পাথর বা হাড়ের অস্ত্র, কিংবা তীরধনুক লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিত। জনের শাসনতন্ত্র শুধু নিজেদের আন্তরিক ন্যায়রক্ষা কিংবা বহিঃশত্রুর নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিয়াই নিস্তার পাইত না; সমগ্র জনের আর্থিক সংস্থানের ভারও ইহারই উপর ন্যস্ত থাকিত এবং শীতের জন্য জনের পোস্তিন, ইন্ধন ও ক্ষুন্নিবারণের জন্য আহার্য সংগ্রহের চিন্তাও জনের শাসনতন্ত্রকেই করিতে হইত। বন্যা, বর্ষা, রৌদ্র, হিমপাত কিংবা বালুকাঝড়—সকল রকমের প্রাকৃতিক বিপত্তি হইতে জনকে বাঁচাইবার চিন্তাও ইহারই ছিল। ইহাতে জনের শাসনতন্ত্রের দায়িত্ব ছিল অসাধারণ; কিন্তু তবুও সরল রকম আধুনিক পদ্ধতি ছাড়া—এমন কি বিনা জেল-পুলিশে—জনসংঘ খুব সুচারু-

† ছত্রিশগড়; ‡ বিক্রয়ের জন্য নির্মিত বস্তু।

ভাবেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিত। এঙ্গেল্‌স্‌ একজন মানবতত্ত্ববেত্তার উক্তির সাহায্যে জনযুগের নিম্নোক্ত রূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—

"সরলতা ও স্বাভাবিকতার দিক দিয়া এই জনসংস্থা কতই না আশ্চর্যজনক ছিল! ইহাতে সৈনিক ছিল না, সিপাহী ছিল না, পুলিশ ছিল না, কোন সর্দারও ছিল না; রাজা, উপরাজা, ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ কিছুই ছিল না; জনসংঘে জেল ছিল না, দেওয়ানী মোকদ্দমার নামও তখন লোকে শুনে নাই। তবু সকল কাজই ইহাতে সুগমতার সহিত সম্পন্ন হইত। জন, জনত বা গোষ্ঠী নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদ নিজেই মীমাংসা করিয়া লইত। প্রতিশোধ লইবার প্রয়োজন তখন বড় হইত না; এখনকার ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ড ইহারই অবশেষ, কিন্তু আগের মত ইহা আর বিরল নয়। জনসংঘে বর্তমান শাসন বিভাগের জটিলতা কিংবা তাহার ব্যর্থ রীতিনীতির কোন আবশ্যকতা ছিল না। সাংঘিক ঘর তখন বহু পরিবারের ব্যক্তি একত্রে ব্যবহার করিত; তখন ভূমিও সমগ্র গোষ্ঠীর হইত, শুধু বাগের একটু ভাগ প্রতি পরিবারের জন্য পৃথক থাকিত।

"জন, গোষ্ঠী এবং ইহার সম্পর্কিত অন্যান্য সংস্থা তখন ব্যক্তির নিকট পবিত্র ছিল। সংঘের অনুশাসন তখন তাহার নিকট অনুল্লঙ্ঘনীয় ছিল। প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত জন মানুষের চোখে লোকোত্তর সংস্থা বলিয়া প্রতীত হইত এবং ব্যক্তির চিন্তা, বেদন, ক্রিয়া সকলই বিনা সর্তে জনের অধীন থাকিত।"

৭। ধর্ম

প্রাকৃতিক শক্তি, অর্থাৎ সূর্য, আগুন, বিদ্যুৎ, বর্ষা প্রভৃতি সমস্ত অ-স্থির পদার্থই আদিম মানুষের মনের ভীতির সঞ্চার করিত। নেঅণ্ডর্থল মানব সম্পর্কে জানা যায় যে, মৃতদেহ সংকারে ইহাদের বিশেষ রকম আড়ম্বরের ব্যবস্থা ছিল। ইহাতে মৃত্যুও যে আদিম মানুষের মনে একটি বিশেষ ভাবের সৃষ্টি করিত, তাহা অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত হইবে না। তখনকার দিনে রাত্রি, বিশেষ করিয়া অন্ধকার রাত্রি, মানুষের সম্মুখে শুধু কাল্পনিক নহে—বাস্তবিক শত্রুরই আগম ঘটাইয়া দিত। কিন্তু এইসব ভয়, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে হর্ষের কারণগুলিকেও, মানুষ যে তখন ধার্মিকভাবে গ্রহণ করিত—এমন কোন প্রমাণ নাই। ধার্মিক ভাবের মূল উদ্দেশ্য হইল আত্মসমর্পণ করা, অর্থাৎ এই সব অজ্ঞাত এবং অবাস্তবিক শত্রুর সন্তুষ্টির জন্য নিজের হীনতা প্রকাশ করা। কিন্তু তখন অজ্ঞাত শত্রু সম্পর্কে ভয় থাকিলেও মানুষ তাহার সম্মুখে অস্ত্রত্যাগ করিতে শিখে নাই; ছলে বা বলে যে ভাবেই হউক, সে তখন শত্রুকে তাহার স্ববশে আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। বর্তমান যুগের সভ্য সমাজে ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায়

—এই রকম কোন বস্তুরই তখন অস্তিত্ব ছিল না*; কিন্তু ধর্মের জন্য আবশ্যক ভূমি—অর্থাৎ অজ্ঞানতা এবং ভয় সেই সমাজেও বর্তমান ছিল। পরবর্তী যুগে ধর্মের নামে জীবিকা অর্জনকারী কুটিল ও স্বার্থী পুরোহিতবর্গের উদ্ভব হয়, এবং হয়ত তখন হইতে ধর্মের প্রকৃত বিস্তৃতি ও প্রসার ঘটে।

জনসমাজের আচার-নিয়ম ও সদাচার খুবই সরল ছিল। ব্যৈক্তিক সম্পত্তি না থাকায় সমাজে তখনও চৌর্যের প্রচলন হয় নাই। সমাজের ব্যক্তিরা তখন প্রতি অস্থিমজ্জায় সাংঘিক ছিল; কোন প্রকার সংঘবিরোধী কাজ তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। পশ্চাৎপদ জাতির মধ্যে মিথ্যাভাষণ এখনও বড় একটা দেখা যায় না,—কারণ মিথ্যাভাষণের সঙ্গে সভ্যতা, অর্থাৎ বর্তমান ব্যৈক্তিক সম্পত্তির সভ্যতারই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সমাজের আচার বা রীতি নিয়ম চলিত অবস্থাকে স্থায়ী রাখিবার জন্যই সৃষ্ট হয়; কিন্তু কোন বিশেষ বর্গের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত হইলে ইহারও স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়া যায়; তখন নিয়মই আবার নিগড় হইয়া পড়ে, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরিবর্তন ঘটিলেও সহজে ইহার পরিবর্তন হইতে চায় না। জনযুগের আচার-শাস্ত্র প্রকৃতই সরল ছিল এবং জনজীবনও তেমনই সাংঘিক জীবন ছিল; সংঘের হানিকর সকল কাজই তখন দুষ্কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইত; আর বহু দুষ্কর্ম, অর্থাৎ চৌর্য প্রভৃতি, তখনও সামাজিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় নাই,—কারণ ব্যৈক্তিক সম্পত্তি না থাকায় চৌর্যই তখন ছিল না। চৌর্য আরও পরে, অর্থাৎ সাংঘিক সম্পত্তি নষ্ট হইয়া ব্যৈক্তিক সম্পত্তি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত হইয়াছে।

৮। সংক্রান্তিকাল

প্রকৃতির রাজ্যে বস্তুর সীমা নিশ্চিত করা সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার; কারণ প্রকৃতি কোন নির্দিষ্ট সীমাঙ্কের ভিতর পরিক্রমণ করে না—সীমারেখা লেপিয়া মুছিয়া একাকার করিয়া দিয়া প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে। জনসমাজের সাম্যবাদও যে কবে পরিবর্তিত হইয়া পিতৃসত্তা বা পুরুষপ্রধান যুগে উত্তীর্ণ হয়, তাহাও বলা কঠিন। তবে কালিক-বিচারে জনযুগ ও সভ্যযুগের সংক্রান্তিকালে ইহার উদ্ভব বলিয়া নির্দেশ দেওয়া যায়। পিতৃসত্তার যুগে জনতন্ত্রের সাম্যবাদী রূপ ও তাহার সংঘশাসনে আঘাত লাগে; কিন্তু ইহাতেই সমাজের জনরূপ একেবারে হঠাৎ নষ্ট হইয়া যায় নাই। ক্রমে ব্যৈক্তিক সম্পত্তির সৃষ্টি ও প্রসারের

* মাতৃদেবীর পূজা পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জাতির মধ্যেই দেখা যায়; হইতে পারে ইহা জনযুগে পুরাতন মাতৃতন্ত্রের প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল।

সঙ্গে প্রাচীন গোষ্ঠীবাদের বিলোপ ঘটে এবং ইহাতে সমাজের জনতান্ত্রিক গঠন ভাঙিয়া যায়। তাই বলিয়া পিতৃসত্তার সমাজে জনতান্ত্রিক রীতিনীতি যে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা নহে। পৃথকভাবে ইহার আলোচনা করিতেছি বলিয়া পিতৃসত্তাকে জনসত্তার সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন মনে করিলে ভুল হইবে। পিতৃসত্তার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে জনযুগের পরিপূর্ণ অবসান হয় নাই; তবে ইহার প্রভাবে সমাজদেহে কতকগুলি নূতন রূপান্তর হয় এবং ক্রমে জনযুগেরও অন্তকাল ঘনাইয়া আসে। এঙ্গেল্‌স্ ইহার বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন:—

"আসুন, সমাজবিপ্লবের ফলে জন কি অবস্থায় পৌঁছিল তাহা আমরা আলোচনা করি। যে নূতন সমাজ এখন জনের স্থান অধিকার করিল, তাহা জনের সহায়তা ছাড়াই সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার উপর জনের কোন প্রতিপত্তি ছিল না। জনের বাঁচিবার জন্য এক বা বহু জনের মিলিত সমগোষ্ঠিক সমাজের প্রয়োজন ছিল; তার উপর অন্যের অধিকারবর্জিত ভূমি এবং সেই ভূমির উপর জনের একাধিপত্যেরও দরকার ছিল। কিন্তু কালক্রমে ইহা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সর্বত্রই একজনের নির্দিষ্ট ভূমির মধ্যে অপর জন বা জনসংঘের ব্যক্তিরা আসিয়া বসতি স্থাপন করে। এখন পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহে এক জন অপর জনকে সম্পূর্ণ নাশ করিয়া দিয়াছে,—কোন কোন ক্ষেত্রে নরভক্ষণ চলিত থাকায় শত্রুকে শুধু সংহার নয়, একেবারে আহারও করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু মানুষকে বন্দী করার প্রথা তখনও সৃষ্ট হয় নাই। পরবর্তীকালে পিতৃসত্তার যুগে দাসত্বের সূত্রপাত হয়; তখন হইতে শত্রুকে শেষ না করিয়া দাস করা বেশি লাভজনক বিবেচিত হইতে থাকে। ইহাতে জনের একবংশিকতা আরও নষ্ট হইয়া যায়।"

(খ) পিতৃসত্তা

জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব অবশ্য প্রথম হইতেই সমাজের পুরুষের উপর ন্যস্ত ছিল, জীবিকার সমস্ত সাধন এবং তাহার উপযোগী হাতিয়ারপত্র নির্মাণের ভারও ছিল পুরুষেরই। এইভাবে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং হাতিয়ারের স্বাভাবিক কর্তাই ছিল পুরুষ। পরে পশুপালন জীবিকার এক নূতন সাধন হইয়া উঠে; তখন পশুর পালন এবং চারণের দায়িত্ব আবার পুরুষই গ্রহণ করে। ইহাতে গৃহপশুও পুরুষের সম্পত্তি হইয়া যায়; পশুর বিনিময়ে প্রাপ্ত জিনিস বা দাসদাসী—ইহাদের উপরও পুরুষেরই স্বামিত্ব স্বীকৃত হয়; পুরুষের অধিকৃত হাতিয়ারের সাহায্যে তৈয়ারী বস্তুপাতিও পুরুষের হইয়া পড়ে; ব্যয়ের পর যে সব জিনিস সঞ্চিত থাকিত তাহাও পুরুষদের দখলে আসে। এই সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করিবার

অধিকার অবশ্য স্ত্রীজাতিরও ছিল ; কিন্তু কথা এই, স্ত্রী কখনও ইহার স্বামিনী হইতে পারিত না।

বন্য যুগের পুরুষ খুব সাংঘাতিক ক্রূর ও দুঃসাহসিক ছিল ; এমন কি শুধু শিকারে সংঘর্ষেই তাহাদের দিন কাটিয়া যাইত ;—তথাপি স্ত্রীজাতির অধীন থাকায় তাহারা অসন্তুষ্ট ছিল না ; পশুচারণার যুগের পুরুষ স্বভাবের দিক দিয়া অনেকটা নম্র ; কিন্তু তাহা হইলেও নিজেদের সম্পত্তি—অর্থাৎ স্থায়ী পশুধন সম্পর্কে ইহারা সচেতন ছিল। এই প্রেরণায় পশুর স্বামী পুরুষ স্ত্রীজাতির সিংহাসন কাড়িয়া লয় ; এবং নিজে সমাজের স্বামী হইয়া স্ত্রীকে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া দেয়। স্ত্রীজাতির পক্ষ হইতে সর্বত্র ইহার প্রতিবাদের উপায় ছিল না।* ক্রমে নূতন শ্রমবিভাগ আসিয়া স্ত্রী-পুরুষের কর্তব্য নির্ধারিত করিয়া দিল। কর্তব্যবিভাগের সঙ্গে আবার সম্পত্তিতেও নূতন রকমের বিভাগ দেখা দিল। কিন্তু এইবার সম্পত্তিতে স্ত্রীজাতির মালিকত্বের কোন প্রশ্ন উঠিল না ; একমাত্র উপভোগের অধিকারিণী হইয়া স্ত্রী সমাজে বাস করিতে লাগিল। তারপর আবহমান কাল ধরিয়া এই প্রথাই সমাজে চলিয়া আসিয়াছে।

গৃহকর্মের ভার আদিম যুগ হইতেই স্ত্রীর উপর ন্যস্ত ছিল ; কিন্তু পিতৃসত্তার যুগে ইহার দায়িত্ব বা সম্মান কিছুই আর পূর্বের মত অক্ষুণ্ণ থাকিল না। পূর্বে স্ত্রীজাতি সমাজে প্রধান ছিল,—তাই গৃহকর্ম পরিবারের উপর তাহার এককর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিত ; আর এখন আবার সেই গৃহকর্মই তাহার কর্তৃত্বচ্যুতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ইহা কি ভাবে সম্ভব হইল ? পশুপালন শুরু হইবার পর পুরুষের কাজের সম্মুখে স্ত্রীর কাজ নগণ্য হইয়া যায়। কারণ পশুপালন তখন উপযোগিতার দিক দিয়া সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে মুখ্য ; আর স্ত্রীর কাজ হইল অমুখ্য, গৌণ—অর্থাৎ পুরুষের কাজের পরিশিষ্ট মাত্র। পশুচারণার যুগ আজ বহু দিন অতীত হইয়াছে, কিন্তু এই পুরাতন শ্রমবিভাগ এখনও দূর হয় নাই।† তাই পুরুষপুঙ্গব কথায় কথায় স্ত্রীকে বিদ্রূপ করিতে পারে, 'তুমি ত ঘরের ভিতর বসিয়া বসিয়া দিব্যি আরাম করিতেছ ! কিন্তু রোজগার করিতে মাথার ঘাম

* কিন্তু কোন কোন স্থানে ইহার প্রতিবাদই শুধু নয়, স্ত্রীজাতি তাহার অধিকারের সুরক্ষার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ পর্যন্ত করিয়াছে। *Evolution of Property* গ্রন্থে Paul Lafargue লিখিতেছেন : This dispossession gave rise to heroic combats ; the women took up arms in defence of their privileges and fought with such desperate energy that the whole of Greek Mythology and even recorded history have preserved the memory of their struggles.

† বর্তমানে অবশ্য ইহার পরিবর্তনেরও লক্ষণ দেখা যাইতেছে ; কারণ পরিবারের বাহিরে স্ত্রীপুরুষের পুরাতন শ্রমবিভাগ আর নাই।

যে পায় পড়ে তাহা বুঝিতে পার কি ?' পুরুষের এই উক্তি অবশ্য সাধারণভাবে সত্য নয় ; কারণ একমাত্র ধনাঢ্য পরিবারের স্ত্রী ছাড়া অপর সকলেই সমাজের জন্য পরিশ্রম করে। তবে স্ত্রীস্বাতন্ত্র্য বা সমাজে স্ত্রীকে পুরুষের সমান স্থান পাইতে হইলে শ্রমেরও প্রকারভেদ দরকার। জীবিকা অর্জনে পুরুষের সমান অংশ লইতে না পারিলে স্ত্রী পুরুষের সমান হইতে পারে না। স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীরও মুখ্য কাজ হইবে জীবিকা অর্জন ; আর গৃহকাজ তখন শুধু ইহার পরিশিষ্ট হিসাবেই সঙ্গে থাকিবে।

পুরুষ জীবিকা অর্জনে প্রধান স্থান অধিকার করিবার পব পরিবারে তাহার একাধিপত্যের সমস্ত বাধা দূর হইয়া যায়। মাতৃসত্তা বা স্ত্রীপ্রধানতা এইভাবে সমাজ হইতে বিলুপ্ত হয় এবং তাহার স্থলে পিতৃসত্তা বা পুরুষপ্রাধান্যের নিষ্কণ্টক রাজ্য কায়েম হইয়া পড়ে। একদিন পশুধন তাহার স্বামী পুরুষকে সমাজের প্রধান করিয়া দিয়াছিল ; এবং এই পশুধনই পরে সমাজে ব্যক্তির প্রভুত্ব এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যৈক্তিক সম্পত্তিরও পথ খুলিয়া দেয়। এইভাবে পিতৃসত্তার স্থাপনা হইবার পর আদিম সাম্যবাদের প্রভাবগুলি একে একে সমাজ হইতে মুছিয়া যাইতে থাকে।

বিভিন্ন দেশে পিতৃসত্তা

(১) **ভারতবর্ষে**—পৃথিবীর প্রাচীন জাতি সমূহের ইতিহাসে পিতৃসত্তাকে প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত করিয়া লইতে হয় ; কারণ তখন হইতে ইতিহাসের ক্ষীণ উপকরণ আমাদের হাতে আসিতে আরম্ভ করে। বৈদিক আর্যেরা ভারতে পদার্পণ করিবার পূর্বে* তাহাদের পিতৃসত্তা যুগ অতীত হইয়া গিয়াছিল। গঙ্গা উপত্যকায় আসিয়া প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের সমসাময়িক কালে তাহারা বেদ রচনা করে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্মরণীয়, প্রাচীন পিতৃসত্তা কালের স্মৃতি তখনও তাহাদের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। বেদমন্ত্রে শুধু মৃত নহে, জীবিত পিতার বা পিতৃ-পুরুষেরও স্তুতি এবং সৎকারের বহু দৃষ্টান্ত আছে। খুব সম্ভব আফগানিস্থানে থাকিবার সময় আর্যসমাজ সম্পূর্ণভাবে পিতৃসাত্তিক ছিল ; পরে পঞ্জাবে পরাজিত আর্য ভিন্ন জাতির সম্পর্কে আসিয়া ইহারা দাসতা যুগে প্রবেশ করে। আর্যদের আভ্যন্তরিক বা পারিবারিক ব্যবস্থা তখনও অবশ্য পিতৃতান্ত্রিকই ছিল ; কিন্তু জনপদে অর্থাৎ বহু পরিবারের সম্পর্কে—তাহা তখন প্রজাতান্ত্রিক† হইয়া গিয়াছিল। বস্তুত পঞ্জাবে সিকন্দরের আগমনকাল‡ পর্যন্ত রাজতন্ত্রের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। পরে এই পিতৃতন্ত্রই রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র এই দুই

---

* অন্তত বেদ রচনার পূর্বে যে তাহাতে সন্দেহ নাই ; † গণতান্ত্রিক ; ‡ ৩২২ খৃষ্টপূর্বাব্দ।

ধারায় বহিয়া চলিয়াছিল ; কিন্তু পঞ্জাবে আর্যদের সংখ্যাধিক্য থাকায় সেখানে গণতন্ত্রই জয়ী হইয়াছে। ভারতীয় আর্যদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে পঞ্জাবের নদনদীর উল্লেখ আছে,—প্রসঙ্গত অনেক জাতির উল্লেখও সেখানে স্থান পাইয়াছে ; কিন্তু লক্ষণীয় যে, সেখানে কোন বিশুদ্ধ পঞ্জাবী রাজার বর্ণনা নাই। অনুগঙ্গ দেশের দুই একজন শরণার্থী রাজা তখন পঞ্জাব গিয়াছিল,—তাহারা আর্যদের নিকট হইতে সময় সময় অন্যায় সুবিধাও ভোগ করিয়াছিল,—কিন্তু সপ্তসিন্ধুর দেশকে রাজতান্ত্রিক করা তাহাদের সামর্থ্যে কুলায় নাই। সিকন্দরের আক্রমণের সময় অম্ভী পোরস্* প্রভৃতি দুই একজন রাজার নাম শোনা যায়। তাহারা প্রকৃতই রাজা ছিল, না গণনায়ক ছিল, এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। শাক্যদের নায়ক শুদ্ধোধনকেও এইভাবে রাজা বলা হইত। ভদ্দিয়, দণ্ডপাণি প্রভৃতি আরও কয়েকজন শাক্যনায়কও রাজা নামে পরিচিত। কিন্তু শাক্যদের মধ্যে যে রাজতন্ত্র ছিল না, উহা যে প্রকৃতই গণতন্ত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈশালীদের সমাজও ঠিক এইরূপ গণতান্ত্রিক ছিল ; গণের শাসন-সদস্যদিগকে তাহারাও শাক্যদের মত রাজা বলিত। অম্ভী এবং পুরুকে রাজা বলিয়া মানিয়া লইলেও পঞ্জাবের অধিকাংশ স্থলে যে গণতন্ত্র ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না ; এবং ইহাতে পঞ্জাব অঞ্চলে গণতন্ত্রই যে রাজতন্ত্রের তুলনায় অধিকতর মান্য ছিল—ইহাও প্রমাণিত হয়।

গঙ্গা উপত্যকায় আসিয়া ইতিহাসের আদি পর্বেই কুরু, পঞ্চাল এবং কাশী ও কোশলের পূর্বস্থাপিত রাজ্য দেখিতেছি। বেদের কবি বা ঋষি বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি এইসব রাজ্যের রাজাদের কৃপাপাত্র ছিলেন। ঋগ্বেদে সেইজন্য রাজন্যবর্গের দানকর্ম সম্পর্কে অশেষ প্রশংসা ও স্তুতি আছে। আর্যেরা গঙ্গা উপত্যকায় যাইবার সময় তাহাদের সঙ্গে যে রাজতন্ত্র লইয়া গিয়াছিল এমন কোন প্রমাণ নাই। এই আরম্ভিক কাল সম্বন্ধে বেদও সম্পূর্ণ নীরব ; বেদের বর্ণনায় আরও পরবর্তী কালের ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে। তখন পঞ্চাল ও কুরু প্রদেশের দুইটি শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ; বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের মত জবরদস্ত ঋষিপুরুষ ইহার পোষক হইয়াছেন এবং রাজানুগ্রহে তাঁহারা রাজকবি ও পুরোহিতের পদ লাভ করিয়াছেন। তাই এই যুগকে আর আর্যাধিপত্যের আরম্ভিক বা অবিকশিত রূপ বলিয়া ভাবা চলে না। এখানে পূর্বের মত জনপদের নাম হইতেই আমাদিগকে পুরা যুগের আভাষ লইতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, আর্যজন যে অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছে—সেই অঞ্চলের নাম তাহাদের জন বা গোষ্ঠীর নাম হইতে প্রাপ্ত ; এবং জনের নাম তখন বহুবচনান্ত

---

* পুরু ; † ঋগ্বেদে দাতা রাজার স্তুতি সম্পর্কিত ঋচ্‌গুলি দ্রষ্টব্য।

হইত বলিয়া জনপদের নামও বহুবচনান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেইরূপ, 'পঞ্চাল দেশে গিয়াছে' বুঝাইবার জন্ত 'পঞ্চালগুলিতে গিয়াছে' বা 'পঞ্চালেষু গতা' এইরূপ পদ পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে মনে হয়, আর্যেরা সেখানে যাইবার সময় তাহাদের মধ্যে ব্যক্তি বা রাজার প্রাধান্য ছিল না,—তাহাদের প্রাচীন জন অর্থাৎ গোষ্ঠি তখন অবধি এক রকম অভগ্নই ছিল। কিন্তু মাতৃসত্তা বা সাংঘিক সম্পত্তির কোন নিদর্শন সেখানে পাওয়া যায় না; ইহাতে বৈয়ক্তিক সম্পত্তি অনাদি কাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে—এমন বিভ্রম হয়। এইসব দৃষ্টান্তে আর্যসমাজ যে তখন পিতৃসাত্তিক ছিল ইহাই প্রমাণ হইতেছে। পিতৃসত্তার যুগে কুরুপঞ্চালের আর্যেরা বহু আর্য ভিন্ন জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে আসিয়াছে এবং এই সংঘর্ষের সেনা-সঞ্চালকেরাই পরে রাজা হইয়া সমাজে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আবার ধার্মিক কৃত্যকলাপ চালনার জন্য পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ বর্গেরও সৃষ্টি হইয়াছে। তবে কথা এই, বর্গভেদ তখনও তত তীব্র এবং তীক্ষ্ণ হয় নাই; ঐতিহাসিক কালে* আসিয়াও পঞ্চালের রাজা বিশ্বামিত্র এবং কুরুর রাজ্যাধিকারী দেবাপিকে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে দেখা যায়। পিতৃসত্তার প্রথম পাদে পিতরা† একাধারে সমাজের শাসন এবং ধর্মকৃত্য উভয়ই সম্পাদন করিত;—ইব্রাণী‡ এবং অন্যান্য প্রাচীন জাতির ইতিহাস হইতে এই সত্যই সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। কিন্তু গঙ্গা উপত্যকায় এই দুই কৃত্যের জন্য রাজা এবং ব্রাহ্মণ দুইটি পৃথক বর্গের সৃষ্টি হয়। প্রথমত রাজা, পুরোহিত—উভয়কেই সমাজ নিজে নির্বাচিত করিয়া লইত, পরে সমাজ হইতে ইহাদের বরণের আর কোন প্রশ্ন উঠে না,—কারণ বহুবিধ অধিকারও শেষে জন্মগত হইয়া দাঁড়ায়।

সমগ্র ব্রাহ্মণ ও বৈদিক সাহিত্য জুড়িয়া রাজতন্ত্রের§ অজস্র প্রশংসা আছে; ইহার আনুসঙ্গিক ভাবে গণতন্ত্রের প্রতি উপেক্ষার নিদর্শনও খুব কম নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, পিতৃসত্তা ভারতবর্ষে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র এই দুই ধারাই বহিয়া চলিয়াছিল। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণেরা রাজতন্ত্রকে তাহাদের বর্গের পরিপোষক বলিয়াও চিনিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তবু সমাজে রাজতন্ত্রের সফলতার কারণ কি? জনপদ সমূহে মিশ্র জনতার সমাবেশই ইহার মূল কারণ। আর্যদের নূতন বসতিতে আর্যভিন্ন জাতির সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছিল। ইহার মধ্যে অনেককে সংস্কৃত করিয়া আর্যসংঘের প্রবেশপত্রও দেওয়া হইতেছিল; কিন্তু অনার্যদের সাংঘিক গঠন ইহাতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। তখন পিতৃসত্তাক ও গণসত্তাক উভয় সমাজই জাতীয় রক্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল—ইহাতে আর্য ও

* ঋগ্বেদের আরম্ভিক সময়; † Patriarch; ‡ য়িহুদী। § অর্থাৎ ব্রাহ্মণতন্ত্রের; প্রকৃতপক্ষে এই দুইই এক;

অনার্য জনের আন্তর মিশ্রণ সম্ভব হয় নাই। আর্যদের গণে* তখন জনসত্তা বর্তমান ছিল; কিন্তু হইলে কি হইবে, ইহা শুধু শ্বেত জাতির জনতন্ত্র—ইহাতে জনপদের আদি জন** ব্যতীত কাহারও প্রবেশ অধিকার ছিল না। এই অবস্থায় অনার্য জনের মধ্যে নিয়ত দ্বন্দ্ব লাগিয়া থাকিত; শাসক ও শাসিতের শ্রেণীবিভেদ ছাড়া এই দ্বন্দ্ব নিরসনের কোন উপায় ছিল না। রাজতন্ত্রের পক্ষে এইবার একটি সুযোগ মিলিল;—রাজতন্ত্র বিরোধী জনগুলির দ্বন্দ্ব নিরসনের আশ্বাস দিল, এবং নিজেকে প্রতি জনের উপরই সমদৃষ্টিবান্ বলিয়া ঘোষণা করিল। ইহাতে অনার্য জন সমাজে বিশেষ কোন প্রাধান্য পাইল না; কিন্তু তবুও রাজতন্ত্রকে তাহারা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিল; ইহাতে তাহাদের জনসত্তাও নষ্ট হইয়া গেল; তবু তাহাদের একমাত্র তৃপ্তি এই যে—বিরোধী আর্যজনও ত ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

(২) **ফিলস্তিনে**[১]—বাইবেলের পাঠকের নিকট ইব্রাণী জাতির[২] পিতৃসত্তার খবব মোটেই নূতন নয়। ইব্রাণীর মূসা, দাউদ, ইব্রাহিম প্রভৃতি পিতরের[৩] নিকট হইতে পিতৃতন্ত্রের অধিকারী হইয়াছিল। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য স্থানান্তরে গমন এবং অন্যান্য জাতি বা গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব পর্যন্ত তাহাদের পিতৃসত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে। বাইবেলে বর্ণিত মহান পিতরেরা একাধারে সমাজের শাসক এবং পুরোহিত দুইই ছিলেন;—ইহাতে দেখা যাইতেছে ইব্রাণী সমাজে ধর্মকৃত্য ও শাসনকৃত্যের মধ্যে তখনও কোন বিভাগ সৃষ্টি হয় নাই। পরে অসুর, মিশরীয়, পারসিক এবং য়ুনানী[৪] বা রোমক রাজশক্তির নিকট য়িহুদীদের পিতৃতন্ত্র পরাজিত হয়; তখন হইতে পিতরেরা ইব্রাণী সমাজে শুধু প্রধান পুরোহিতেরই কাজ করিয়া আসিয়াছে। য়িহুদীরা প্রাচীন পিতৃতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্য বহুবারই চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু ইহাতে তাহারা কোন স্থায়ী সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

(৩) **ইরাণে**—ইরাণীদের প্রথম রাজা দয়উক্কু[৫] সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প আছে:—'....ন্যায়ের জন্য তাঁহার কীর্তি নিজের গ্রাম ছাড়াইয়া অন্য গ্রামে ছড়াইয়া গিয়াছিল; এইজন্য বহুলোক নিজেদের বিবাদ মিটাইবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত; ক্রমে দয়উক্কুর এত সময় ব্যয় হইতে লাগিল যে—তিনি এই কাজ ছাড়িয়া দিলেন। তখন গ্রামে ন্যায়ের ব্যবস্থা না থাকায় চারিদিকে অশান্তি আরম্ভ হইল। লোকজন এইবার ভাবিতে লাগিল—এই অবস্থা চলিলে দেশ ছাড়িয়া যাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই....তাহা হইতে চল, আমরা একজন

* জন বা গোষ্ঠী সমবায়; **যাহাদের নামে জনপদের নাম হইয়াছে।

১ Palestine; ২ য়িহুদী; ৩ Patriarch; ৪ গ্রীসীয়; ৫ দেবক (মৃত্যু ৬৫৫খ্রীঃ পূঃ)

রাজা তৈয়ার করি; রাজা রাজ্য সম্পর্কে সমস্ত বিধান দিবে, আর আমরাও সুখে আমাদের কাজকর্ম লইয়া থাকিব।....ইহার পর দয়উক্কুকে তাহারা রাজা নির্বাচন করিল, এবং হগমতন বা হমাদানে তাঁহার রাজধানী বানাইয়া দিল।'*

ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, মদ্রজাতি দয়উক্কুকে রাজা করিয়া পিতৃসত্তার স্থলে রাজসত্তা স্থাপন করে। কিন্তু এই উপাখ্যানে যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা বাদ দিয়া শুধু শাসন সম্পর্কেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইতিহাস হইতে জানিতে পারি, মদ্রদেশ পূর্বে অসুরদের প্রভাবের মধ্যে ছিল। মদ্রজাতি স্বতন্ত্রতাপ্রিয় বলিয়া অসুর সাম্রাজ্যের অধীনতা তাহারা মানিয়া নিতে পারে নাই। মদ্রদিগকে দমন করিবার জন্য অসুর রাজাদিগকে বহুবার অভিযান চালাইতে হইয়াছিল। ইহার সর্বশেষ অভিযানটি অসুর হদ্দনের চালনায় খ্রীষ্টীয় ৬৭৪ অব্দে সংঘটিত হয়। ইরাণী ইতিহাসের তখনকার যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারটি হয়ত মূলত এইরূপ হইবে:—ইরাণীদের বিভিন্ন গোষ্ঠী তাহাদের পিতরদের চালনায় অসুর সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া প্রথম পরাস্ত হয়। পরে সমস্ত গোষ্ঠীকে একত্র করিয়া একটি সমন্বিত অভিযানে ইহারা অসুরদিগকে বিতাড়িত করে। এইরূপ সামাজিক যুদ্ধোদ্যোগের জন্য তাহাদের একজন সেনাচালকের প্রয়োজনও হইয়াছিল। খুব সম্ভব দেবক তখন জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ইরাণীদিগকে সংগঠিত করে—এবং ক্রমে দেশকে শত্রুমুক্ত করিয়া সাধারণের সম্মতিতেই দেশের রাজা হয়। এই রাজতন্ত্র ছাড়া মদ্রেরা অসুর সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে কখনও আঁটিয়া উঠিতে পারিত না; কারণ পিতৃসত্তার শক্তি বিক্ষিপ্ত এবং রাজসত্তার শক্তি সংহত। আর এইজন্যই সমাজে পিতৃসত্তার পরে রাজসত্তার উদ্ভব হয়; সঠিক ভাবে বলিতে গেলে—পিতৃসত্তার পর সামন্ত-সত্তা এবং ইহার শক্তিশালী ও বিকশিত রূপ হইল রাজসত্তা।

শ্রমপদ্ধতির উন্নতি, উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং আর্থিক শক্তির বিকাশ ও কেন্দ্রীকরণ এই সমস্তই সমাজের মূল ভিত্তি। কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহের সময় এই মূল আধারের উপর আবার রাজনীতিক ও সামাজিক শক্তিকেও কেন্দ্রিত করিয়া লইতে হয়। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ বা ফ্যাসিজমের বহু পূর্বেই মানুষ এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। আদিম সাম্যবাদী সমাজ হইতে জনসমাজকে আমরা এই বিষয়ে অগ্রবর্তী দেখি; তাই আদিম কম্যুন** ভাঙিয়া গিয়া তাহার স্থলে সমাজের আরও সংহত রূপ জনসত্তার উদ্ভব হয়। ইহার পর পিতৃসত্তার সময়ে বিস্তৃতির দিক দিয়া না হইলেও সংহতির দিক দিয়া এই গঠন আরও দৃঢ়তা অর্জন করে।

* মৎপ্রণীত 'ইরাণ' দ্রষ্টব্য।

** Commune

জনতন্ত্রের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও স্বেচ্ছাচারিতা এইভাবে প্রায় নষ্ট হইয়া যায়; এবং তাহার স্থলে সমাজে তখন একরূপ সামরিক অনুশাসন প্রচলিত হয়। ইহাতে জনের স্বয়ংপূর্ণ গঠন অবশ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিন্তু শক্তির দিক দিয়া তাহাতে জনের লাভই হয়। এই সংহতির জন্য শ্রেণীভেদ বা ব্যৈক্তিক স্বার্থকে স্বীকার করিয়াও পিতৃসত্তা সমাজে কার্যকারী হইয়াছে। ইহার পর সামন্ত যুগে সমাজের বিক্ষিপ্ত শক্তি আরও কেন্দ্রিত হয়—এবং এই রাজকীয় শক্তির মহিমা দেখিয়া সমাজে চক্রবর্তী রাজার কল্পনা* আসে। সামন্ত তখন শুধু আর রাজা হইয়া কৃতার্থ হইতেন না,—তাঁহারা সমগ্র পৃথিবী বা কোন মহাদ্বীপের রাজা অর্থাৎ চক্রবর্তী হইবার বাসনা পোষণ করিতেন।

সমাজশক্তিকে কেন্দ্রিত করিয়া লইবার উপকারিতা আমরা বুঝিলাম; কিন্তু এই কেন্দ্রীকরণ কিভাবে সম্ভব হইয়াছে তাহা উপরের বর্ণনা হইতে স্পষ্ট হয় না। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা এই সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা করিব—তবে এইখানে এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজবিকাশের মূলগত প্রেরণা হইল উৎপাদনপ্রক্রিয়ার বিকাশ। পশুপালন শুরু হইবার সঙ্গে সমাজের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং পশুধনের গৌরবে পুরুষ তখন সমাজে প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার পর ধীরে ধীরে কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং ক্রমে তামা, পিতল ও লোহার বহু নূতন আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়। ইহার প্রভাবে সমাজে ব্যৈক্তিক সম্পত্তিরও সৃষ্টি হইয়া যায় এবং ক্রমে ব্যক্তির প্রভাবে সমাজের বিক্ষিপ্ত শক্তিও কেন্দ্রিত হইয়া পড়ে।

(৪) **মিশরে**—মানব সমাজের বিকাশে মিশরের দান অসীম। এখন পর্যন্ত যে সব ঐতিহাসিক উপাদান হাতে আসিয়াছে—তাহাতে মিশরকে মানব-সভ্যতার আদি ভূমি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা চলে। মেসোপোতামিয়ার সভ্যতা** মিশরীয় সভ্যতার নিকট ঋণী; এবং সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা† মেসোপোতামীয় সভ্যতার সমকালীন—এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর প্রভাবও আবার খুবই স্পষ্ট। সিন্ধু সভ্যতার প্রাপ্ত নিদর্শন হইতে তাহার রহস্য উন্মোচন করা যায় না; কিন্তু এই কারণে তাহাকে মিশরীয় সভ্যতার পূর্ববর্তী মনে করিবার হেতু নাই। মোটের উপর যুক্তিসহ মত হইল—বাবুল ও অসুর সভ্যতার মত সিন্ধু সভ্যতাও মিশরের নিকট ঋণী—এবং কালিক বিচারে ইহারা উভয়েই মিশরীয় সংস্কৃতির অনুজা। তবে ইহার অর্থ এই নয় যে মানব প্রগতির একমাত্র উদ্গম স্থানই মিশর।

---

*ভারতীয় সমাজ

*হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতা; † বাবুল ও অসুর সভ্যতা

মানব সংস্কৃতির বিকাশের পক্ষে মিশরের পরিবেশ খুবই অনুকূল ছিল। নীলের উত্তরবাহী ধারায় মিশরের ভূমি সদা প্লাবিত হইয়া থাকিত। যাযাবর মানুষের নিকট এই উর্বর ভূমির একটা সহজ আকর্ষণ ছিল। বিশেষত অন্তিম হিমযুগের সমাপ্তি সময়ে সাহারা মরুভূমি ছিল না; শ্যামল তৃণগুল্মে সাহারার প্রান্তর তখন আস্তীর্ণ হইয়া থাকিত—ঋতুর কঠোরতা না থাকায় বৎসর ভরা সেখানে ফল-পুষ্পের সমারোহ চলিত। তাই শিকার বা ফলমূল সঞ্চয়ের পক্ষে সাহারাতে কোন অসুবিধা ছিল না। খুব সম্ভব শিকার যুগের অন্তে মানুষ নীল উপত্যকায় প্রথম* শস্য বপন করে। তখন সাহারা অতিক্রম করিয়া নীল উপত্যকায় যাতায়াতের পথ সুগম ছিল; কারণ চতুষ্পার্শ্বের প্রান্তর তখনও নির্জল ও বালুময় হইয়া পড়ে নাই। সাহারা তখন যাযাবরদের পশুপালন শুরু করিবার পক্ষে খুব উপযুক্ত স্থান ছিল। কৃষিকাজের জন্য তাহারা প্রথম যে বীজ সংগ্রহ করে—উহা এক প্রকার বন্য যব। প্রথমত তাহা একমাত্র পশুর খাদ্যরূপেই ব্যবহৃত হইত; পরে পশুর উদ্বৃত্ত খাদ্যে মানুষও ভাগ বসাইতে শিখে। পশুর জন্য তৃণ উৎপাদন আরম্ভ হইবার পর মানুষের ঘুরন্তপনার অন্ত হয়; তারপর কৃষি আরম্ভ হইলে মানুষ একেবারে স্থায়ী বসতি স্থাপন শুরু করে। আমরা নীল উপত্যকার বিশেষতা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম—নীলের জল ভূমধ্য-রেখার পাহাড় ও ঝিল হইতে নামিয়া আসে। ভূমধ্যরেখায় রাত্রি দিন সমান হয়; সেখানের ষড় ঋতুও হয় একরকম, একরস—এবং বর্ষাও সেখানে প্রতি বৎসর একরূপ হয়। নীলের বান সেই যুগের কৃষকের প্রাণ ছিল। ঋতু ও বানের নিয়মিত আগমন দেখিয়া কৃষক সেখানে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত শস্য বপন করিত। যবক্ষেত বাড়িবার পর ছোট ছোট খাড়ি কাটিয়া তাহারা জল সেচনও শুরু করিয়াছিল। নীলবাসী তাই শুধু কৃষি নহে—ক্ষেত্রে জলসেচের উপযোগিতাও তাহারাই প্রথম আবিষ্কার করে। সম্ভবত নীলের কৃষকই পৃথিবীতে প্রথম ঘুরন্তপনা ছাড়িয়া এক জায়গায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়। এক স্থানে বসতের জন্য তখন ইহারা প্রাকৃতিক পরিবর্তনগুলিও লক্ষ্য করিবার অবসর পায়;—ইহারা লক্ষ্য করে যে একটি নিশ্চিত সময় অতীত হইলে প্রতি বৎসর নীলে প্লাবন আসে; এবং এই প্লাবনের সময় কয়েক মাস আগের অস্তমিত লুব্ধক আবার আকাশে দেখা দেয়। এই ভাবে লুব্ধকের উদয়াস্তের দিন গুণিয়া ইহারা সৌরবর্ষের পরিমাণ নির্ণয় করে। ইহার পর নীলের বান বা কোন বিশেষ ঋতুর আগমনের জন্য তাহারা আর অনিশ্চিত প্রতীক্ষা করিত না; তখন ঋতুর আগম এবং নীলের স্ফীতি সম্পর্কে তাহারা ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারিত।

* পৃথিবীতেই সর্বপ্রথম

সাধারণ মানুষের চোখে এইসব সত্যদ্রষ্টা ব্যক্তিরা ক্রমেই অধিকতর সম্মানের পাত্র হইয়া পড়ে ;—ক্রমে তাহারা পিতর, মহাপিতর এবং পরে সামন্ত ও দেশের রাজার আসন পায়। মানুষও ইহাদিগকে আর শুধু ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নয়, সর্বজ্ঞ, এমন কি সর্বশক্তিমান মনে করিতে থাকে। সমাজবিকাশের ফলে অবশ্য মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়—কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত অজ্ঞানতাকে প্রশ্রয় দিয়া পিতর, মহাপিতরের সম্মান তাহারা বহুদিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। ভারতীয় সমাজে আধুনিক জ্ঞানীও 'রাম, রাম', 'কৃষ্ণ, 'কৃষ্ণ', রবে যেমন নৃত্য করেন—প্রাচীন মিশরের স্বেচ্ছাকৃত অজ্ঞানতাও এইরূপই।

মানবতত্ত্বজ্ঞদের মতে কৃষি, ক্ষেত্রসিঞ্চন, বর্ষগণনা—এবং এমন আরও বহুতর বিদ্যা—প্রথম নীল উপত্যকায় আবিষ্কৃত হয়। ক্রমে এই বিদ্যা দজলা-ফুরাতের উপত্যকা* পার হইয়া সিন্ধু উপত্যকা এবং পরে চীন ও প্রশান্ত সাগরীয় দ্বীপ-মালায় বিস্তৃত হয়—সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা এবং য়ুরোপীয় ভূখণ্ডেরও সর্বত্র ইহাদের প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে।‡ মিশরীয় সভ্যতার আলোচনায়ও দেখিব—পিতৃসত্তার যুগে সেখানে ব্যৈক্তিক সম্পত্তির সৃষ্টি হইয়াছে এবং কৃষি ও পশুপালন এই সম্পত্তি সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, ব্যৈক্তিক সম্পত্তি সৃষ্টির পূর্বে সমাজে কলহ বিবাদ কম ছিল। আদিম মানুষ যূথবদ্ধ ভাবে ফলমূল অর্জন করিত, শিকার করিত, এবং যূথের অর্জিত সম্পত্তি সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিত এবং প্রয়োজন হইলে যূথবদ্ধভাবেই সকলে উপবাসী থাকিত। ব্যৈক্তিক সম্পত্তি মানুষের লোভ ও স্বার্থ বৃদ্ধি করিয়া সমাজে কলহ বিবাদের উদ্ভব ঘটাইয়াছে।

পরিবার ও বিবাহ

জন সমাজে এক প্রকার শিথিল মিথুন-বিবাহের প্রচলন হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে পতি-পত্নীর সম্পর্ক অবশ্য অনেকটা নিশ্চিত হয়, কিন্তু স্ত্রী জাতির জন্য তখনও কোন কঠোর বিধানের সৃষ্টি হয় নাই—বিশেষত মাতৃসত্তার সময়ে এক স্ত্রীর বহুপুরুষসংসর্গ মোটেই নিন্দনীয় ছিল না। কিন্তু সমাজে এই অবস্থা কাটিয়া ক্রমে পুরুষের আধিপত্য আসিল এবং সম্পত্তির অর্জন ও স্বামিত্ব উভয়ই পুরুষের হাতে গিয়া পড়িল। এই সময় স্ত্রীজাতির পূর্বের স্বচ্ছন্দতাকে পুরুষ আর সহ্য করিল না ; ফলে স্ত্রীকে স্বামীর বশবর্তিতা স্বীকার করিতে হইল এবং তাহার একাধিক বিবাহের আর কোনরূপ ক্ষমতা রহিল না। তবে পিতার মৃত্যুর পর

* মেসোপোতামিয়া ; ‡ Elliot Smith এর Diffusoin Theory of The Growth of Civilisation.

স্ত্রীর পুনর্বিবাহে সমাজ আপত্তি করিত না। এক বিবাহের কড়াকড়ি তখন অবশ্য শুধু স্ত্রীজাতির জন্যই ছিল—পুরুষের বেলায় সমাজের নিয়ম নিগড় বা বিধান এত কঠোর ছিল না। এশিয়াতে বহুবিবাহ বিষয়ে বরাবরই বাড়াবাড়ি আছে—এমন কি এখনও ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য এশিয়ারই দেশে—বহুপত্নীকতাকে সমাজ নিন্দা করে না। কিন্তু য়ুনান,* রোম প্রভৃতি দেশে ঐতিহাসিক যুগেই পুরুষের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়—য়ুরোপেও একপত্নীত্বের প্রথা বহু পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বিবাহাদি ব্যাপারে তাই য়ুরোপকে এশিয়াই দেশ হইতে উন্নত বলিতে হয়। ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে য়ুরোপে স্ত্রী-পুরুষের যৌন-স্বাধীনতা একেবারে সমান—য়ুরোপীয় সমাজে একপত্নীত্ব চলিবার পরও পুরুষের বেশ্যা বা রক্ষিতা সংসর্গের এক প্রকার প্রকাশ্য অধিকার ছিল; কিন্তু স্ত্রীর বেলায় সমাজ এইরূপ সামান্যতম কোন স্খলনও সহ্য করিত না—স্ত্রীর দিক হইতে বিন্দুমাত্র স্বেচ্ছাচারিতার প্রকাশ পাইলে সমাজ তাহার জীবন দুর্ভর করিয়া তুলিত। য়ুরোপেও পুরুষের দিকে পাল্লা ভারী হইবার কারণ এই যে—নিজেদের উৎপাদিত সম্পত্তির মালিক হইয়া পুরুষ তখন সমাজের চৌধুরী বনিয়া গিয়াছে। পিতৃসত্তা যুগে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক ছাড়া অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কেও বহু নূতন পরিবর্তন হইয়াছিল। জনযুগে আদিম সাম্যবাদী রীতিনীতি অনেকটা নির্বল হইয়া পড়ে, কিন্তু তখনও তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই; পিতৃসত্তা স্থাপিত হইবার পর সমাজে শ্রেণীভেদ আরম্ভ হয়, তাহার সঙ্গে সাম্যবাদী রীতিনীতিও সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যায়।

অস্ত্র ও হাতিয়ার

পিতৃসত্তা স্থাপিত হইবার „ সঙ্গে সঙ্গে আমরা বর্বর সংস্কৃতির চূড়ায় পৌঁছিয়া যাইতেছি। পূর্বে মানুষ কাঠ, পাথর এবং পশুর হাড় ও শিঙের অস্ত্র ব্যবহার করিত; কিন্তু এই যুগে তামা আবিষ্কার হওয়ায় মানুষের শক্তিতে বিপ্লবকরী পরিবর্তন হয়। এখন তামার কুঠার, তলোয়ার, তীর এবং ভল্লের তাহারা ব্যবহার শিখে এবং পাষাণ-আয়ুধধারী জাতির উপর ইহার ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করে। য়ুরোপীয়দের' শক্তিশালী অস্ত্রের নিকট এশিয়া আফ্রিকার জাতি যেমন পরাজিত হইয়াছিল ইহাও ঠিক সেইরূপ। বলা বাহুল্য, কৃষির মত ধাতুর আবিষ্কারও প্রথম মিশরেই হয়। মিশরীদের সর্বাপেক্ষা পুরাতন পিরামিড চিয়োফ খ্রীষ্ট জন্মের চার হাজার বৎসর পূর্বের। ইহাতে ব্যবহৃত পাষাণখণ্ডকে ফাড়িবার জন্য তখন তামার ছেনি বা অন্যান্য হাতিয়ারের নিশ্চয়ই প্রয়োজন

* গ্রীস।

হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই* বলিয়াছি যে মিশরীরা পাথরের মধ্যে কাঠ ঢুকাইবার জন্য তাহারা তাহাতে তামার ছেনি দিয়া ছিদ্র করিত এবং পরে ঐ পাথরের খণ্ডটিকে জলে ফেলিয়া রাখিলে ভিজা কাঠের স্ফীতিতেই তাহা ফাটিয়া যাইত।

খুব সম্ভব এই যুগে মানুষ দস্তা ও তামার মিশ্রিত ধাতু পিতলের ব্যবহারও শিখিয়াছিল। ধাতুর আবিষ্কার হওয়ায় তখন যে শুধু শিকার বা যুদ্ধ বিগ্রহেরই সুবিধা হইয়াছিল এমন নহে; ইহাতে শিল্পসম্বন্ধী হাতিয়ার অর্থাৎ লাঙলের ফাল এবং এইরূপ আরও অন্যান্য জিনিসেরও উন্নতি হয়। মানুষ মাটির বাসন হইতে শুরু করিয়া ক্রমে ধাতুপাত্রের নির্মাণ শিখে এবং ইহার ফলে রন্ধনকলাও বেশ আর একটু অগ্রসর হইয়া আসে। এইবার তাহারা ভুনা মাংস ছাড়িয়া সিদ্ধ ও পরিপক্ক মাংস ও তরকারি খাইতে আরম্ভ করে এবং নূতন হাতিয়ারে বন আবাদ করিয়া কৃষির জন্য বহু উপযোগী ক্ষেত্র তৈয়ার করিয়া লয়।

সম্পত্তি

পশুপালনের মধ্য দিয়া পিতৃসত্তা ও পুরুষপ্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং ইহার আনুষঙ্গিকরূপে বৈক্তিক সম্পত্তিরও উদ্ভব ঘটে। কৃষিকর্মের সাহায্যে মানুষ যাযাবর হইতে গৃহস্থ হইয়াছিল; কিন্তু ভূসম্পত্তির উপর তখনও ব্যক্তির কোন অধিকার ছিল না ভূমির উপযোগ** এবং উপজ শুধু এইটুকু মাত্র তখন ব্যৈক্তিক ছিল। রুশ এবং ভারতবর্ষে গত শতাব্দীতেও ভূমিতে সাংঘিক অধিকার দেখা গিয়াছে। অম্‌দো'রা† অনেক তিব্বতী গোষ্ঠীতে এখনও ভূমির উপর পারিবারিক অধিকার নাই—সেখানে ভূমি সমগ্র গ্রামের সামূহিক সম্পত্তি। এই ভূমিতে কেহ এক সঙ্গে দুই বৎসরের বেশি শস্য ফলাইবার অধিকার পায় না। তৃতীয় বৎসর পড়িলে নূতন বণ্টনের জন্য প্রত্যেক কৃষককেই তাহার ক্ষেত ছাড়িয়া দিতে হয়। এক বৎসর পরে কৃষক আবার তাহার পুরাতন ক্ষেতের অধিকার পাইতে পারে—কিন্তু এইবারও একাদিক্রমে দুই বৎসরের বেশি সে তাহাতে চাষ করিতে পারে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে শিখ শাসনকাল পর্যন্ত পঞ্জাবেও অনেক স্থানে ভূমির উপর গ্রামিক অধিকার ছিল। তখন প্রত্যেক পরিবারকেই কৃষির জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জমি দেওয়া হইত—কিন্তু তাহা বিক্রয় করিবার বা বন্ধক

* 'বিশ্বের রূপরেখা' দ্রষ্টব্য।

** ভূমি ব্যবহারের অর্থাৎ জোতের ক্ষমতা; † চীন্‌ কন্‌সু।

দিবার অধিকার পরিবারের থাকিত না। জারের অন্তিম দিন* পর্যন্ত রুশদেশেও কোন কোন স্থানে এই প্রথা বর্তমান ছিল—অক্টোবর বিপ্লবের পর সাম্যবাদী পদ্ধতির সহায়তায় এই প্রথা আরও ব্যাপক এবং কার্যকরী হয়।

সমাজে ব্যৈক্তিক সম্পত্তির দৌড় আরম্ভ হইবার পর কিছুতেই তাহার রাশ টানা গেল না।† লোভ বাড়িয়া যাওয়ায় মানুষ ক্রমেই ভূমিকে ব্যৈক্তিক করিয়া লইতে আগ্রহী হইল। ভূমি বৈক্তিক হওয়ায় তাহার বিক্রয়-বন্ধক বা বিনিময়েরও আর কোন বাধা থাকিল না। কিন্তু ইহাতে সমাজে এক ভীষণ নূতন বিষমতার সৃষ্টি হইল; কোন কোন পরিবার এখন বহু ক্ষেত ও পশুর মালিক হইয়া গেল; কেহ অত্যন্ত কম ক্ষেত ও কম পশুর এবং কেহ এই সম্পত্তি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইল। সমাজের এই নব ব্যবস্থার মূলে কোন উচ্চ আদর্শ বা মহৎ প্রেরণা ছিল না। মানুষের নীচতা, শঠতা, হিংস্রতা এবং সার্বজনিক সম্পত্তির লুণ্ঠনের আকাঙ্ক্ষা—এই কয়টি মিলিয়া ব্যৈক্তিক সম্পত্তিকে পাকা করিয়া দিয়াছিল।

বুদ্ধ ও ব্যৈক্তিক সম্পত্তি—সাংঘিক সম্পত্তি নষ্ট হইবার পরও সমাজে উহার প্রশংসক এবং ব্যৈক্তিক সম্পত্তির নিন্দুকের আবির্ভাব হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মুনে-চেন্‌পো‡ সমাজের দারিদ্র্য ও অসন্তোষ দূর করিবার জন্য সম্পত্তিকে ;, সাংঘিক, নয় তাহা সকলের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন। মুনে-চেন্‌পোর সাম্যাদর্শে বুদ্ধের উপদেশাবলীর নিশ্চয়ই অনেক প্রভাব ছিল—কিন্তু বুদ্ধ নিজে সম্পত্তি ব্যক্তিগত ভাবে বিতরণের পক্ষপাতী ছিলেন না; তাঁহার আদর্শ ছিল সম্পত্তির সাংঘিকরণ, অর্থাৎ তাঁহাতে সমূহের অধিকার প্রতিষ্ঠা। এই সম্পর্কে বুদ্ধের বিচার দীর্ঘনিকায়ের§ অগ্‌গঞ্‌ঞ সুত্তে পাওয়া যাইতেছে। মানুষ ও সমাজের প্রারম্ভ সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া বুদ্ধ বলিতেছেন :—

"····লোকের বিবর্ত হইবার পর জগৎ জলে জলময় ছিল,···· তখন চারিদিকে গভীর অন্ধকার····চাঁদ নাই, সূর্য নাই, নক্ষত্র নাই,····রাত্রি দিনের অস্তিত্ব নাই···· মাস পক্ষও প্রকট হয় না; ঋতুও না, বর্ষাও না····স্ত্রীপুরুষও না····

"গরম দুধ শীতল হইলে সরের মত রসা পৃথিবীর সৃষ্টি হইল····তখন চন্দ্র এবং সূর্য প্রকট হইল····মাস ও বর্ষ, ঋতু ও পক্ষ সৃষ্ট হইল····নাগের ফণার মত পৃথিবী পাপড়ি মেলিল····মদ্রলতার জন্ম হইল এবং সত্ত্ব ১ মদ্রলতা খাইতে লাগিল···· রোপন বপন ছাড়া ক্রমে চাউল জন্মিল····সত্ত্ব বহুদিন ধরিয়া চাউল খাইল····চক্ষু তুলিয়া পরে পরস্পরের ২ দিকে তাকাইতে রাগ জন্মিল····তখন উভয়ে মৈথুন

*১৯১৭ খৃঃ ; † ৮৪,৬৫৭ খ্রীঃ ; ‡ তিব্বতীয় সম্রাট্।

§ দীর্ঘনিকায় ১৭ ; সংস্কৃত অনুবাদ দ্রষ্টব্য ; ১ প্রাণী ; ২ স্ত্রীপুরুষ।

করিল; লোকে মৈথুন দেখিলে তখন ধূলি ছুঁড়িত, কাদা দিত, গায়ে গোবর ফেলিয়া দিত, আর বলিত, 'আ বৃষলী! দূরহ দূরহ! এক সত্ত্ব অপর সত্ত্বকে এই করিবে!' আজও অনেক দেশে নববধূ আনিবার সময় তাহার উপর ধূলি ছুঁড়ে....ইহা আগের সেই কথা মনে করিয়া....কিন্তু লোকে ইহার অর্থ বুঝে না; ইহা এক দিন অধর্ম ছিল, কিন্তু এখন তাহা ধর্ম হইয়াছে....মানুষ অবশেষে ঘর বাঁধিতে আরম্ভ করিল....

"এক অলস ভাবিল, 'সকাল সন্ধ্যা দুইবার চাউল আনিবার কষ্ট করি কেন? একবারেই ত দুই বেলার শালি লইয়া আসিতে পারি' .... ইহার পর সে একেবারেই চাউল লইয়া আসিল....অন্য প্রাণী পরে তাহার নিকটে বলিল, 'চল শালি আনিতে যাই'....'হে সত্ত্ব! আমি ত শালি লইয়া আসিয়াছি'....এখন এই সত্ত্বও পূর্বের সত্ত্বের মত একবারে শালি লইয়া আসিত....তৃতীয় সত্ত্ব ইহা দেখিয়া চার দিনের শালি লইয়া আসিল....ইহার পর প্রত্যেক প্রাণীই শালি জমা করিয়া পরে খাইত....এই পাপে চাউলের গায়ে তুষ হইল....শালি গাছ তুলিয়া লইলে তখন আর গাছ হইত না; এইভাবে মধ্যে মধ্যে খালি হইয়া....শালির ক্ষেত খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল...

"তখন সকলে একত্র হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল,....'আমাদের মধ্যে পাপ আসিয়াছে'....তাহারা ক্রমে শালির ক্ষেত বাটিয়া লইল; ক্ষেতের মধ্যে মধ্যে আল বাঁধিয়া দিল....এক লোভী সত্ত্ব আপন ভাগ রক্ষা করিয়া অন্যের ভাগ খাইয়া গেল*....তাহাকে ধরিয়া লোকে বলিল, 'হে সত্ত্ব, তুমি ইহা পাপ করিতেছ ....আর এইরূপ করিও না'....দ্বিতীয়বার....তৃতীয়বার....তাহাকে ধরিয়া সকলে বলিল,হে সত্ত্ব, তুমি ইহা পাপ করিতেছ'; পরের বার কেহ হাতে, কেহ লাঠি দিয়া, কেহ ঢিল দিয়া তাহাকে মারিতে লাগিল....ইহার পর চুরি, নিন্দা, মিথ্যা ....এবং দণ্ডকর্ম সৃষ্টি হইল....তখন প্রাণীরা একত্র হইয়া বলিতে লাগিল, 'আমাদের মধ্যে পাপ আসিয়াছে....চল আমরা একজনকে নির্বাচিত করি....তিনি নিন্দনীয়কে নিন্দা করিবেন, কর্তব্য কর্মকে নির্দিষ্ট করিবেন, আর বহিষ্কারের যোগ্যকে বহিষ্কৃত বলিয়া দিবেন....আমরা তাঁহাকে আমাদের শালির অংশ দিব, ...তখন ইহারা নিজেদের মধ্যে সর্বপেক্ষা বর্ণবান্, দর্শনীয় ও শক্তিশালী ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইল....'হে সত্ত্ব! তুমি ন্যায় অন্যায়ের অনুশাসন দাও, নিন্দনীয়কে নিন্দা কর, কর্তব্যকে নির্দিষ্ট কর, আর বহিষ্কারের যোগ্যকে বহিষ্কৃত করিয়া দাও ....আমরা তোমাকে শালির অংশ দিব'....ইনি 'তাহাই হউক' বলিয়া স্বীকার করিলেন....মহাজন দ্বারা সম্মত হইলেন বলিয়া ইহার প্রথম নাম মহাসম্মত;

* অর্থাৎ চুরি করিয়া।

ক্ষেত্রের অধিপতি বলিয়া দ্বিতীয় নাম ক্ষত্রিয় ; ধর্ম দ্বারা সকলের রঞ্জন করেন বলিয়া তৃতীয় নাম রাজা....।"

বুদ্ধের পূর্বোক্ত বিচার হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি ব্যৈক্তিক সম্পত্তির বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে ভূমিকে বিভক্ত করাই পাপ এবং তাহা মানবের অধোগতির চিহ্নস্বরূপ। কিন্তু অবস্থা বিপর্যয়ে অযুক্তিকও যুক্তি হইয়া উঠিতে পারে—তাই ব্যৈক্তিক সম্পত্তিই শেষে বুদ্ধকে দিয়া রাজতন্ত্র স্বীকার করায়। বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে সংঘকে ব্যক্তি অপেক্ষা বহু উচ্চে মনে করিতেন ; তাহার নিকট সংঘের স্বার্থ, অন্ততঃ ভোগ্যবস্তুর অধিকার সম্পর্কে, ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা মূল্যবান ছিল। একদিন প্রজাপতি গৌতমী* একজোড়া ধুস্‌সা** লইয়া বুদ্ধকে বলিয়াছিলেন,† এই ধুস্‌সা দুইটি আমার নিজের কাটা সূতায় তৈয়ারী ; ইহাদের বয়নও আমি নিজেই করিয়াছি....হে বুদ্ধ, তুমি এই নব বসন দুইটিকে স্বীকার কর।' বুদ্ধ উত্তর দিলেন, 'গৌতমী, ইহা সংঘকে দান করুন—সংঘকে দিলেই আমিও সম্মানিত হইব এবং সংঘও কৃতার্থ হইবে। গৌতমী আরও অনুনয় করিলে পর বুদ্ধ বলিলেন, 'কোন ব্যৈক্তিক দানকেই আমি সংঘকে দানের চেয়ে শ্রেয়তর মনে করি না।' বুদ্ধ শেষে গৌতমীর আনীত বসন সংঘকেই দান করাইয়াছিলেন।

সংঘ সম্পর্কে বুদ্ধের কিরূপ দৃষ্টি ছিল তাহা ভিক্ষুদের আচরণীয় বিনয় গুলি § হইতে জানা যায়। নিম্নে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখুন :

"যদি কোন ভিক্ষু সংঘের মঞ্চ, পীঠ, শয্যা ও উপাধান ব্যবহারের পর বিন্যস্ত করিয়া না রাখে, কিংবা তাহা অপর দ্বারা বিন্যস্ত না করায়, অথবা এইভাবে অবিন্যস্ত রাখিয়া বিনা জিজ্ঞাসায় চলিয়া যায়, তবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"[১]

"যদি কোন ভিক্ষু জ্ঞাতসারে সংঘের লাভকে ব্যৈক্তিক লাভে পরিণত করে, তবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"[২]

বুদ্ধ তাঁহার অধিক সাম্যবাদকে সাধারণের মধ্যে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করেন নাই ; পক্ষান্তরে ভিক্ষুদের জন্য কয়েকটি নিয়ম-নির্দেশ অনিবার্য করিয়া দিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। বুদ্ধের নির্দেশ অনুযায়ী ভিক্ষু মাত্র ৮টি জিনিস তাহার ব্যৈক্তিক সম্পত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিত :—(১) একটি ভিক্ষাপাত্র[৩], (২) তিনটি পরিধেয় বস্ত্র, (৩) একটি সূঁচ, (৪) একটি ক্ষুর, (৫) একটি কটিবন্ধ, (৬) একটি জলপাত্র। এই আটবস্তুর অতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই সংঘের হইত এবং

---

*বুদ্ধের বিমাতা ; **বস্ত্র বিশেষ † দক্‌খিণ বিভংগসুত্তম মজ্ঝিমনিকায় : সংস্কৃত অনুবাদ দ্রষ্টব্য ; § নিয়ম, চর্যা।

১। ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ৫।১৪ ; বিনয় পিটক ; ২। ঐ ; ৩। ইহাও মাটির।

ভিক্ষুকে তাহার সুরক্ষার ভার লইতে হইত। কীটাগিরিতে[১] বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের একটি বিহার ছিল; একদিন ভিক্ষুরা সেই বিহারের সমস্ত সম্পত্তি এবং শেষ পর্যন্ত বিহারটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। ইহা শুনিয়া বুদ্ধ তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করেন,[২] "...অপদার্থেরা সংঘের শয়ন আসন বণ্টন করিল কিরূপে?...এই পাঁচটি বস্তু সর্বদাই অবিভাজ্য; ইহাদিগকে বিভাগ করা যায় না, বিভাগ করিলেও ইহারা অবিভক্তের মতই থাকিয়া যায়: (১) উদ্যান ও উদ্যান বাটি, (২) বিহার ও বিহারের বাসগৃহ, (৩) তাকিয়া, তোষক, চতুষ্পদী খট্টা....(৪) তামার কলসী, ভাঁড়, বারক....কটাহ, কুঠার, খনিত্র এবং কোদাল, (৫) তৃণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠপাত্র ও মৃৎপাত্র।"

ভিক্ষুর মৃত্যু হইলে তাহার অষ্টসম্পত্তি সংঘের অধিকারে আসিত—ইহাতে কোন ভিক্ষু বা শিষ্যের ব্যৈক্তিক অধিকার থাকিত না। তবে রুগ্ন ভিক্ষুকে কেহ সেবা করিলে ভিক্ষুর মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির অন্য বিহিত হইত।[৩] "মৃত ভিক্ষুর বস্ত্র ও পাত্রের অধিকারী সংঘ; যদি রোগি-পরিচারক বিশেষ সেবা করিয়া থাকে....তবে সংঘ ভিক্ষুর বস্ত্র ও পাত্র পরিচারককে দিবে।" কিন্তু এই দান সম্পর্কে আবার বলা হইয়াছে:—"উক্ত রোগি-পরিচারক ভিক্ষুসংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিবে, 'ভন্তে[৪] সংঘ, অমুক নামের ভিক্ষু মৃত হইয়াছেন; উহার ত্রিবস্ত্র ও পাত্র রক্ষিত আছে।' ইহা শুনিয়া কোন সমর্থ ভিক্ষু পুনরায় সংঘের নিকট সূচিত করিবে, 'পূজ্য সংঘ অবধান করুন, অমুক নামের ভিক্ষু মৃত হইয়াছেন; তাঁহার পাত্র ও ত্রিবস্ত্র রক্ষিত আছে। যদি সংঘ উচিত মনে করেন, তবে এই ত্রিবস্ত্র ও পাত্র রোগি-পরিচারককে প্রদান করা হউক।" এইভাবে বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত বিজ্ঞপ্তি বা সূচনা শেষ হইলে মূল প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা হইত—ইহার নাম অনুশ্রাবণ:—"ভন্তে, সংঘ অবধান করুন, অমুক নামে ভিক্ষু মৃত হইয়াছেন। তাঁহার ত্রিবস্ত্র ও পাত্র রক্ষিত আছে। সংঘ এই পাত্র ও বস্ত্র রোগি-পরিচারককে প্রদান করিতেছেন। আয়ুষ্মান্‌গণের মধ্যে যিনি ইহা অনুমোদন করেন, তিনি নীরব থাকুন—যিনি অনুমোদন করেন না তিনি তাঁহার বক্তব্য বলুন।" সংঘের সম্মুখে উল্লিখিত প্রস্তাবটিকে তিনবার উপর্যুপরি বিবেচনার জন্য দেওয়া হইত। এই তিনবারের মধ্যে কাহারও আপত্তি থাকিলে তাহা তিনি প্রকাশ করিতে পারিতেন। সংঘে মতভেদ হইলে ভিন্ন বর্ণের কাঠের শলার সাহায্যে[৫] ছন্দ লওয়া[৬] হইত। তৃতীয়বার পর্যন্ত সংঘ নীরব থাকিলে বক্তা তখন ধারণা[৭] প্রকাশ করিতেন: "সংঘ স্বীকৃত

১। কাশী; ২। ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ (মহাবগ্‌গ); ৩। ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ (চুল্লবগ্‌গ ৫।৩); ৪। মাননীয়; ৫। দুইরঙের কাঠের শলার যথাক্রমে সম্মতি ও অসম্মতি বুঝাইত; ৬। ভোট লওয়া; ৭। প্রস্তাব গৃহীত হইল,—এই মত।

হইয়াছেন ; এইজন্য সকলেই নীরব ; ইহা আমি লক্ষ্য করিতেছি।” ইহার পর রোগি-পরিচারক মৃত ভিক্ষুর পাত্র ও ত্রিবস্ত্র গ্রহণ করিত ; কিন্তু তাহাতে পরিচারকের ব্যৈক্তিক সম্পত্তির কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিত না। বৌদ্ধ সংঘে অষ্টসম্পত্তির বেশি একটি তৃণও কাহারও নিকট থাকিবার উপায় ছিল না। নূতন পাত্র ও বস্ত্র গ্রহণ করিবার পর ভিক্ষুকে তাহার পূর্বসামগ্রী সংঘে জমা দিতে হইত।

বুদ্ধ তাঁহার সাম্যবাদকে পরিমিত ক্ষেত্রে অর্থাৎ শুধু ভিক্ষুসংঘে চালাইতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু লক্ষ্য করিবার যে, শতাব্দী না যাইতেই বৌদ্ধ সাম্যবাদ অচল হইয়া গেল ; বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘে আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং বিফল হইয়া গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে ভিক্ষুরা প্রচণ্ড ব্যৈক্তিক সম্পত্তি জাঁকাইয়া বসিলেন—এবং আজও বৌদ্ধ মঠে সাংঘিকতার যে কথা শোনা যায়—তাহাও শুধু কথাই। বুদ্ধের সাম্যবাদ বিফল হইবার অবশ্য কয়েকটি সামাজিক কারণ বর্তমান ছিল : সেই যুগের দাসতাযুক্ত সামন্তবাদকে সমাজের আর্থিক অবস্থা যেদিকে বিকাশলাভ করিবার সুযোগ দিতেছিল—বুদ্ধের সাম্যবাদ, তাহার অনুকূল ছিল না ; দ্বিতীয়তঃ, এই সাম্যবাদ শুধু বণ্টনসর্বস্ব সাম্যবাদ, অর্থাৎ, ইহাতে শুধু বণ্টনের কথাই আছে—কিন্তু সমাজের উৎপাদনের সঙ্গে ইহার সামান্য সম্পর্কও নাই ; তারপর তৃতীয় কথা, বুদ্ধের সময় সমাজ ব্যক্তিবাদী ছিল—এই অবস্থায় সমগ্র সমাজের সহিত সম্পর্কহীন হইয়া শুধু একস্থানে সাংঘিকতা চলিতে পারে না।

শিল্প ও ব্যবসায়

এই যুগে গৃহশিল্প, পশুপালন, বিনিময় ও কৃষিকর্মের অতিরিক্ত একটি নূতন শিল্প—অর্থাৎ ধাতুশিল্পেরও উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটে। অনেক পশ্চাৎপদ জাতির মধ্যে অবশ্য তখনও শিকার এবং ফলসঞ্চয়নই একমাত্র জীবিকা ছিল ;—এই আদিম বন্য অবস্থা পৃথিবীর অনেক জাতির মধ্যে আজ অবধি বর্তমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) **পশুপালন**—ভেড়া, ছাগল, গরু, কিংবা মহিষ, ঘোড়া, অথবা গাধা, ইহাদের সমস্তই দেশানুসারে মানুষের গৃহপশু হিসাবে গণ্য হইয়াছিল। জনযুগে পশুর চামড়া, মাংস—তাহার দুধ এবং ইহার সোওয়ার বহিবার ক্ষমতাকে মানুষ সম্পূর্ণ কাজে লাগাইয়াছিল কিনা জানা যায় না ; কিন্তু পিতৃসত্তার যুগে আসিয়া মানুষ পশুর এই বহুমুখী উপযোগিতা যে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এইসব জন্তুর মধ্যে একমাত্র ঘোড়া ছাড়া আর সমস্তই আফ্রিকার

জঙ্গলে প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যাইত ; এই কারণে মিশরীয়দিগকে পশুপালনের দিক দিয়াও পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইতে অগ্রবর্তী মনে করিতে বাধা নাই।

(২) **কৃষি**—বন্য যব হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া মিশরীরা সর্বপ্রথম কিভাবে কৃষিকাজ আরম্ভ করে—তাহা আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি। আর্যেরা ইহার বহু পরে, অর্থাৎ প্রায় ২০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে, ভারতবর্ষে পদার্পণ করে। ইহার হাজার বৎসর পূর্বে, প্রায় ৩০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের সমসাময়িক কালে তাহারা সিন্ধু উপত্যকায় বাস করিত, তাহাদের দাসতা ও পিতৃসত্তামূলক সমাজে তখন ধানের চাষ হইত ; কিন্তু ফলফলারির চাষ করিবার বিদ্যা আর্যেরা ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের আগে তেমন জানিত না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অবশ্য ইহা বহু পূর্বেই প্রচলিত হয় ; এবং এই হিসাবে এঙ্গেলসের কথা—মানুষ শস্য বপনের আগে ফলের গাছ লাগাইয়াছিল—ইহা সত্য।

(৩) **বিনিময়**—জনযুগের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসের সঙ্গে অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিসের অদলবদল বা বিনিময় আরম্ভ হয়। পিতৃসত্তার সময়ে জনযুগের সাংঘিক স্বার্থ নষ্ট হইয়া তাহার স্থলে ব্যৈক্তিক সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা হয় ; ইহার ফলে প্রত্যেকেই নিজের ক্ষণস্থায়ী ও সুলভ বস্তুর সঙ্গে অন্যের স্থায়ী এবং অধিক মূল্যের জিনিস বিনিময় করিতে ইচ্ছা করে। প্রথম এই বিনিময় ব্যাপারে পশু, এবং আর্যদের বেলায় তাহাদের গোধন, মুখ্য স্থান অধিকার করিত। পরে তামার খোঁজ পাইবার পর হইতে বিভিন্ন ওজনের ধাতুখণ্ডের মাধ্যমে বিনিময়ের কাজ চলিতে থাকে। বিনিময়ের ধাতুর মধ্যস্থতা স্বীকৃত হইবার পরও উৎপাদকেরা বহুদিন তাহাদের পণ্য সোজাসুজি বিনিময় করিত। পিতৃসত্তার যুগে বিনিময়ের খুব প্রসার হইলেও সমাজে তখন পর্যন্ত ব্যবসায়ের জন্য এক বিশেষ বর্গ অর্থাৎ বানিয়া বর্গের সৃষ্টি হয় নাই।

(৪) **ধাতু শিল্প**—প্রাচীন প্রস্তরাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমেই কঠিনতর পাথরের অনুসন্ধান করিতে থাকে। এই অনুসন্ধানের ফলে একদিন প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় তাম্রের আবিষ্কার হয়। তাম্রের একটি গুণ এই যে, অন্য ধাতুর মিশ্রণ ছাড়াও ইহাতে তীক্ষ্ণতা বা দৃঢ়তার কোন অভাব হয় না। তামার এই গুণের জন্য অল্পদিনের মধ্যেই মানুষের অস্ত্রশস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হয়। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা লৌহযুগের বহুদিন পূর্বের কথা—প্রাচীন মিশর, মেসোপোতামিয়া বা সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা লৌহের ব্যবহার আদৌ জানিত না। খননকার্যের ফলে এইসব* স্থান হইতে যে সকল ধাতুদ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহার সমস্তই তাম্রের। হিন্দী আর্যেরা আফগানিস্থানে পৌঁছিবার সময় পর্যন্ত‡

‡ ২০০০ খ্রীঃ পূঃ।

লৌহ তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। তৃতীয়-চতুর্থ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পুঁথিপত্রেও সংস্কৃত 'লৌহ' শব্দ তাম্রের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্বে লঙ্কায় একটি বিরাট মঠ ছিল; তাহা লৌহমহাপ্রাসাদ নামে অভিহিত হইত; কিন্তু এই মঠের ছাত তাম্রে নির্মিত ছিল—এখানেও তাম্র অর্থে লৌহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। ভাষাতত্ত্বে পণ্ডিত না হইয়াও সংস্কৃত লোহিতা শব্দের অর্থ জানিলেই লৌহ শব্দের ইঙ্গিত বুঝা যাইবে। লৌহ প্রকৃতপক্ষে লোহিত বা রক্তবর্ণ ধাতুরই নাম; পরে রূঢ়ি প্রয়োগে ইহার অর্থান্তর ঘটিয়া গিয়াছে। লৌহ বুঝাইবার জন্য আজকাল সংস্কৃত 'অয়স্' শব্দের প্রয়োগ হয়—পশ্চিমী য়ুরোপীয় ভাষায় আইজন, আইরন প্রভৃতি ইহারই রূপভেদ। কিন্তু বৈদিক-কালে এই অয়স্ শব্দও তাম্র অর্থে প্রযুক্ত হইত। লৌহ আবিষ্কারের পর তাম্রবাচক কয়েকটি শব্দই রূঢ়ি প্রয়োগে লৌহবাচক হইয়া গিয়াছে। এই অর্থবিপত্তি পরিণতি লাভ করিবার পূর্ব পর্যন্ত লৌহকে 'কৃষ্ণঅয়স্' এবং তামাকে 'তাম্রঅয়স্' বলা হইত। পরে তাম্রঅয়স্ শব্দের ব্যবচ্ছেদ ঘটাইয়া, ইহার পূর্বার্ধ তামা, এবং অপরার্ধ অর্থাৎ অয়স্, লোহার জন্য নির্দিষ্ট হয়। ইহার সঙ্গে লোহিতবর্ণ ধাতু অর্থাৎ তাম্রদ্যোতক 'লৌহ'ও আধুনিক অর্থে লোহাবাচক হইয়া পড়ে।

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা লৌহের আবিষ্কার ১০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এবং পিতলের আবিষ্কার ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। ইহা সত্য হইলে এই দুই ধাতুকে সামন্ত যুগের দান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যাহাই হউক, তাম্রের আবিষ্কারের ফলে সমাজে যে কতকগুলি পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছিল—ইহা সত্য কথা। বহু প্রকারের পাত্র, হাতিয়ার, এমন কি মিশর দেশে রঙ পর্যন্ত, তামা হইতে প্রস্তুত হইতে থাকে। এইভাবে তামার ক্রমবর্ধিত উপযোগিতায় ধাতুশিল্প শীঘ্রই* একটি সামাজিক উদ্যোগ হিসাবে দেখা দেয়। তামার কাজে পারদর্শী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ লৌহ এবং পিতল আবিষ্কার করে। পুরাতন তামার কারিগরেরা তখন এই দুই নূতন ধাতুর কাজকর্মেও নিজেকে পারদর্শী করিয়া লয়। তিব্বতে, হিমালয়ে, এবং ভারতবর্ষেরও কোন কোন স্থানে, লোহারকে§ আদিম জাতির মধ্যে গণ্য করা হয়। এইসব লোহার বহু গোষ্ঠী এখনও পুরাতন যাযাবর অবস্থায়ই দিন কাটাইতেছে; ইহাতে মনে হয় লৌহশিল্পের প্রচলন এই সময় আদিম জাতির মধ্যে বহু পূর্বেই হইয়া গিয়াছিল। মধ্যপ্রান্ত ও ছোটনাগপুরে আদিম বাসিন্দাদের বস্তিতে ধাতুর

† প্রাদেশিক 'লোহ তুলনীয়; *দাসতা যুগে পৌছিতে পৌছিতে। §লোহকার, কর্মকার।

কুচি ও ঝামা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেও আদিম জাতিগুলি যে অনেক যুগ আগেই ধাতুশিল্প শিখিয়া লইয়াছিল—ইহা বুঝা যায়।

ধাতুর আবিষ্কারের পরও মানুষ সহসা তাহার পাষাণ অস্ত্রকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। আজও দেখি, সমাজের একদিকে কত উন্নততর আগ্নেয়াস্ত্রেরই নির্মাণের কাজ চলিতেছে; কিন্তু অন্যদিকে সেই আদিম তীর-ধনুকের যুগই এখনও শেষ হইতে পারিতেছে না। অবশ্য এই ক্ষেত্রে রাজনীতিক ও অর্থনীতিক কারণ, এবং আধুনিক অস্ত্রের মহার্ঘতাও চিন্তা করিবার বিষয়। ভারতবর্ষে প্রত্ন-তাত্ত্বিক খননের সাহায্যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এখানে প্রস্তরাস্ত্রের ব্যবহার ছিল বুঝা যায়। এলাহাবাদের নিকটবর্তী ভিটা অঞ্চলে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। পনের শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষেও প্রস্তরাস্ত্রের ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই। ইংলণ্ডে ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দেও হেষ্টিংসের যুদ্ধের সময় প্রস্তরের কুঠার যুদ্ধাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

পিতৃসত্তাযুগে তাম্র আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে মাটির বাসনপত্র তৈয়ার হইত; পরে ধাতুশিল্পের মত মৃৎশিল্পও সমাজে একটি স্বতন্ত্র পেশা হইয়া দাঁড়ায়। তিব্বত প্রভৃতি দেশে মৃৎশিল্পীর জন্য এখনও কোন পৃথক সামাজিক বর্গ নির্দিষ্ট হয় নাই। সেখানে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই নিজেদের উপযোগী বাসনপত্র ঘরে তৈয়ার করিয়া লয়।

শ্রেণীভেদের আরম্ভ

আদিম সাম্যবাদী সমাজে* ব্যৈক্তিক সম্পত্তি কি তাহা মানুষ বুঝিতে পারিত না; এমনকি সংঘ হইতে তাহার যে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে,—এই ধারণাই মানুষের ছিল না। তখনকার উৎপাদন সাংঘিক ছিল, এবং উৎপন্ন বস্তুর ভোগও সাংঘিক ছিল: সমাজে উচ্চ-নীচ ও ধনী-দরিদ্রের বিভেদ তখনও সৃষ্ট হয় নাই—তাই সমাজে তখন শ্রেণীই ছিল না এবং শ্রেণীশাসনও ছিল না। কিন্তু পিতৃসত্তার যুগে আমরা স্বতন্ত্র জগতে প্রবেশ করিতেছি। তখন জনসত্তা বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার সাংঘিক আচার-নিয়মও লোপ পাইয়াছে; ইহার স্থলে এক ব্যক্তি—অর্থাৎ গোষ্ঠীপিতা বা পিতর—সমাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে; মানুষের ব্যৈক্তিক অস্তিত্ব বা ব্যৈক্তিক সম্পত্তিরও এখন সৃষ্টি হইয়াছে। ফলসঞ্চয় ও শিকারের অনিশ্চিত জীবনবৃত্তির

* ক্যমুন।

স্থলে এখন পশুপালন ও কৃষির উদ্ভব হইয়াছে; ফলে, আকস্মিক আকাল ও মারীর সম্ভাবনাও পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদনের গতি ধীর ছিল, জনসমাজে আসিয়াও ইহার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই; কিন্তু পিতৃসত্তার যুগে নূতন আবিষ্কৃত ধাতু ও হাতিয়ার পাত্রের সহায়তায় উৎপাদনের বেগ বাড়িল—বিনিময়, গৃহশিল্প ও ধাতুশিল্পের সহায়তায় ব্যৈক্তিক সম্পত্তি লাভেরও পথ খুলিয়া গেল। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ও জনসমাজ ক্ষুদ্র গুচ্ছের সমন্বয়ে সৃষ্ট ছিল। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এই গুচ্ছগুলিতে জীবনোপযোগী বস্তুর অনটন হইতে থাকে। ইহাতে বিভিন্ন গুচ্ছের মধ্যে দ্বন্দ্ব, লোভ ও পরস্ব লুণ্ঠনের প্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়। তখন এই সংঘর্ষে সংখ্যা ও সংগঠনের দিক দিয়া শক্তিশালী গুচ্ছকগুলিই জয়লাভ করে। জনসমাজের সংগঠিত রূপ হিসাবে কিভাবে পিতৃসত্তা সৃষ্ট হয় তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

পিতৃসত্তার যুগে ব্যৈক্তিক সম্পত্তি বৃদ্ধি করার বিষয়ে পিতর ও মহাপিতর-দেরই সর্বাপেক্ষা সুবিধা ছিল। কারণ পশু, ক্ষেত এবং সম্পত্তি অর্জনের অন্যান্য সাধন অধিকাংশই পিতরেরা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সমাজের ভূমিহীন ও পশুহীন মানুষদিগকে ইহারা অন্নবস্ত্র দিয়া নিজেদের কাজ করাইয়া লইতেন—এবং তাহাদের শ্রমফল নিজে ভোগ করিতেন এবং কিছু অংশ নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধিতে নিয়োজিত করিতেন। এই সময় বিনিময়-বস্তুর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার নির্মাণের জন্য শ্রমের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু হইলে কি হইবে, ইহাতে চাকরের অধিকার-সাম্যের কোন সুবিধা হইল না। বিশেষত আবাদের উপযোগী বহু স্থান তখনও পতিত পড়িয়া ছিল, দেশে অরণ্যের অভাব না থাকায় শিকার বা বন্য কন্দমূলের পথও বন্ধ ছিল না—তাই পিতরদের ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও সম্পত্তিহীন দাসের সংখ্যা তখন তত অধিক হইতে পারে নাই।

কিন্তু শ্রমের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজে তখন এক পরিবর্তন আসিয়াছিল। পূর্বে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত শত্রুকে সংহার করা হইত, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহাকে আহারও করা হইত;—শত্রুকে বন্দী করার নীতি পূর্বগামী সমাজে কখনও দেখা যায় নাই; কারণ, বন্দীর ভরণপোষণের দায়িত্ব লওয়া তখন সাংঘিক সম্পত্তির পক্ষে হানিকর বিবেচিত হইত। ইহার উপর সংঘসম্বন্ধ তখন এত দৃঢ় ছিল যে, ইহার মধ্যে অন্যের প্রবেশ তাহারা সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু পিতৃসত্তার সময় এই সংঘপ্রাণতা শিথিল এবং প্রায় বিনষ্ট হইয়া যায়। হস্তশিল্প, ধাতুশিল্প ও পশুচারণার জন্য তখন ক্রমে শ্রমসমর্থ লোকের প্রয়োজন বাড়িতে থাকে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত খাদ্য হিসাবে

খরগোশ ও ইঁদুর পোষা হইত ; কিন্তু চামড়ার দাম চড়িতে আরম্ভ করিবার পর ইঁদুর বা খরগোশকে আর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হইত না। এইভাবে যুদ্ধবন্দীরও নূতন উপযোগিতা আবিষ্কৃত হওয়ার পর তাহাকে হত্যা না করিয়া বন্দী করা হইত। মোটের উপর শ্রমের প্রয়োজনেই পিতৃসত্তাযুগে দাসতার সৃষ্টি হয়, পরে দাস এবং প্রভু এই দুইটি বিরোধী শ্রেণী সমাজে কায়েম হইয়া পড়ে।

পিতৃসত্তাযুগে শ্রমের উপজ বৃদ্ধি হওয়ায় ব্যৈক্তিক সম্পত্তিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়া গিয়াছিল। ধনশালীদের মধ্য হইতে সমাজে তখন এক নূতন আমীর শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। আমীরেরা আর্থিক শক্তিতে রাজনীতিক শক্তি করায়ত্ত করিয়া তাহাকে বংশগত রূপ দিতে চেষ্টা করে। এইভাবে পূর্বের সমানতা, সাংঘিকতা সমস্তই ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায় এবং সমাজে দুই বিরোধী শ্রেণী অর্থাৎ শাসক ও শোষিতের সৃষ্টি হইতে থাকে। পূর্ববর্তী সমাজে কোন শাসক ছিল না খুবই সত্য, কিন্তু সামূহিক সম্পত্তির স্বামী সমগ্র জন তখন সশস্ত্র ছিল। জন তাহার সামূহিক সত্ব ব্যক্তির হাতে তুলিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় পরাধীনতা স্বীকার করিতে চাহিল না। তাই শ্রেণীরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রথম দিক দিয়া তেমন কুসুমাকীর্ণ হইতে পারে নাই—বহু হিংস্র সংঘর্ষ এবং রক্তপাতের মধ্য দিয়া নূতন শাসককে তাহার অধিকার স্থাপন করিতে হইয়াছে।

পিতৃসত্তার প্রাথমিক স্তরে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প ব্যবসায় সমুদয়ই পারিবারিক সীমাতে আবদ্ধ ছিল। শিল্পদ্রব্যের পরিমাণ বা নির্মাণকৌশলের দিক দিয়া তখন যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক পরিবারই এই সময় সুন্দর সুন্দর কাপড়, ধাতু ও মাটির বাসনপত্র—এবং এইরূপ আরও বহু জিনিস তৈয়ার করিতে পারিত। পিতৃসত্তার যুগে শিল্প প্রকৃতপক্ষে সহস্রধার হইয়া উঠে এবং এইজন্য শিল্পক্ষেত্রে একটি শ্রমের স্থায়ী বিভাগেরও প্রয়োজন হয়। এইভাবে কৃষিকর্ম হইতে হস্তশিল্প ক্রমে পৃথক হইয়া যায় এবং ধীরে ধীরে শিল্পীদের একটি স্বতন্ত্র গুচ্ছ বা জাতির সৃষ্টি হয়। এই শ্রমবিভাগের ফলে শিল্পবস্তুর উৎপাদন বাড়িতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণের দিক দিয়াও ইহাদের যথেষ্ট উন্নতি হয় ; পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জিনিসপত্রের দাম তখন হ্রাস পায় এবং শিল্পদ্রব্যের উত্তরোত্তর অধিকতর চাহিদাতে শিল্পীর জীবিকা নিশ্চিত হইয়া পড়ে। কিন্তু এত হইলেও উৎপাদনের ফল তখন সকলের একরূপ জুটিত না—ইহাতে শিল্পের উন্নতি সত্ত্বেও সমাজের বর্গভেদ, বর্গদ্বেষ প্রভৃতি বাড়িয়াই চলিতে থাকে।

শাসন

সমাজের শাসনযন্ত্রের উপর সর্বদা তাহার মূল গঠনের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। পিতৃসত্তাক সমাজে বর্গভেদ ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছিল—এইজন্য তাহার শাসনযন্ত্রে স্বাভাবিকভাবেই ইহার প্রভাব পড়িতে থাকে। সাংঘিক সম্পত্তির স্থলে ব্যৈক্তিক সম্পত্তির বিকাশ প্রথম খুব ধীর মন্থর গতিতে আরম্ভ হয়—তখন ব্যৈক্তিক সম্পত্তির আকার, আয়তন, কিংবা প্রভাব, কিছুই এত ব্যাপক ছিল না। নূতন হাতিয়ার, নূতন উৎপাদনরীতি কিভাবে ইহার মূলে প্রেরণা দিয়াছিল, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। সমাজে এক সময় খুব দৃঢ় সংঘপ্রেম এবং সাংঘিক রীতি প্রচলিত ছিল—কিন্তু উৎপাদনের রূপ পরিবর্তিত হওয়ায় বস্তুস্থিতি ভাবুকতাকে নির্বল করিয়া দিল। ইহার ফলে একদিন প্রায় বিনা বাধায় মাতৃকর্তৃক সমাজ বিলুপ্ত হইয়া গেল। মাতৃতন্ত্রের শাসনতন্ত্র মানুষের জীবনরীতি এক অভিন্ন, অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল; তখন ইহাকে সংঘের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইত না—কিন্তু পিতৃসত্তার যুগে আসিয়া শাসন জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং পিতর, মহাপিতরেরা সমস্ত শাসনক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রিত করিয়া লয়। জনযুগে জীবিকার সাধন সাংঘিক থাকায় জন ইহার রক্ষার জন্য অপরাধীকে শিক্ষা বা শাস্তি দিত; প্রয়োজন হইলে কখনও কখনও তাহারা বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধ করিত, কিংবা কখনও সন্ধিও করিত—কিন্তু সকল সময়ই তাহাদের মূল স্বার্থ থাকিত সাংঘিক। পিতৃসত্তার যুগে জীবিকার সাধন ব্যৈক্তিক হইয়া উঠায় উৎপাদন-সম্পর্কও তখন ব্যক্তির সঙ্গে স্থাপিত হয়। ইহার প্রভাবে নিজেদের আভ্যন্তরিক শাসন এবং প্রতিবেশীর সহিত সম্পর্ক—সমস্তই ব্যৈক্তিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হয়। এইভাবে শাসন সমাজের সহস্রের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাহাই আবার ব্যক্তিস্বার্থ সুরক্ষার জন্য দূর হইতে তাহাদের উপর উদ্যত হইয়া থাকে। ইহার পরবর্তী সংহত রূপই হইতেছে রাজতন্ত্র এবং বর্গভেদের আরম্ভের সঙ্গেই রাজতন্ত্রের সূচনা—তাই রাজা বিষ্ণুস্বরূপও নহেন এবং তাঁহার রাজ্যও অনাদিকালের নহে, ইহারা উভয়েই ব্যৈক্তিক সম্পত্তির সৃষ্টি এবং বহু পরবর্তী যুগের সৃষ্টি।

পিতৃসত্তার সময় সমাজে বস্তুর আবশ্যকতা† এবং উৎপাদন খুব বহুমুখীন হইয়া পড়িয়াছিল। ধন উপার্জনের প্রতিযোগিতায় তখন বর্তমান কালের মত হঠাৎ নিঃস্ব হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না;—এইজন্য বর্গশাসনের প্রথম স্তরে ইহার গতি যে কোন্ দিকে তাহা মানুষ ঠিক বুঝিতে পারে নাই। জনসত্তাক সমাজে

† জীবনোপযোগী দ্রব্যাদির আবশ্যকতা

জন বা সংঘের সামূহিক শক্তিই একমাত্র প্রবল ছিল—কাহারও ব্যক্তিগত বিশেষতা থাকিলে তাহাও তখন শুদ্ধমাত্র সংঘের সেবায়ই নিয়োজিত হইত,—অর্থাৎ ব্যক্তির যোগ্যতা, বীরত্ব, বুদ্ধি এবং পৌরুষ তখন সংঘের অন্তর্গত হইয়াই সার্থক হইত। কিন্তু বর্গসমাজে ব্যক্তির সমাজসম্পর্ক এত গভীর নয়, এখানে ব্যক্তির শুধু ব্যক্তি হিসাবেই প্রাধান্য আছে; তাহার যোগ্যতা এখন একমাত্র শারীরিক বা মানসিক গুণের উপরই নির্ভর করে না—এই সমাজে বৈয়ক্তিক সম্পত্তি তাহার অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বৈয়ক্তিক সম্পত্তির বলে শাসক অপরাপর শ্রেণীকে শ্রমের সুবিধা দিয়া তাহাদের জীবিকার পথ করিয়া দেয়; ইহাতে শাসিত শ্রেণী শাসকবর্গের মনোমত হইয়া গঠিত হইয়া উঠিতে পারে। শ্রেণীসমাজে ধনীশ্রেণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিলেও ইহাদের সকলের শ্রেণীস্বার্থ এক: ইহারা প্রত্যেকেই সাংঘিক সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া তাহাকে বৈয়ক্তিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করিতে চায়;—এইজন্য তাহাদের আভ্যন্তরিক প্রতিযোগিতা বৈয়ক্তিক স্বার্থের পক্ষে কখনও তেমন মারাত্মক হয় না; প্রয়োজন হইলে ইহারা শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য সকলে একত্র হইয়াই শত্রুর বিরোধিতা করে;—প্রাচীন পিতৃসত্তা যুগেও ধনীশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য এইরূপ মিলন যথেষ্ট হইয়াছিল।

সমাজে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি হওয়ায় নূতন শাসকবর্গের আরও একটি সুবিধা হইল। জনযুগে জনের চালনা করিয়াও মানুষকে শারীরিক শ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে হইত। ইহাতে শিল্পকলা বা এইরূপ অন্যান্য উদ্যোগে ব্যয়ের মত উদ্বৃত্ত সময় তাহাদের হাতে থাকিত না। কিন্তু নূতন যুগে ইরাণের দেবক বা বুদ্ধের কথিত রাজার মত পিতরদের জীবিকার চিন্তা সমাজের উপর ন্যস্ত হয়। সমাজ তখন দরিদ্র শ্রমজীবী এবং যুদ্ধবন্দী দাসদের সাহায্যে ইঁহাদের জীবিকা যোগাইতে থাকে। ইহাতে শাসনের সামান্য সময় বাদ দিয়া পিতর ও মহাপিতরেরা বাকী সময় 'সঙ্গীত-সাহিত্য-কলায়' নিয়োগ করিতে পারিতেন। পূর্ববর্তী সমাজে মানুষের জীবিকার নূতন উপায় আবিষ্কার করিতে বহু যুগ কাটিয়া যাইত—আহার সংগ্রহের পর অন্য চিন্তা করিবার মত সময় বা শক্তি তাহাদের বড় বেশি থাকিত না। প্রথম দিকে ধাতু বা হাতিয়ার-পাত্রের আবিষ্কার উদ্ভাবনও এইজন্য অনেকটা আকস্মিক—ইহাদের অধিকাংশই মানুষের কোন সুবিন্যস্ত চিন্তার ফল নহে। কিন্তু নূতন যুগে পিতরেরা জীবিকা অর্জনের দায় হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদের সময় এবং শক্তি নূতন উদ্ভাবনে নিয়োগ করিতে পারিলেন। ইহার ফলে সমাজে বহু নূতন উদ্ভাবন এবং আবিষ্কার সম্ভব হইল, এবং তাহাতে সমাজে প্রগতির বেগও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বাড়িয়া গেল। এইভাবে সমাজে শ্রম-

মুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা যত বাড়িয়াছে, নূতন আবিষ্কার উদ্ভাবনের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই বলিয়া উৎপাদন-শ্রমের দায়মুক্ত সমস্ত ব্যক্তিই যে নূতন আবিষ্কার উদ্ভাবনের সহায়ক হইয়াছিল তাহা নহে; বরং ইহাদের অধিকাংশই অন্যের শ্রমসৃষ্ট জীবিকা ভোগ করিয়া একান্ত নিশ্চলভাবে দিন কাটাইতেছিল।

ধর্ম

ধর্ম বিষয়ে মানুষের দৃষ্টি সর্বপ্রথম রুধির ও যৌনসম্বন্ধের দিকে আকৃষ্ট হয়। রক্তপাতের ফলে মৃত ও হতচেতন ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহারা রুধিরকে জীবন মনে করিত; এবং যৌনসম্বন্ধের দ্বারা নূতন জীবের উদ্ভব লক্ষ্য করিয়া ইহাকে অত্যন্ত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখিত। দৈবশক্তির* নিকট হইতে শুভলাভ ও ভয়-শান্তির আশায় রুধিরদান সর্বপ্রথম ধার্মিক কৃত্যে পরিণত হয়। আদিম যুগে মুমূর্ষুর দেহে রক্ত সঞ্চালিত করিয়া তাহার চৈতন্য আনয়নের চেষ্টাও মানুষ করিয়াছিল। কিন্তু এক শরীরের রক্ত অপর শরীরে দান করিতে হইলে যে বৈজ্ঞানিক বিদ্যাবুদ্ধির দরকার তাহা তাহাদের কিছুই ছিল না—এমন কি উনবিংশ শতকেও ইহার নিয়মপ্রণালী খুব কমই আবিষ্কৃত হয়; পরে বিংশ শতকের প্রথম পাদে গত মহাযুদ্ধের সময় এই জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু তবুও মনে হয়, হয়ত কোন আকস্মিক সংযোগবশে আদিম মানুষ মূর্ছিতের দেহে রক্ত সঞ্চালিত করিয়া তাহাকে বাঁচাইতে পারিয়াছিল; এবং এই সার্থকতার জন্যই হয়ত রক্তকে তাহারা চিরকাল এত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে,—এবং ইহাকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদজ্ঞানে দেবতার উদ্দেশ্যে তাহারা অর্ঘও দিয়াছে। আদিম যুগে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা সম্পর্কে বিশ্বাস সৃষ্ট হইবার পর রক্তদানের মাহাত্ম্য আরও অনেকগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। যৌনসম্বন্ধের চমৎকারিত্বের জন্য শরীরের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের জননাঙ্গ তখন সর্বাপেক্ষা রহস্যময়ী শক্তি বলিয়া বিবেচিত হইত;—এইজন্য দৈবশক্তির সন্তুষ্টির জন্য জননাঙ্গের রুধির দানই তাহাদের নিকট বেশি উপযোগী বলিয়া মনে হয়। বর্তমান সমাজেও এই† প্রথা একেবারে লুপ্ত হয় নাই—বহু জাতি এই আচারকে এখনও পবিত্র ধার্মিক কৃত্যের অঙ্গ হিসাবে দেখিয়া থাকে। রুধিরদান আদিম সমাজে ধর্মের অঙ্গ হইয়া উঠিলে, ক্রমে পশুবলি এবং নরবলির প্রথাও সমাজে প্রচলিত হইয়া যায়; এবং রুধিরের এইরূপ মাহাত্ম্যের জন্য ইহার বর্ণ, অর্থাৎ

* রহস্যময়ী শক্তির আধার; † Circumcision.

লাল রঙও, শেষে দৈবশক্তির পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। আদিম জাতির শবের সঙ্গে গৈরিক বা রক্তবর্ণের যে সব মৃত্তিকা পাওয়া যাইতেছে—ইহার মূল কারণ তাহাই ; এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে রক্তিম বেশভূষা বা গুঞ্জামালার যে প্রচলন দেখা যায়—ইহারও এই একই কারণ।* এইভাবে রুধির ও রুধিরের প্রতীক রক্তবর্ণ—উভয়ই ধর্মের আরম্ভিক বিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, জননক্রিয়াকে দিব্যশক্তিমত্তার পরিচয় মনে করিয়া আদিম মানুষের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। ইহার ফলে রক্তবর্ণের মত জনন-ক্রিয়ার প্রতীক যৌন চিহ্নাদিও ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে সিন্ধু উপত্যকাবাসীরা ভগ ও লিঙ্গ পূজাকে আপন ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিত ; হড়প্পা এবং মোহেন জোডরোর খননে স্ত্রী-পুরুষের জননাঙ্গের অনেক প্রস্তরপ্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। লিঙ্গকে দেবতা জ্ঞান করিবার জন্য আর্যেরা ইহাদিগকে শিশ্নদেবা† বলিয়া উপহাস করিত। দক্ষিণ ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে লিঙ্গমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার আকৃতি ঠিক পুরুষ-লিঙ্গের অনুরূপ। আকৃতির দিক দিয়া কড়ি ও যোনির মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে—এইজন্য কড়ি ক্রমে স্ত্রী-অঙ্গের প্রতীকরূপে গৃহীত হয়। আদিম জাতির মধ্যে শিশুকে ভূতপ্রেতের কুদৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহার শরীরে কড়ি বাঁধিয়া দেওয়া হইত ; শুধু আদিম জাতিই কেন, ভারতবর্ষের বহু সুসভ্য হিন্দুপরিবারের কড়ি বাঁধিবার রীতি এখনও পর্যন্ত টিকিয়া আছে। কোনরূপ আঘাত পাইলে কিংবা ফোড়া হইলে—কালো ঘুন্‌সীতে বাঁধিয়া কড়ি ধারণ করা এখনও প্রায় চিকিৎসার অঙ্গস্বরূপ। এইরূপ পুং-অঙ্গের প্রতীক শিবলিঙ্গকে বহু বড় বড় দার্শনিকও ভক্তিগদগদ ভাবে পূজা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে পুরানোপন্থী সংস্কৃত পণ্ডিত যেমন আছেন, আধুনিকপন্থী বিদ্যাধুরন্ধররাও তেমন সংখ্যায় নগণ্য হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদের পূজ্য প্রতিমাটির প্রকৃত রূপ কি ? —ইহা নিবদ্ধলিঙ্গ যোনির মৃৎ বা প্রস্তরমূর্তি ছাড়া কিছুই নয় ! বর্তমান যুগের শিক্ষিত হিন্দুর অবস্থাও যদি এই হয়, তবে ধর্মের ক, খ, পড়ুয়া বর্বর মানুষের দোষ কোথায় ?

আদিম সমাজে জননাঙ্গ ও রুধিরের সঙ্গে ভূত, প্রেত এবং মৃতাত্মার ভয়ও ধর্মের প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করিয়াছে। তখন মানুষ চাঁদ, সূর্য এবং এইরূপ অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তিকেও দেবতাত্মা বলিয়া মনে করিত। ইহাতে

---

* অর্থাৎ এখানে রক্তবর্ণের দৈবশক্তির ধারণায় এইসব আচার গৃহীত হইয়াছিল।

† শিশ্ন বা লিঙ্গ যাহার দেবতা ; বৈদিক সাহিত্যে ইহাদিগকে অসুর বলা হইয়াছে।

তাহাদের আদিম ভয় ও বিস্ময় একেবারে সর্বময় হইয়া পড়ে; ফলে, ভয়শান্তি, দেবতার তুষ্টিবিধান—এ সমস্তই সামাজিক কর্তব্যে দাঁড়াইয়া যায়। পিতৃসত্তার যুগে পিতর বা মহাপিতর গোষ্ঠীর শাসনকার্যের সঙ্গে এই ধর্মকৃত্যেরও দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইহাতে ব্যৈক্তিক সম্পত্তির অর্জন ও রক্ষণ ব্যাপারেও তাঁহাদের অনেক রকমের সুবিধা হয়। পিতরেরা এইভাবে সমাজের ধর্ম-পুরোহিত হইয়া দেবতা ও মানুষের মধ্যে মধ্যগ হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। 'দেবতা তখন আহ্বান মাত্রই পিতরের মস্তিষ্কে আসিয়া ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বলিয়া দিয়া যাইতেন। ইহাতে পিতর মনুষ্যলোকের দেব-সন্দেশ-বাহক হন এবং তাঁহার পদবী, প্রভুত্ব, ব্যৈক্তিক সম্পত্তি সমস্তই প্রশ্নাতীত হইয়া পড়ে,—আর মরণধর্মী মানুষ দেবদত্ত সম্পত্তি কিংবা দেবতাত্মা পিতরের বিরোধিতা করিবেই বা কোন্ শক্তিতে? তাই দেখিতেছি, বর্গশাসনের মূলে উন্নত উৎপাদনরীতির প্রেরণা ছাড়া ধর্মের সহায়তাও খুব কম ছিল না। এই ধার্মিক প্রভাবের বলে গোষ্ঠীপতি পিতর দেবপ্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হয় এবং পরবর্তী যুগে রাজা বিষ্ণুর অংশ বলিয়া কীর্তিত হইতে থাকে। ইহার পর শতাব্দ সহস্রাব্দ ব্যাপিয়া দেববাদ ও ধর্মবাদ সমাজের উপর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে—আজ সমাজে ব্যৈক্তিক সম্পত্তিকে উচিত মনে করিবার অবস্থা সৃষ্ট হইয়া থাকিলে আশ্চর্যের কিছুই নাই।

পণ্ডিতেরা* মনে করেন, কৃষিকর্ম আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হরিৎবর্ণের প্রতিও বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। কারণ হরিৎ শস্যের বর্ণ, ইহাকে আশ্রয় করিয়া অঙ্কুরের জীবন-বিকাশ হয়—এই সত্যই আদিম মানবের চোখে হরিৎকে জীবনের রূপক হিসাবে গ্রহণ করার প্রেরণা দেয়। হরিৎবর্ণের সঙ্গে জীবন-সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইবার পর ইহাও ধর্মের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়ে; এইভাবে ধর্মকৃত্যাদিতে জীবনের প্রতীকরূপে হরিৎবর্ণের চূর্ণ ও অবলেপের ব্যবহার আরম্ভ হয়; তখন তুঁতিয়া, তৈল ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণে ইহার নির্মাণ চলিতে থাকে। অবশ্য ক্রমে ধর্মের সম্পর্ক ছাড়া নিছক সৌন্দর্যবর্ধনের জন্যও ইহার প্রচলন হয়। মিশরের প্রাচীনতম মমিগুলিকে দেখিলে দেখা যায় যে, ইহাদের রঙও হরিৎ—মিশরীরা বহু পূর্বকাল হইতেই বর্ণক নির্মাণের চেষ্টা করিতেছিল—তাই তুঁতিয়া গরম করিয়া মমির জন্য গাঢ় রঙ আবিষ্কার করা তাহাদের পক্ষে অসাধ্য হয় নাই। মিশরীয়দের ধারণা ছিল মমিকে হরিৎ রঙে রাঙাইলে মৃতের অমরত্ব লাভ হয়—এই ধর্মকৃত্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণকের উপযোগিতা পরীক্ষা করিতে গিয়া তাহারা তামা আবিষ্কার করে। তামার

* কোন কোন পণ্ডিত।

আবিষ্কারকে এইজন্যই আদিম যুগে ঠিক সাধারণ আবিষ্কারের পর্যায়ে ফেলা হইত না। তামা আবিষ্কারের পর ইহাকে তাতাইলে-পিটিলে তাহা যে তীক্ষ্ণ হয় ইহাও মিশরীরা শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিল—কারণ, বর্ণক নির্মাণের ফলে তুঁতিয়াকে গরম করিয়া ইহাকে চূর্ণ করা এবং এইরূপ অন্যান্য প্রক্রিয়ার ফল তাহারা বুঝিত।

হরিৎ ও রক্তবর্ণের মত পীতবর্ণও একদিন মানুষের নিকট জীবনপ্রদ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল—ইহার কারণ প্রভাতসূর্যের বর্ণের সঙ্গে পীতবর্ণের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। মিশরে স্থায়ী বাস স্থাপনার বহু পূর্বেই চন্দ্রমা আদিম মানুষের শিকার ও নির্ভয়তার দেবতা হয়। স্ত্রীলোকের রজোধর্মের সঙ্গে চান্দ্রমাসের ঐক্য দেখিয়াও তাহারা খুব বিস্মিত হইয়াছিল—এইজন্য চন্দ্র শুধু আর শিকার বা নির্ভয়তার দেবতাই রহিল না, ক্রমে রজপ্রবর্তক এবং জীবজন্মের সহায়ক দেবতা বলিয়াও গণ্য হইল। নীল উপত্যকায় আসিয়া মানুষ নীলের বাঢ় ও ষড়ঋতুর সঙ্গে লুব্ধক এবং সূর্যের সম্বন্ধ আবিষ্কার করে—ইহাতে পুরাতন চন্দ্রমার সঙ্গে আবার সূর্য এবং লুব্ধকও জীবনদাতা দেবতা রূপে গণ্য হয়। সময় অতীত হইবার সঙ্গে পিতর, সামন্ত এবং রাজারা মৃত্যুর পর তারকালোকে স্থান পাইতে থাকে।* ভারতবর্ষেও এইরূপ সপ্তর্ষির প্রতিকল্প বলিয়া একটি তারকামণ্ডলকে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে এই শ্রদ্ধা ও কল্পনা ফলিত জ্যোতিষের ভিত্তি স্থাপনা করে এবং ক্রমে দৈবজ্ঞতার মোহ ব্যক্তি ও সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

ধর্মবিষয়ক অন্যান্য ধারণার মত গাভীকে পবিত্র জ্ঞান করিবার প্রথা সর্বপ্রথম মিশরেই সৃষ্ট হয়। তাই বলিয়া প্রাচীন মিশরবাসীরা যে গাভীকে অবধ্য মনে করিত ইহা ভাবিবার কোন হেতু নাই। ভারতীয় আর্যদের যজ্ঞীয় পশুর মত মিশরেও গাভীকে দেবতার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলি বিবেচনা করা হইত। গো-দুগ্ধের জীবনরক্ষণ শক্তিতে বিস্মিত হইয়া মানুষ এক সময় গাভীকে দিব্য ও পবিত্র বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করে। মিশরীয়রা গাভীকে চন্দ্রমার সঙ্গে, আকাশকে গাভীর সঙ্গে এবং মাতাদেবী বা দিব্য মাতাকে আকাশের সঙ্গে জুড়িয়া চরাচরব্যাপী এক দেবপরম্পরা সৃষ্টি করে। গাভীর স্তনের নীচে দুগ্ধপান-রত মানুষকে দেখিয়া মিশরীয়দের মনে এক কল্পনার উদ্রেক হইয়াছিল—দুগ্ধদানের সময় মানুষের উপর গাভীর আনত শরীরকে তাহারা আকাশীর গোলার্ধের মত মনে করে এবং এইরূপে গোমাতা, আকাশমাতা এবং দেবীমাতার এক পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়।

* পিতর, সামন্ত ও রাজাদের অমরত্ব লাভের কল্পনা।

চতুর্থ অধ্যায়

সভ্য মানব সমাজ (১)

সভ্য মানব সমাজ বলিতে আমরা নিশ্চয় কোন স্বার্থত্যাগপরায়ণ উচ্চ মানব সমাজের কথা বুঝিব না, কারণ পিতৃসত্তা কিভাবে স্বার্থান্ধতাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহার পর হইতে সমাজের সামূহিক স্বার্থ চিরদিনই অবহেলিত হইয়া আসিয়াছে; এবং তাহার স্থলে ব্যক্তি-স্বার্থ বা বৈয়ক্তিক সম্পত্তি মানুষের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিস্বার্থপূর্ণ সভ্যতাকে আমরা তিনটি পৃথক অবস্থায় ভাগ করিতে পারি: (১) দাসতা যুগ, (২) সামন্তবাদী যুগ, এবং (৩) বর্তমান পুঁজিবাদী যুগ। সভ্যতার বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এঙ্গেলস্ লিখিয়াছেন, "সমাজ বিকাশের একটি বিশেষ অবস্থার নাম হইতেছে সভ্যতা;—ইহাতে শ্রমবিভাগ, শ্রমজাত বস্তুর বিনিময় ও শ্রমবিভাগের সহিত সম্পর্কিত পণ্যোৎপাদন—পূর্ণতা লাভ করে; ইহার ফলে পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থায় এই সময় এক বিপ্লবকারী পরিবর্তন উপস্থিত হয়।"

পণ্য উৎপাদনের যে অবস্থায় আসিয়া সভ্যতার বিকাশ আরম্ভ হয়, তাহার সম্বন্ধে এঙ্গেলস্ বলিতেছেন: "আর্থিক দিক হইতে ইহার বিশেষত্ব হইতেছে, (১) ধাতুধনের সঙ্গে মুদ্রা, পুঁজি ও সুদের ব্যবসায়ের আরম্ভ, (২) উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে এক নূতন মধ্যগ বর্গ বা বানিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, (৩) ভূমির উপর ব্যক্তির স্বামিত্ব, ইহাতে তাহার রেহান-বিক্রয়ের অধিকার, এবং (৪) উৎপাদন-ক্রিয়ায় দাসদিগের শ্রমের পূর্বাপেক্ষা অধিকতর নিয়োগ।" সভ্য সমাজের পরিবার, রাজনৈতিক বিশেষত্ব এবং বৈয়ক্তিক সম্পত্তি সম্বন্ধে এঙ্গেলসের বক্তব্য হইতেছে: "সভ্যতাযুগে পরিবারের যে গতি দেখা যায় তাহাতে একবিবাহ, স্ত্রীর উপর পুরুষের শাসন এবং পূর্বের সামূহিক সম্পত্তি বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বণ্টন—ইহার অন্যতম বিশেষত্ব। সভ্যতাযুগের সমাজে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পরস্পর সম্পর্ক স্থাপনার সূত্র হইল রাজ্য; এবং এই রাজ্য সকল সময় এবং সকল অবস্থায়ই ধনিক শ্রেণীর রাজ্য—পীড়িত ও শোষিতদিগকে আয়ত্তে রাখার জন্য ইহা একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সভ্যতার অপর দুইটি বিশেষত্ব হইল—সামাজিক শ্রমবিভাগের আধারের উপর নগর ও গ্রামের বিরোধ স্থাপন করা এবং সকল সম্পত্তিকে হস্তান্তরিত হইবার অর্থাৎ অপরের অধিকারে যাইবার

ব্যবস্থা করা। ইহাতে, এমন কি, সম্পত্তির মূল মালিকের মৃত্যুর পরও তাহার প্রদত্ত অধিকার নষ্ট হয় না,—কিন্তু জনসংস্থার উপর এই অধিকারের ফলে খুব প্রচণ্ড ও প্রত্যক্ষ ভাবেই আঘাত আসে। এথেন্স[১] সোলোনের সময়[২] পর্যন্তও এই প্রকার কোন অধিকার বর্তমান ছিল না; ইহার প্রথম প্রবর্তন হইয়াছিল রোমে এবং জার্মাণীতে ভক্তজার্মাণরা যাহাতে বিনা বাধায় তাহাদের সম্পত্তি মঠে দান করিয়া দিতে পারে—এই উদ্দেশ্যে পুরোহিতেরা[৩] তাহার প্রবর্তন করিয়াছিল।"

হিন্দী-য়ুরোপীয় জাতি—য়ুনানী, ইরাণী এবং ভারতীয় প্রভৃতি হিন্দী-য়ুরোপীয় জাতি বহু পূর্বেই[৪] সংসারে সভ্যতার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল; এবং বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা গঠনের কৃতিত্বও প্রায় সম্পূর্ণভাবে য়ুরোপীয় জাতিরই[৫] প্রাপ্য। কিন্তু তাহা হইলেও মিশর, মেসোপোতামিয়া বা সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের তুলনায় ইহাদের সভ্যতা বহুদিনের অর্বাচীন। মিশরীয়েরা* পিতৃসত্তা-দাসতা যুগ অতিক্রম কবিয়া সামন্তবাদে পৌছিবার সময় হিন্দী-য়ুরোপীয় জাতি উরাল ও বাল্টিকের মধ্যে বাস করিত। তাহাদের সমাজে আদিম বন্য বা জন-সমাজের প্রাথমিক ববর অবস্থা তখনও ভালরূপ অতীত হয় নাই—এমন কি পশুপালন প্রভৃতিতেও তাহাদের ক্ষমতা তখন পর্যন্ত খুব সামান্যই ছিল। ভাষাতত্ত্ব হইতে জানা যায়, য়ুনানী ও ভারতীয় আর্য তাহাদের দেবতার জন্য পিতর বিশেষণ ব্যবহার করিত; এবং কখনও কখনও দেবজাতি বা কোন বিশেষ দেবতার নামা হিসাবেও ইহার প্রয়োগ করিতে হইত। ইহাতে মনে হয় এই দুই জাতি অর্থাৎ সমগ্র শতম্† ও কেণ্টম্‡ পরিবার তখন পিতৃসত্তাযুগে পৌছিয়া গিয়াছিল। গাভীর জন্য ইহাদের মধ্যে তখন প্রচলিত সাধারণ শব্দ ছিল—গৌ, কৌ, এবং স্থলভেদে গব্, গাব ইত্যাদি। গাভীবাচক এই সব শব্দের অস্তিত্ব থাকায় হিন্দী-য়ুরোপীয় সমাজ যে তখন গাভীর সহিত পরিচিত ছিল ইহাও প্রমাণ হয়। রুস ও সংস্কৃত, এই উভয় ভাষায়ই ভেড়া বুঝাইবার জন্য একমূল শব্দ পাওয়া যাইতেছে—সংস্কৃতে ভেড়ার নাম হইল 'অবি', আর রুসীতে তাহা 'ইবিস্', এইরূপ কুকুরের অর্থবোধক শব্দ সংস্কৃতে হইল 'শ্বক', এবং রুসীতে তাহা 'সোবক'। ইহাতে মনে হয়, অন্যেরা না হইলেও অন্তত হিন্দী-শ্লাভ অর্থাৎ সমগ্র শতম্ পরিবার তখন পশুপালনে সমর্থ

১। য়ুনান; ২। ৫৯০ খ্রীঃ পূঃ; ৩। খ্রীষ্টীয় যাজকদল; ৪। ষষ্ঠ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে; ৫। ইহারা, হিন্দী-য়ুরোপীয় জাতিরই প্রশাখা।

* মেসোপোতামিয়ন এবং সিন্ধুবাসীরাও; † জুপিতর; জৌস্পিতর; ‡ হিন্দু, ইরাণী, শ্লাভ; § য়ুনানী, লাতিনী, জর্মনিক।

হইয়াছে। এই অবস্থায় পৌছিবার পর হিন্দী, ইরাণী ও গোষ্ঠীগুলিকে পশুপালন বিদ্যা আর নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতে হয় না। কিন্তু কৃষি বা শস্য-সম্পর্কিত কোন সাধারণ শব্দ শতম্ বা কেণ্টম্ কোন পরিবারেই পাওয়া যাইতেছে না—তাহাতে প্রমাণ হয় যে, ইহারা এক পরিবারগত থাকার সময়ে কৃষি অবস্থায় পৌছিতে পারে নাই। নীল উপত্যকা মেসোপোতামিয়া এবং সুসা প্রদেশের অধিবাসী খ্রীষ্টজন্মের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেই কৃষিস্তরে পৌছিয়াছিল। সংস্কৃত ও ইরাণী ভাষায় কৃষিসম্বন্ধী শব্দ[১] খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে আসিয়া পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে হিন্দী-য়ুরোপীয় জাতি যে সেমেতিক[২] ও হোমেতিক[৩] জাতির বহু পরে[৪] শিকার ও পশুপালন স্তর অতিক্রম করিয়াছিল—তাহা প্রমাণ হয়।

পরে মেসোপোতামিয়া ও য়ুনানে সম্প্রসারণের সময় হিন্দী-য়ুরোপীয় জাতির অশ্ব তাহার পক্ষে পরম সহায়ক হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায়, সভ্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে তাহারা অশ্বমাংসের স্বাদিষ্ট ভোজনের সঙ্গে অশ্বকে সোওয়ার পিঠে লইয়া দৌড়াইতেও শিখাইয়াছিল। ঐতিহাসিকেরা বলেন, চেঙ্গিসের দিগ্বিজয়ে ঘোড়া ও বারুদ যেমন কার্যকরী, এমন কি অপরাজেয় হইয়াছিল, হিন্দী-য়ুরোপীয়ের অশ্বও সভ্য জাতির উপর তাহাদের বিজয় লাভের তেমনই সহায়ক হইয়াছে। শতম্-কেণ্টম্ সংযুক্ত কালে সমস্ত হিন্দী-য়ুরোপীয় জাতি[৫] এক ভূ-প্রদেশে জনযুগের অন্তিম এবং পশুপালন বা পিতৃসত্তা যুগের প্রারম্ভিক অবস্থায় বাস করিত। তাহাদের ভাষায় অশ্ব বুঝাইবার জন্য কোন প্রাচীন একমূল শব্দ পাওয়া যাইতেছে না; ইহাতে শতম্-কেণ্টম্ সংযুক্ত কালে তাহারা যে অশ্বপালনে সমর্থ হয় নাই ইহাই বুঝা যায়। ইরাণী ভাষায় ঘোটকের জন্য 'অস্প' এবং সংস্কৃতে 'অশ্ব'—এই দুই শব্দের অস্তিত্বে হিন্দী-ইরাণীরা এক-পরিবারগত থাকার সময় তাহারা অশ্বপালন আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। তবে এখনও যে ঘোড়ার মাংস বা তাহার দুধ খাওয়া ছাড়া ইহার আর অন্য উপযোগিতা আবিষ্কৃত হয় নাই তাহা নয়—কারণ মূলগতভাবে দেখিতে গেলে 'আশু' শব্দের সহিত অশ্বের সম্পর্ক সহজেই ধরা পড়ে, এবং ইহাও সত্যই যে 'আশু চলৎশক্তিসম্পন্ন'[৬] পশুর নামই তখন 'অশ্ব' হইয়াছিল।

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ হইতে হিন্দীয়ুরোপীয় জাতির সভ্যতা[illegible] আমরা দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে পরপৃষ্ঠানুযায়ী বিভক্ত করিতে পারি।

১। যব, গোধূম; ২। মেসোপোতামিয়া, সুসা; ৩। মিশর[illegible]; ৪। [illegible]উপত্যকায় প্রাচীন জাতিরও পরে; ৫। বর্তমান হিন্দী, ইরাণী [illegible]য়ুরোপীয় জাতি[illegible] পূর্বজ।
৬। দৌড়ের উপযোগী—তাই সোওয়ার ব[illegible]য়া।

পরিবার	দেশ	কাল	অবস্থা	ব্যবস্থা
শতম্-কেণ্টম্[১]	দক্ষিণী রুস	৩০০০ খ্রীঃপূঃ (?)	জন, পিতৃসত্তা	শিকার
হিন্দীস্লাভ	বোল্গা-পামীর	২৫০০ খ্রীঃপূঃ (?)	জন, পিতৃসত্তা	পশুপালন
হিন্দীইরানী	পামীর[২]	২২০০ খ্রীঃপূঃ (?)	পিতৃসত্তা	কৃষি
হিন্দীআর্য	আফগানিস্থান	২০০০ খ্রীঃপূঃ	পিতৃসত্তা দাসতা	কৃষি
হিন্দীআর্য	সপ্তসিন্ধু[৩]	১৮০০ খ্রীঃপূঃ	পিতৃসত্তা	কৃষি, বাণিজ্য
হিন্দীআর্য	গঙ্গা উপত্যকা	১৫০০ খ্রীঃপূঃ	দাসতা, সামন্তবাদ	গোরক্ষা, বাণিজ্য

হিন্দীয়ুরোপীয় জাতির বিকাশ ধারা হইতে দেখা যায় যে, অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করার পূর্ব পর্যন্ত ইহাদের মধ্যে দাসতার উদ্ভব হয় নাই। হিন্দীয়ুরোপীয় পরিবারের তিনটি জাতি অর্থাৎ হিন্দীআর্য,[৪] ইরাণীআর্য এবং য়ুনানীদের পক্ষে অন্য জাতিকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের জন্মভূমি দখল করিয়া লইবার সুযোগ হইয়াছিল। হিন্দীআর্যেরা খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর সমসাময়িক কালে আফগানিস্থান হইতে সিন্ধু উপত্যকায় উপনীত হইলে সেখানকার সভ্যজাতির সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বাধে; এই সংঘর্ষে বর্বর আর্যেরাই জয়ী হয় এবং আর্যভিন্ন জাতি হইতে বহু দাস গ্রহণ করিয়া তাহারা তখন দাসতা যুগে প্রবেশ করে। ইরাণীআর্যেরা মিডিয়া দেশে* পৌঁছিবার পর মেসোপোতামিয়ার সভ্য জাতির সঙ্গে তাহাদিগকেও এইভাবে যুদ্ধ করিতে হয়; ৬০৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হুঅক্ষত্র‡ কর্তৃক অসুরদের† রাজধানী নিনেবে অধিকৃত হইলে এই যুদ্ধের অন্তিম পরিসমাপ্তি ঘটে। ইরাণীআর্যেরা অবশ্য সেই সময়ের মধ্যে দাসতা যুগ অতিক্রম করিয়া সামন্তবাদী যুগে পৌঁছিয়া গিয়াছে। পশ্চিম ইরাণে মিতন্নী আর্যদিগকে ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মেসোপোতামিয়ার সভ্য জাতির সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ করিতে হয়—বোগজ্কুইতে প্রাপ্ত একটি শিলালেখ হইতে ইহা এখন প্রমাণিত হইয়াছে। এই শিলালেখে বৈদিক আর্যদের কয়েকটি দেবতার নাম দেখিয়া অনেক প্রত্নবিদ্ মিতন্নীদিগকে ভারতীয় আর্যের শাখা বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু পিতৃসত্তা যুগে ইরাণীয় আর্যভূমি অতিক্রম করিয়া কোন ভারতীয় আর্য গোষ্ঠীর পক্ষে সেখানে যাইয়া বসতি স্থাপন করা সহজসাধ্য নয়। জর্থুস্ত্রের ধর্মসংস্কারের পর কোন কোন বৈদিক দেবতা অবশ্য ইরাণীয়দের চোখে ঘৃণিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল;—কিন্তু জর্থুস্ত্রের পূর্বে

১। হিন্দীয়ুরোপীয়; ২। উত্তর সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ আমু এবং সির নদীর উপরিপ্রদেশ; ফার্সীতে এই স্থানকে এখনও সেমী-রামিস্ বা সাত নদী বলা হয়। হিন্দুদের উত্তর কুরু এবং ইরাণীদের আর্যানা বৈজ এই দেশই; হিন্দী ও ইরাণীরা এখানে এক পরিবারগত হইয়া বাস করিত; ৩। পঞ্জাব; ৪। ভারতীয় আর্য। * মদ্র, বর্তমান হমদানের নিকটস্থ দেশ, † অসুর জাতি; ‡ মৃত্যু ৫৮৫ খ্রীঃ পূঃ।

এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। ইরাণীদের প্রথম রাজা দৈঅক্কু বা দেবকের* নাম হইতে ইরাণী ও ভারতীয় আর্যদের মধ্যে 'দেব' শব্দ একার্থবাচক ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। এইজন্য ইহাই সম্ভব যে, মিতন্নীরা জর্থুস্ত্রের ধর্মসংস্কারের বহু পূর্বে ইরাণীআর্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাহাই হউক, মেসোপোতামিয়ার অসুর ও অন্যান্য আর্যভিন্ন জাতির সহিত সংঘর্ষের পর ইরাণীআর্যও দাসতা যুগে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপ য়ুনানেও হিন্দীয়ুরোপীয় জাতির পূর্বে মিশরীয় সভ্যতার প্রতিনিধি ক্রেত** সভ্যতার সহিত সম্পর্কিত কোন ভূমধ্যদেশীয় জাতি বাস করিত। কিন্তু হিন্দীয়ুরোপীয় ঘোড়া-ওয়ালারা সেখানে পৌঁছিবার পর তাহাদের সভ্যতাও সিন্ধু-উপত্যকা ও মেসোপোতামীয় সভ্যতার মত চূর্ণ হইয়া যায়; অন্যান্য দেশের মত য়ুনানেও হিন্দীয়ুরোপীয় আর্যেরা একই ভাবে বিজয়লাভ করিয়া পশুপালন হইতে দাসতা স্তরে উপনীত হয়। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার যে, হিন্দীয়ুরোপীয়দের দাসতাযুগে প্রবেশের সময় ১০০০ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এবং ইহা শুধু দাসতাই নয় তাহাদের সভ্যতা যুগে প্রবেশ করিবারও সময়।

সভ্যতার গুণদোষ বিচার করিতে গিয়া এঙ্গেলস্ লিখিয়াছেন: "ইহা এমন একটি সামাজিক আধারের উপর সংগঠিত যে, তাহার সহায়তায় জনসমাজের পক্ষে অনেক অসম্ভব কাজও সভ্যতার পক্ষে করা সম্ভবপর হয়, কিন্তু তাহা করিতে গিয়া সভ্যতাকে মানুষের সমস্ত উচ্চবৃত্তির সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করিয়া তাহার সর্বাপেক্ষা নীচ আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তিগুলির সাহায্য নিতে হয়। সভ্যতার প্রথম দিন হইতে আজ পর্যন্ত বিচার করিলে দেখি লোভ চিরদিনই তাহার সহচর—ধন, আরও ধন, আরও অধিক ধন—তাহাও সামাজিক বা সামূহিক ধন নহে,—নীচ, মহানীচ বৈ্যক্তিক ধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই নীচ লক্ষ্য পূর্ণ করিতে গিয়া সভ্যতার ঝুলিতে সময় সময় বিজ্ঞান, কিংবা কলার উচ্চবিকাশের ফল যদি আসিয়া পড়িয়া থাকে—তবে তাহাও শুধু এই জন্য যে, ইহা ছাড়া বর্তমানে ধনের উপর তাহার যে অধিকার আছে, সেই অধিকার লাভ সম্ভব হইত না।"

সভ্যতার রূপকে আরও নগ্ন করিতে গিয়া এঙ্গেলস্ লিখিতেছেন: "প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার আধার হইল এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর অর্থাৎ অনধিকারী শ্রেণীর শোষণ—এই জন্য দেখি ইহার সমগ্র বিকাশই একটি স্থায়ী বিরোধের ভিতরে অহরহ ঘুরিয়া ফিরিতেছে; এখানে উৎপাদনের এক পাদ উন্নতি হইলেই তাহা সঙ্গে সঙ্গে শোষিত বা সংখ্যাগুরু দলকে এক পা পিছে টানিয়া আনে; কারণ, স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে যাহা এখানে লাভ, সাধারণ জনতার পক্ষে তাহাই

* মৃত্যু ৬৫৫ খ্রীঃপূঃ। **Crete.

অনিবার্য ক্ষতির কারণ। সভ্য সমাজে এক শ্রেণী সমাজের সমস্ত নূতন স্বতন্ত্রতার অধিকারী হইয়া বসে—কিন্তু অন্য শ্রেণীর জন্য শোষণ ও উৎপীড়ন ছাড়া আর কিছুরই ব্যবস্থা হয় না। যন্ত্রের উপযোগ বা তাহার ব্যবহারকে আমরা ইহার সর্বাপেক্ষা জলন্ত উদাহরণ হিসাবে লইতে পারি—হস্তশিল্পী ও মিল-মালিকের উপর যন্ত্রের প্রভাব যে কিরূপে পতিত হইয়াছে তাহা আজ পৃথিবীতে কাহারও অবিদিত নাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বর্বর সমাজে অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে কোন ভেদ সৃষ্টি করা খুবই কষ্টকর হইত; কিন্তু সভ্যতা ইহাদের মধ্যে তুলনাত্মক পার্থক্য বা ভেদকে এতই স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, মূর্খও তাহা বুঝিতে পারে। সভ্যতা এক শ্রেণীকে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সমস্ত অধিকার দিয়া দেয়, এবং ইহার বিরোধী শ্রেণীর মাথার উপর শুধু কর্তব্যের বোঝাই চাপাইয়া রাখে।....সভ্যতা যত অগ্রসর হয় তাহার সৃষ্টি দুরবস্থাকে সে ততই দানপুণ্যের দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, এইভাবে অবস্থা সহনীয় করিবার প্রচেষ্টা ছাড়া অনেকক্ষেত্রে দুঃখ-দৈন্যের অস্তিত্বকেও সে অস্বীকার করিয়া বসে।

সংক্ষেপে বলা যায়, সভ্যতা এমন এক খাসা অবস্থার সৃষ্টি করে যাহা পূর্বেকার সমাজে ত দূরের কথা, সভ্যতার আরম্ভিক কালেও ইহার কোন অস্তিত্ব দেখা যাইত না।....আর শেষঅবধি তাহার ধৃষ্টতা এতদূর পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছায় যে, তখন শোষণ ব্যাপারকেও সে শুধু শোষিত শ্রেণীরই স্বার্থ বলিয়া প্রচার করে;—আর শোষিতেরা এই কথা না বুঝিলে কিংবা তাহার বিরোধিতা করিলে—তাহা তাহাদের হিতকারী শোষকদের প্রতি চরম কৃতঘ্নতার চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়।"

মানবতত্ত্ববেত্তা মোর্গন* তাঁহার গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে সভ্যতা সম্পর্কে সম্মতি দিতে গিয়া বলিতেছেন: "সভ্যতার আগমনের পর ধনের এত বৃদ্ধি, ইহার রূপের এত প্রকারভেদ, এবং ইহার উপযোগ এত বিস্তৃত, ও মালিকদের সুবিধার জন্য ইহার এত রকমের সংরক্ষণব্যবস্থা হয় যে, সাধারণের পক্ষে ইহার নিয়ন্ত্রণ আর সম্ভব থাকে না। মানুষের মস্তিষ্ক নিজের এই কৃতি দেখিয়া তখন নিজেই বিস্ময়ে চকিত হইয়া পড়ে; কিন্তু তবু ইহাও সত্য যে, ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিবে যখন মানুষের বুদ্ধি সম্পত্তির উপর বর্তমান অধিকারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবে, রাজ্য এবং রাজ্যের রক্ষা ন্যস্ত সম্পত্তির সম্বন্ধ নির্ণয় করিবে, এবং সম্পত্তির অধিকারিগণের অধিকারের সীমাও নির্ধারিত করিয়া দিবে।....সমাজের স্বার্থ ব্যক্তির স্বার্থ অপেক্ষা বহুগুণে মূল্যবান; তাই ভবিষ্যতে এই দুই প্রকারের স্বার্থের মধ্যে ন্যায়োচিত এবং

* ইহার 'প্রাচীন সমাজ' বা *Ancient Society* (১৮৭৭ খ্রী:) নামক গ্রন্থের সহায়তায় এঙ্গেলস্ 'পরিবার, ব্যৈক্তিক সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

একটির সহিত অপরটির অনুকূল সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। সম্পত্তি অর্জন করিয়া যাওয়াই মানুষ জাতির একমাত্র উদ্দেশ্য নহে....অতীতে সম্পত্তির উন্নতির জন্য যেইরূপ বিধান সৃষ্টি হইয়াছিল, এখনও তাহার উন্নতি ও সুরক্ষার জন্য সেইরূপ ভবিষ্যৎবিধান সৃষ্টি হইতেছে। সভ্যতার আরম্ভিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত যে সময় অতীত হইল, তাহা ভবিষ্যতের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মতন নগণ্য। প্রচলিত সমাজ ও সম্পত্তির ধ্বংস আজকাল একটি সামাজিক শক্তির চরম উদ্দেশ্য হইয়া উঠিতেছে ; তবে কথা এই, এই শক্তির ভিতরও তাহার আপন ধ্বংসের বীজ নিহিত হইয়া আছে। রাজ্যশাসন বিষয়ে প্রজাসত্তা, সমাজে ভ্রাতৃভাব, অধিকার ও লাভের সমানতা, এবং সর্বোপরি অনিবার্য সার্বজনিক শিক্ষা সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নত স্তরেরই সূচনা। মানুষের জ্ঞান, অনুভব ও প্রতিভা তাহাদিগকে এই ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে....ভবিষ্যৎ সমাজের প্রাচীন জনসমাজের স্বতন্ত্রতা, সমানতা ও ভ্রাতৃভাবের এক উন্নততর পুনরুজ্জীবন দেখা যাইবে।"

এখানে স্মরণ রাখা দরকার, মোর্গন শুধুমাত্র উগ্রপন্থী রাজনীতিজ্ঞই ছিলেন ; তিনি সমাজতন্ত্রবাদের কোনরূপ ধার ধারিতেন না ; পূর্বে তাঁহার যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা আমেরিকার ইণ্ডিয়ন জাতির জন ও অন্যান্য প্রাচীন সামাজিক অবস্থার অধ্যয়নের ফল। ভারতবর্ষে বেরিয়র এলবিন মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি গোণ্ড জাতির সম্পর্কে আসিয়া তাহাদের জীবনরীতি সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন। এই এলবিনও সমাজতন্ত্রবাদী নন ; এমন কি স্টেট্‌সম্যানের* মতে 'ইহার গবেষণার সহিত আদিম জাতিদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের কোন সম্পর্ক নাই।' এলবিন একটি বেতারভাষণে[1] বলিয়াছিলেন ঃ "এখানকার আদিবাসীরা প্রায় সর্বদাই খুনের অপরাধ স্বীকার করিয়া খুন করিবার কারণ কি তাহা বলিয়া দেয়। তাহাদের মধ্য ব্যক্তিবাদের অস্তিত্ব নাই—ইহারা সর্বপ্রথম সমাজ, গোষ্ঠী এবং আপন আপন গ্রামের ইষ্ট চিন্তা করে। নিজেদের প্রতিবেশীর সঙ্গে একত্র হইয়া, একস্থানে ঘরদরজা বানাইয়া ইহারা বসতি করে ; প্রত্যেক বাড়ীর জন্য ইহাদের কোন পৃথক পৃথক উঠানের ব্যবস্থা নাই। সাম্প্রদায়িকতা যে কি বস্তু তাহা ইহারা মোটেই জানে না ; এমন কি, তাহাদের ভাষায় সমাজ বুঝাইতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহা মানুষের সঙ্গে অভিন্নার্থক। ইহাদের সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বিচিত্র ও শোকাবহ কথা এই যে, শিক্ষিত জাতির সংস্পর্শে আসিলেই তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিবাদ জাগিয়া উঠে ; ইহার ফলে তাহাদের গ্রামিক ব্যবস্থা

[1] দিল্লী সংস্করণ, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ ; † স্টেট্‌সম্যান, দিল্লী সংস্করণ, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪১।

বদলাইয়া যায়—বহু অংশে বিভক্ত হইয়া সামাজিক ভদ্রাসন তখন ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে....আর ইহারা নিজে শিক্ষিত হইলে তখন ঘোরতর মোকদ্দমাবাজ এবং সাম্প্রদায়িক হইয়া উঠে—ইহাতে তাহাদের পুরাতন পারস্পরিক মৈত্রী একেবারে সমূলে নষ্ট হইয়া যায়।"

সভ্যতা মানুষকে ধনে, জ্ঞানে ও শক্তিতে সত্যই সমৃদ্ধ করিয়াছে; কিন্তু একমাত্র স্বার্থ অর্থাৎ হীন ব্যৈক্তিক স্বার্থই ইহার নিচেকার ভিত্তি, শুধু এই ভিত্তির উপরই সভ্যতার বিশাল সৌধের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—তাই ইহা মানবগুরুকে মানবোচিত গুণ হইতে বঞ্চিত করিলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

(ক) দাসতা যুগ

পিতৃসত্তা যুগে যুদ্ধবন্দীদিগকে হত্যা না করিয়া তাহাদিগকে দাস করার প্রথা প্রচলিত হয়—ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে আরও বলিয়াছি যে, সেই যুগে কৃষি, গৃহশিল্প ও ধাতুশিল্পের প্রসার ঘটায় সমাজে শ্রম-সমর্থ ব্যক্তির প্রয়োজন বাড়িয়াছিল। তখন সমাজে সম্পত্তি উৎপাদনের উপযোগী বহু বিচিত্র সাধনই বর্তমান ছিল; তাই এই সাধনাকে সৃষ্টিকারী করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনশ্রমেরও চাহিদা বাড়িয়া যায়। সমাজে এইভাবে শ্রমের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইবার ফলেই তখন দাসপ্রথার সৃষ্টি হয় এবং ইহাতে কিছুদিনের মধ্যে সামাজিক উৎপাদনপদ্ধতির সহস্রমুখী বিকাশ ঘটে।[১]

"দাসতাই সর্বপ্রথম কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে শ্রমবিভাগের সৃষ্টি করে এবং ইহারই আশ্রয়ে য়ুনান প্রভৃতি[২] পুরাতন জগতের সমৃদ্ধি সম্ভব হয়। দাসতা ছাড়া য়ুনানের সাম্রাজ্যস্থাপন সম্ভব হইত না, কিংবা ইহা ব্যতীত রোমান রাজ্যেরও সৃষ্টি হইত না;[৩] আর রোমান বা য়ুনান রাজ্য ছাড়া আধারশূন্য ভাবে বর্তমান য়ুরোপেও জন্মলাভ করিত না.... এখানে ভুলিলে চলিবে না, আমাদের আর্থিক, রাজনীতিক বা বুদ্ধিগত বিকাশের মূলে দাসতার সাহায্য আবশ্যক এবং সর্বস্বীকৃত ছিল। এই অর্থে ইহাও বলা চলিবে যে, দাসতা ব্যতীত বর্তমান অর্থাৎ এইরূপ আধুনিক সমাজবাদও[৪] সম্ভব হইত না........

"ইহা সত্য যে, তখন শত্রুকে নাশ না করিয়া দাস করা সমাজের আর্থিক,

---

১। আদিম সাম্যবাদী সমাজ হইতে অগ্রবর্তী জাতির মধ্যে তখন শুধু দাসদের শ্রমেই বস্তুর সৃষ্টি অর্থাৎ উৎপাদন চলিতে থাকে; এবং পরে এই প্রথাই আবার চলিত সমাজব্যবস্থায় আরম্ভ হইয়া তাহার বিনাশের সহায়ক হয়। ২। ভারত, রোম, গ্রীস ইত্যাদি; ৩। ভারতের চক্রবর্তীরাজ্য কিংবা ইরাণের শাহনশাহীও সৃষ্টি হইত না; ৪। Socialism.

রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের সহায়ক হইয়াছে। সেই সময়ের সমাজ[১] দুইটি পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; এই দুই স্বার্থের প্রতিযোগিতার সঙ্গে দাসতার দ্বারা বস্তুর অধিক উৎপাদনে সমাজের প্রগতি সম্ভব হয়। পূর্বে নাক কান কাটিয়া, কলিজা বাহির করিয়া কিংবা অন্যান্য ক্রূর যাতনা দিয়া যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা হইত। কিন্তু তাহার তুলনায় দাস হইয়া বাঁচিয়া থাকাও এই সব হতভাগ্যের পক্ষে অনেকটা ভাল হইয়াছিল।[২]

দাসতা ছাড়া আমেরিকার কার্পাস সুলভ হইত না,—আর কার্পাস না হইলে আধুনিক শিল্পোদ্যোগও সম্ভব হইত না। দাসতার ফলে পরাজিত দেশ অর্থাৎ উপনিবেশের মূল্য বাড়িয়াছে; এবং এই উপনিবেশের জন্যই পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে....এইজন্যই দাসতা তখন সমাজের পক্ষে একটি মূল্যবান আর্থিক অস্ত্র ছিল। দাসতা ব্যতীত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল দেশে উত্তর আমেরিকা এখনও পিতৃসত্তা যুগে পড়িয়া থাকিত; এমন কি, দাসতা রহিত করিতে পারিলে, আমেরিকা হয়ত পৃথিবীর জাতির তালিকা হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত।"

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কস্ উপরের কথাগুলি লিখিয়াছেন,—তখনকার সামাজিক অবস্থায় তাঁহার এই উক্তি অভ্রান্ত ছিল।

১। পরিবার ও বিবাহ

যৌনব্যাপারে প্রথমত পুরুষের মত স্ত্রীজাতিরও স্বাচ্ছন্দতা ছিল; কিন্তু পিতৃসত্তার যুগে স্ত্রীজাতির পূর্বের যৌবনস্বাচ্ছন্দ্য রহিত হইয়া যায়। তখন স্ত্রীপুত্রের দায়ভাগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একবিবাহ প্রচলিত হয়;—তবে এই একবিবাহ সমাজে বিশেষ করিয়া স্ত্রীজাতির উপর প্রযুজ্য হইতে থাকে। দাসতাযুগে প্রবিষ্ট হইবার পর বহু জাতির মধ্যেই একবিবাহের প্রাধান্য দেখা যায়; য়ুরোপীয় জাতিদের মধ্যে তখন হইতে এই প্রথা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। তবে এই নিয়ম পুরুষের বেশ্যা বা রক্ষিতা সংসর্গের বাধক ছিল না। দাসতাযুগে দাসীরা প্রভুর সম্পত্তিস্বরূপ ছিল—এজন্য সামাজিকভাবে বিবাহ না করিয়াও তাহাদিগকে ভোগ করা চলিত। এশিয়াতে একবিবাহ কখনও কঠিন সামাজিক নিয়ম হয় নাই; এখানকার ইতিহাসে প্রথম হইতেই[৩]

১। উপনিষদ্ এবং বুদ্ধকালীন ভারত অতুলনীয়। ২। আর্যভট্ট গণিতের অনুশীলনে একস্থানে লিখিয়াছেন: একটি ১৬ বৎসরের দাসীর দাম ৩২ নিষ্ক হইলে, ৩০ বৎসর বয়স্কা একটি দাসীর মূল্য কত হইবে? ৩। অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ হইতেই।

বহুপত্নিতার চলন দেখা যায়; ইহাদেরা† প্রাচীন গ্রন্থে বা উপাখ্যানে বহু-পত্নিতাকে কখনও নিন্দা করা হয় নাই। ইসলামীয়রা জনবৃদ্ধির জন্য সর্বদা একসঙ্গে চারিটি বিবাহ করিত;—দাসীসংসর্গ রহিত করিবার জন্য তাহাদেরও কোন সামাজিক নিয়ম ছিল না; এমন কি, পুরুষের জন্য ইহাতে সমাজের অনুমোদনই ছিল। হিন্দু জাতির মধ্যে বিবাহিত স্ত্রীর সংখ্যানিয়ন্ত্রণের কোন চেষ্টা হয় নাই—বরঞ্চ কৃষ্ণ, দশরথ প্রমুখ আদর্শ পুরুষের দৃষ্টান্তে* ইহা ধর্মানু-মোদিত হইয়া গিয়াছিল। হিন্দুদের আদর্শ রাজার মধ্যে অবশ্য রামের কথাও উল্লেখ করিতে হয়: রামচন্দ্রের জীবনে একপত্নিতার আদর্শ যথেষ্ট মর্যাদা পাইয়াছে সত্য; কিন্তু বল্মীকির রামায়ণ শুঙ্গকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত হইয়াছিল,—এবং তখন য়ুনানী শাসকেরা ভারতের পশ্চিমভাগে বাস করিতেছে। এই অবস্থায় রামায়ণের একপত্নিকতায় য়ুনানী প্রভাবও কতটুকু আছে কে বলিবে?

বহুপত্নিতার বিষয়টিকে তখন সকল পুরুষই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিত এইরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। প্রকৃতপক্ষে বিবাহের মূল প্রেরণা হইতেছে সম্পত্তি,—এবং সম্পত্তিশালী শোষকেরা ছাড়া বহুবিবাহের বিলাসিতা অন্যের পক্ষে তেমন সম্ভব ছিল না। পিতৃসত্তা যুগে পদার্পণ করিয়াই পুরুষ সমাজের প্রধান হয়; এবং সম্পত্তির উৎপাদক হওয়ায় তাহার প্রভাব প্রতিষ্ঠা আরও বাড়িয়া যায়। পুরুষের অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে স্ত্রী-জাতির অধিকারের আনুপাতিক হ্রাস হয়; এবং এইভাবে স্ত্রী ক্রমে পুরুষের অস্থাবর-সম্পত্তিতে পরিণত হইয়া যায়। স্ত্রীর প্রতি যে সোহাগ বা প্রেম দেখানো হয়, তাহাও ইহাদিগকে কোন মানুষিক মর্যাদা দিবার জন্য নয়। স্ত্রী পুরুষের ভোগবস্তু, এবং আদর, সোহাগ বা প্রেম এই ভোগেরই আঙ্গিক। উপনিষদকারও বলিতেছেন: ভার্যার কামনার জন্যই ভার্যা প্রিয় নয়, প্রকৃতপক্ষে আত্মকামনার জন্যই ভার্যা প্রিয়।§ পুরুষের প্রধানতার জন্য পরিবারে পুত্রের মান বাড়ে, এবং কন্যা আবার সেই অনুপাতেই অনাদৃতা হয়। পিতৃসত্তা যুগ হইতে আগাইয়া আসিয়াও সমাজে এই ভাবের ন্যূনতা হয় নাই। তাই পুত্রের জন্মের সঙ্গে পরিবারে গীতবাদ্যের সমারোহ পড়িয়া যায়; কিন্তু কন্যা আসিলে গীতবাদ্য ত দূরের কথা, সমগ্র পরিবার খ্রিয় ও বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে;—এমন কি, মাতা অর্থাৎ স্বয়ং প্রসূতিও এই ভাব হইতে ত্রাণ পায় না। দাসতা ও সামন্তবাদের যুগে কন্যাজন্মের ফলে পিতার কি মনোভাব হইত, তাহা বুদ্ধের সমকালীন†† রাজা প্রসেনজিতের কন্যাজন্ম উপাখ্যান হইতে বুঝিতে পারা যায়:

† হিন্দু, ইরাণী, চীনী ইত্যাদি;

* ষোড়শ সহস্র পত্নী[illegible])। § 'ন বৈ ভার্যায়াঃ কামায় ভার্যা প্রিয় ভবতি, আত্মনস্তু কামায় ভার্যা প্রিয়া ভবতি; †† খ্রীঃ পূঃ ৫৬৩-৪৮৩।

প্রসেনজিত কোশল বুদ্ধসমীপে উপবিষ্ট আছেন…এমন সময় এক পুরুষ আসিয়া তাঁহার কর্ণে নিবেদন করিল, 'দেব, মল্লিকা দেবীর কন্যা জাত হইয়াছে।' এই বাক্যে কোশলপতি ক্ষুণ্ণ হইলেন….অনন্তর বুদ্ধ খেদ নিবারণের চেষ্টা করিয়া বলিলেন,….'রাজন্, কখনও কখনও স্ত্রীও পুরুষ অপেক্ষা শীলবতী, মেধাবিনী, শ্রেয়সী….এবং শ্বশুরকুলের মানধাত্রী ও পতিব্রতা হয়'…কিন্তু কোশলপতি পূর্ববৎ ক্ষুণ্ণই রহিলেন।*

বুদ্ধের যুগ পার হইয়া অনেক দূরে আসিয়াও ভারতীয় সমাজে এই ব্যাধির প্রকোপ কমে নাই। রাজপুত সমাজে নবজাতা কন্যাকে নুন খাওয়াইয়া কিংবা নাকমুখের উপর ফুল বা নাড়ী রাখিয়া তাহাকে হত্যা করা হইত। এখনও বহু জাতির মধ্যে কন্যাবধের প্রথা একেবারে রহিত হইয়া যায় নাই। পিতৃসত্তাক যুগে পরিবারে পুরুষের শাসন প্রচলিত ছিল; এবং পরিবার বৃহৎ হইলে সেখানে শাসনভার কুলজ্যেষ্ঠের উপর অর্পিত হইত। সংযুক্ত পরিবার চালনার জন্য তখন জ্যেষ্ঠকে পরিবারের প্রত্যেকের উপর সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইতে হইত। ভারতীয় যুক্ত পরিবারগুলিতে এখনও এইরূপ সমদৃষ্টির অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু পুঁজিবাদের আঘাতে ভারতবর্ষের যুক্তপরিবারেও ক্রমে দৃষ্টিসাম্যের অভাব ঘটিতেছে। তার উপর শিক্ষাপ্রাপ্তেরা ব্যৈক্তিক স্বার্থ সম্বন্ধে বেশি সচেতন হওয়ায় যুক্তপরিবারে ধীরে ধীরে ভাঙ্গনও ধরিতেছে।

(প্রাচীন ভারতের বিবাহ)

বিবাহাদি যৌনসম্বন্ধ বিষয়ক রীতিনীতিকে অনেক ভারতীয় শিক্ষিত ব্যক্তিও চিরকালীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণ হইল তাহাদের ধারণা যে কত অমূলক তাহা সহজেই বোঝা যায়। মহাভারতে কথিত আছে, সত্যযুগে ধর্ম চতুরঙ্গে** পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু ত্রেতায় তাহা শুধু যজ্ঞকর্মে পর্যবসিত হয়, দ্বাপরে যজ্ঞ রহিত হইয়া তপ ও দানের মাহাত্ম্য বাড়ে, এবং কলিতে শুধু ভক্তিই একক ও অদ্বিতীয় হয়। বিবাহাদি ব্যাপারেও ধর্মের মত এইরূপ যুগোপযুক্ত পরিবর্তন হইয়াছে,—প্রাচীন গ্রন্থাদি অন্বেষণ করিলে ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে কোন অসুবিধা হয় না।

(ক) **মৈথুন স্বাতন্ত্র্য**—এক সময় মৈথুন মানুষের নিকট আহার, নিদ্রা ও অন্যান্য শরীর-ধর্মের সমান বলিয়া বিবেচিত হইত। এখনও বহু জনযুগীন জাতির মধ্যে মৈথুন বিষয়ে পূর্ণ নিঃসঙ্কোচতা বর্তমান আছে। কালিফোর্ণিয়ার

---

* সংযুক্ত নিকায় ৩।২।৬ (মল্লিকাসুত্ত, মৎকৃত 'বুদ্ধচর্যা'—পৃঃ ৩৯৩ দ্রষ্টব্য)। ** জপ, তপ, দান, ভক্তি।

ইণ্ডিয়নদের[১] মধ্যে গত শতাব্দীতেও এইরূপ অবস্থার অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে। আমেরিকার চিপ্পয়েরা[২] এই বিষয়ে ভ্রাতা-ভগিনী বা মাতাপুত্রেরও কোন বিচার করিত না। কাদিঅক[৩], যজীদী[৪], কারিব[৫] প্রভৃতি আধুনিক জাতির মধ্যেও এইরূপ যৌনস্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যমান ছিল। পুরাতন আইরিশ ও পারসীক সমাজেও[৬] ইহাদের মত নির্বাধ যৌন সম্পর্কের প্রচলন দেখা যাইত। অনেক দেশে কমীনদের* নববধূকে প্রথম সামন্তের ভোগের জন্য অর্পণ করিবার রীতি ছিল—এই প্রথা অঞ্চল বিশেষে আজও বর্তমান আছে দেখা যায়। ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি দলিল হইতে ফরাসী কাউণ্টরাও নিজ জমিদারীতে ইহা চালাইতা জানা যায়। মধ্যযুগীয় য়ুরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও সামন্তরা প্রজাপত্নীর কৌমার্য্য মোচন করিয়া দিত। সামন্তশ্রেণীভুক্ত ছিলেন বলিয়া খ্রীষ্টীয় মঠের যাজকেরাও তখন ইহার সুযোগ লইতে ছাড়িত না।

যৌন বিষয়ের এই সব নির্বাধ স্বাচ্ছন্দ্যতায় আমাদের আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস-পুরাণ অনুসন্ধান করিলেও এই রকম উদাহরণের অভাব ঘটিবে না। তবে, এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়ত এখন অনুচিত হইবে; কারণ, পরবর্তী যুগের হিন্দুরা এই সব তথ্য উদ্ঘাটন করা ক্রমেই অপছন্দ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মহাভারতের মধ্যস্থতায় পরাশরের সত্যবতী

১ "The indigenous Indians of California, couple after the manner of inferior mammals, without the least formality, and according to the caprice of the moment." *Evolution of Marriage* Letourneau, (3rd edition. pp. 43).

২ "The Chippeways frequently co-habit with their mothers and oftener still with their sisters and daughters"...Ibid, pp. 65.

৩ "Kadiaks unite indiscriminately brothers with sisters and parents with children". Ibid. pp. 65.

৪ "Yazidies a sect of Arabs unite in the darkness without heed as to adultry or incest···" Ibid, pp. 44.

৫ "The Caribs married at the same time a mother and daughter. The ancient Irish married, without distinction, their mother and sisters". Ibid. pp. 66.

ইরাণীদের মাতৃবিবাহের প্রসিদ্ধি ভারতবর্ষের সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থকারেরও জ্ঞাত ছিল: 'মাতৃবিবাহো হি তদ্দেশজন্মনঃ পিণ্ডখর্জুরস্য দেশান্তরেষু মাতৃ বিবাহাভাবেহভাববৎ' (বাদন্যায়, পৃঃ ১৬; ধর্মকীর্তি, ৬০০ খ্রীঃ); 'মাতৃবিবাহ... পারসীকদেশ...' পৃঃ ১৫; শান্তরক্ষিত,৭৪০-৮৪০ খ্রীঃ (বাদন্যায় টীকা)।

৬ "Justin and Tertullien tell that Parthians and Persians married their own mothers. In ancient Persia religion sanctified the unions of a son with his mother". Ibid, pp. 44.

*Serf; † In a French title deed of 1507 we read that Count d' Eu has the right of prelibation in the said place when anyone marries." Ibid.

সমাগমের* কথা অবশ্য আজ সর্ববিদিত; তবে কথা এই, মহাভারতকার সত্যবতীর লজ্জা ঢাকিবার জন্য মুনির দিব্যশক্তির সাহায্যে নদীতে কুয়াশার সৃষ্টি করিয়াছিলেন;—কিন্তু ঋগ্বেদের সূক্তকার উত্তথ্যপুত্র দীর্ঘতমা[১] মানুষের সম্মুখেই[২] স্ত্রীসমাগম সম্পন্ন করেন। সেই যুগে ঋতুকালীন বিরামের পর স্ত্রী যে-কোন্ পুরুষের সংসর্গ যাচ্ঞা করিতে পারিত; শর্মিষ্ঠাও ঠিক এইভাবেই যযাতির নিকট রতিভিক্ষা[৩] করিয়াছিল। মহাভারতে উক্ত আছে, পুরুষ এই ক্ষেত্রে কামার্তাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তাহাকে গর্ভপাতের পাতকী[৪] হইতে হয়। ইহা হইতে পারে, প্রাচীন যুগে জনসংখ্যা বর্ধনের জন্য এইরূপ বিধানের প্রয়োজন হইয়াছিল। উলূপী অর্জুনের সহবাস প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিল[৫]: 'স্ত্রীজাতির অনুরোধে এক রাত্রি সঙ্গত হওয়া যায়, ইহাতে কিছুমাত্র অধর্ম হয় না।' মাতা বা গুরুভার্যা গমনকে পরবর্তী কালে মহাপাপ বলিয়া বিহিত করা হইয়াছিল; কিন্তু উতঙ্ক[৬] গুরুস্ত্রীর ঋতুশান্তির জন্য তাহার সহগমন করায় তাহার কোন পাপ হয় নাই। চন্দ্রমা আপন গুরু বৃহস্পতির ভার্যার সহিত যৌনক্রিয়া সম্পন্ন করে; ইহাতে বুধের জন্ম হইলে তাহার পিতৃত্ব লইয়া গুরুশিষ্যে কলহ বাধে, এবং পরে স্বয়ং তাহার মধ্যস্থতায় ইহার নিষ্পত্তি হয়। গৌতমপত্নী অহল্যার ইন্দ্র-অপবাদও এইরূপ প্রসিদ্ধ ব্যাপার; কিন্তু এই অপরাধে গৌতম পত্নীকে চিরকালের জন্য ত্যাজ্যা মনে করেন নাই।

(খ) **বিবাহ প্রথা সনাতন নয়**—আজকাল বিবাহ ব্যাপার এক পবিত্র ধার্মিক আচারে পরিণত হইয়াছে; ইহা শুধু ভারতে নহে, বহির্ভারতেও বিবাহ ধর্মকৃত্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাতন গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে এই প্রথা যে চিরাচরিত নয় তাহা বোঝা যায়। পরে আমরা পপ্ন শিখ গন্ধর্বের সঙ্গে দেবকন্যাদের অস্থায়ী বিবাহের কথা আলোচনা করিয়াছি। পুরাণে দেবকন্যা ও অপ্সরাদের অস্থায়ী বিবাহের বহু উপাখ্যান বর্ণিত আছে। মহাভারত পাঠে জানা যায়[৭] উত্তর-কুরুতে বিবাহ প্রথার তখন কোন অস্তিত্বই ছিল না। পরবর্তী যুগের গ্রন্থে উত্তর-কুরু বলিতে একটি কাল্পনিক দেশের মত বুঝাইয়াছে; কিন্তু উত্তর-কুরুর সম্বন্ধে এত প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান এবং উত্তর কুরু নামে ভারতবর্ষে একটি প্রদেশ থাকাতে মনে হয়, আর্যেরা ভারতে আসিবার

* মহাভারত, আদিপর্ব (৬৩)। ১। ইনি ঋগ্বেদের বহু সূক্তের কর্তা, পরে তিনি গৌতম নামে প্রসিদ্ধ হন, তাঁহার বংশধর গৌতমগোত্রীয় নামে খ্যাত; ২। মহাভারত, আদিপর্ব (১০); ৩। ঐ, আদিপর্ব(৮২); ৪। ঐ, আদিপর্ব (৮৩); ৫। ঐ আদিপর্ব (২১৪); ৬। ঐ, আদিপর্ব (৩); ৭। ঐ, আদর্শ পর্ব ((১১২)।

পূর্বে তাহাদের কোন বসতির নাম উত্তর-কুরু ছিল। সম্ভবত সপ্তসিন্ধুর দেশ পামীরে অবস্থানকালে জনসমাজগত আর্যেরা ঐ অঞ্চলের নামই উত্তর-কুরু দিয়াছিল। এই উত্তর-কুরুর স্ত্রীরা মহাভারতকারের মতে স্বচ্ছন্দ ছিল, অর্থাৎ তাহারা কোনরূপ বিবাহবন্ধন[১] স্বীকার করিত না। মহাভারত হইতে অবশ্য বিবাহবন্ধন প্রথমত একেবারে ছিল না বলিয়াই বোঝা যায়; তখন এক ব্যক্তির স্ত্রীকে অপর ব্যক্তি সংসর্গের জন্য লইয়া যাইতে পারিত। উদ্দালক ঋষির স্ত্রীকে তাহার পতির সমক্ষেই অন্য ঋষি যৌনক্রিয়ার জন্য লইয়া যাইতেছিলেন;—এই সময় তাহার পুত্র শ্বেতকেতু ইহার বিরোধিতা করিলে উদ্দালক ইহাকে ধর্ম বলিয়া বিবৃত করেন। কিন্তু শ্বেতকেতু[২] ইহাতে আহত হইয়া এই প্রথা রহিত করিতে কৃতসংকল্প হন; এবং পরে ঋষি হইয়া তিনি অস্থায়ী বিবাহের স্থলে স্থায়ী বিবাহের প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্দালক ও শ্বেতকেতু উভয়েই উপনিষদের ঋষি; এই হিসাবে তাহাদের সময় খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ছয় সাত শতাব্দী[৩] পূর্বে হইবে। তাই, মহাভারতের প্রমাণ হইতেই, অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে বিবাহবন্ধন যে শিথিল ছিল, তাহা বুঝিতে পারি।

(গ) **বিবাহবন্ধন শিথিল**—মহাভারতের যুগে আসিয়াও ভারতবর্ষের বিবাহবন্ধন যে তেমন দৃঢ় হইয়াছিল তাহা মনে হয় না; কারণ, দেখা যাইতেছে যে, নারী অন্যপূর্বা হইলে তখনকার সমাজের বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না। কুন্তী কুমারী অবস্থায় কর্ণের জননী হইয়াছিলেন; কুমারী গঙ্গার গর্ভে শান্তনু-সুত ভীষ্মের জন্ম হয়; এইরূপ পরাশর ও কুমারী সত্যবতীর সঙ্গমের ফলে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন, এবং ইহার পর সত্যবতী[৪] পুনরায় শান্তনুর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। কুন্তীর সপত্নী মাদ্রী মদ্রদেশীয়া[৫] ছিলেন, এবং সেইখানেই তাঁহার জন্ম হয়; কর্ণ এই মদ্রীয়দের নির্বাধ যৌন আচরণের নিন্দা করিয়াছেন। গন্ধারপতি শল্য তাঁহাকে উপহাস করিলে তিনি মদ্র ও গন্ধারে স্ত্রৈণ আচার-নীতির[৬] উল্লেখ করেন। কর্ণের শ্লেষোক্তিতে মনে হয়, মদ্র-গন্ধারে[৭] মাতা পুত্র, পিতা পুত্রী, বধূ শ্বশুর, মাতুল ভাগিনেয়ী, কিংবা জামাতা শাশুড়ী, এমন কি দাস-দাসী বা অতিথি অপরিচিত প্রভৃতির সঙ্গেও যৌন আচারে বাধা ছিল না। কর্ণের উক্তিতে জানা যায়, সেখানকার স্ত্রীরা নিজে আগ্রহী হইয়া পুরুষকে সহবাসে লিপ্ত করিতে; অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে তাহারা কামগীতি গাহিত, সুরাপান

১। ঐ অনুশাসন পর্ব (১০২); ২। উদ্দালকের পুত্র; ৩। মৎকৃত 'দর্শন দিগ্দর্শন' দ্রষ্টব্য; ৪। ঐ আদিপর্ব (৬৩), বনপর্ব (৩০৬); ৫। বর্তমান শেয়ালকোটের আশপাশের জিলা; ৬। ঐ, অনুশাসন পর্ব (১০২); ৭। গঙ্গাউপত্যকা হইতে মদ্রগন্ধারের রীতিরেওয়াজ পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছিল।

করিত এবং নির্লজ্জার মত নৃত্য করিত ; সেখানে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল না, নারীরা অনাচারী ছিল—এইজন্য নিজের ইচ্ছামত তাহারা নাযক নির্বাচন করিত।

এক স্ত্রীর বহু পতির নিদর্শন আমরা প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চকন্যার[১] অন্যতমা দ্রৌপদীতেও দেখিতেছি। তারপর আপন কন্যা, আপন ভগিনী এবং নাতিনীর সহিতও বহু বিবাহের নিদর্শন পুরাণগ্রন্থাদিতে মিলিযা যাইতেছে। ইক্ষ্বাকুর নির্বাসিত কুমারেরা তাহাদের ভগিনীদিগকে বিবাহ করিযা[২] শাক্যবংশের প্রতিষ্ঠা করে ;—শ্যাম দেশের রাজবংশের ভ্রাতাভগিনীর বিবাহের প্রথা আধুনিককালেও বর্তমান আছে। দশরথ জাতকের[৩] লেখন অনুসারে সীতাদেবী রামচন্দ্রের ভার্যা এবং ভগিনী দুইই ছিলেন। ব্রহ্মার নিজ পুত্র সরস্বতীর প্রতি তাহার কামাসক্তির কথাও পুরাণ-প্রসিদ্ধ ব্যাপার, ইহা ছাড়া ব্রহ্মা তাঁহার পুত্র দক্ষের কন্যাকে বিবাহ করিযাছিলেন বলিযা জানা যায। এই সঙ্গে বিনা বিবাহে স্ত্রীপুরুষের অস্থাযী যৌন সম্বন্ধের কথাও মহাভারতে প্রচুর আছে : হিডিম্বা ও ভীমের সম্পর্কও সম্পূর্ণ অস্থাযী ছিল,—কিন্তু তাহাতে ঘটোৎকচের জন্ম হয[৪] ; এইরূপ ভরদ্বাজ ও ঘৃতাচীর সঙ্গমের ফলে দ্রোণ, জানপদী ও গৌতমের সঙ্গমে কৃত, ব্যাস ও ঘৃতাচীর সহবাসে শুক, বিশ্বামিত্র ও মেনকার প্রণযে শকুন্তলা এবং উর্বশী ও পুরুরবার মিলনে তাহাদের সাত পুত্রের জন্ম হয। রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার সহিত অর্জুনের মিলনকালও তিন বৎসরের অধিক ছিল না ; কিন্তু ইহার ফলেই বভ্রুবাহন জন্মলাভ করে।

এই সব নিদর্শন ছাড়া পাণ্ডব কালে নিয়োগ এবং দেবর প্রথারও বহু নিদর্শন আছে। এই প্রথা অনুসারে মৃত বা জীবিত পতির পুত্রকামনায স্ত্রী অন্য পুরুষের বীর্যনিষেকে গর্ভবতী হইতে পারিত। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এইরূপেই ব্যাসের ঔরসজাত নিয়োগ পুত্র ছিল ; বলি রাজার সন্তান না থাকায তিনিও গৌতম দ্বারা আপন পত্নী সুদেষ্ণার নিযোগ করাইযাছিলেন—তাহাতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং সুহ্ম নামে[৫] তিনি চারিটি পুত্রলাভ করেন। শারদণ্ডাযন রাজা পথিক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া তাহা দ্বারা নিজ পত্নীর গর্ভোৎপাদন করাইযাছিলেন। সৌদাস রাজাও প্রথমে এইরূপ নিঃসন্তান ছিলেন ; তিনি স্ত্রী মদয়ন্তীকে বশিষ্ঠ দ্বারা নিযোগ করাইয়া পুত্রলাভ করেন। দেবর প্রথাও প্রায নিযোগেরই অনুরূপ, কারণ ইহাতে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত সংসর্গের অনুমোদন আছে। 'দেবর' বহু প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ ; রুষ ভাষায ইহার অনুরূপ 'দেবৃ' ; দেবর ও দেবৃ এই উভয শব্দেই পতির

১। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী,—লক্ষ্যণীয়যে, ইহাদের প্রত্যেকেই একাধিকভর্তৃকা ; ২। মৎকৃত 'বুদ্ধচর্যা' দ্রষ্টব্য ; ৩। জাতক দ্রষ্টব্য : ৪। আদিপর্ব (১৫৫) ; ৫। আদপর্ব (২১৫)।

অনুজ ভ্রাতাকে বুঝাইয়া থাকে। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে লিখিয়াছেন: 'দেবর কেন? কারণ সে দ্বি—অর্থাৎ দ্বিতীয় 'বর'[১]—ইহার অর্থ হইতেছে পতির অনুপস্থিতিতে ভ্রাতৃবধূর উপর দেবরের অধিকার বর্তায়। বাল্মীকি রামায়ণে মারীচ বধের সময় লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সাহায্যার্থে বাহির না হইলে সীতা বলিয়াছিলেন: 'রামের মৃত্যুর পর তুমি আমাকে চাও, এই জন্যই রামের আর্তনাদ শুনিয়াও তুমি যাইতেছ না।' রামায়ণে পতির জীবৎকালেই বালীর স্ত্রী তারা সুগ্রীবের এবং মন্দোদরী বিভীষণের পত্নিত্ব স্বীকার করিয়াছে।

পত্নীদান—য়ুনানী ইতিহাসে বন্ধুর তৃপ্তির জন্য আপন স্ত্রী অর্পণ করার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। সক্রেতিস অল্কিবিয়াদিস্‌কে নিজ পত্নী জন্তিপের সহিত সহবাস করিতে দিয়াছিলেন। এই রকম দৃষ্টান্ত অবশ্য সেই দেশে আরও প্রচুরই আছে—ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থেও দানধর্মের খাতিরে স্ত্রী অর্পণের বর্ণনা পাওয়া যায়। যুবনাশ্ব তাঁহার প্রিয় পত্নীকে দান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন;[২] মিত্রসহ আপন পত্নী মদয়ন্তীকে বশিষ্ঠের উপভোগ দিয়া[৩] এইরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হন। সুদর্শন অতিথি সেবায় নিজ পত্নী অর্পণ করিয়া[৪] অমর কীর্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে ভারতবর্ষেও অন্যান্য দেশ ও জাতির মত স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কে স্বচ্ছন্দতা ছিল তাহা প্রমাণ হয়।

২। অস্ত্র ও হাতিয়ার

মিশরের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পিরামিড নির্মাণের সময়ে[৫] মিশরীয়েরা নিশ্চয়ই তাম্রের ব্যবহারও জানিত[৬] এইজন্য খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের সময় অন্তত একটি জাতি তাম্রযুগে প্রবেশ করিয়াছিল। তাম্রের আবিষ্কারের কাল অবশ্য আমরা সঠিকভাবে কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না—কিন্তু পিরামিডের দৃষ্টান্তে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে মানুষ যে ইহার ব্যবহার জানিত তাহা বুঝিতে পারি। তাই বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্রই যে তখন তাম্রযুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল ইহা সত্য নহে। আমেরিকার ইঙ্কা, অজেতক, কিংবা মায়া প্রভৃতি সভ্যজাতি ষোড়শ শতাব্দীতেও তাম্র-পিতলের যুগে[৭] বাস করিতেছিল। গত শতাব্দীতেও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীরা ধাতুর কোন

১। 'দেবরঃ কস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বর উচ্যতে।' ২। শান্তিপর্ব (১:৪); ৩। শান্তিপর্ব (১৩৪) ৪। অনুশাসন পর্ব (২); ৫। খ্রীঃ পূঃ চার সহস্রাব্দ, ৬। ৭৩ পৃষ্ঠায় এই অনুমানের কারণ বর্ণিত আছে; ৭। অর্থাৎ তখনও তাহারা লৌহযুগে প্রবিষ্ট হয় নাই।

রকমের ব্যবহারই জানিত না—এমন কি, তাহাদের কুটিরের আশেপাশে সোনার তাল পড়িয়া থাকিলেও তাহা তাহারা স্পর্শ করিত না।

দাসতাযুগে পৃথিবীর কোন স্থানেই পিত্তল বা লৌহের আবিষ্কার হয় নাই—অন্তত মিশর, মেসোপোতামিয়া ও সিন্ধুউপত্যকায় যে তখনও ইহার ব্যবহার ছিল না—এই সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। পিত্তলের আবিষ্কারের, কাল ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের সমসাময়িক হইবে; তাহারও প্রায় তিন শত বৎসর ব্যবধানে অর্থাৎ প্রায় ১২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের সময় লৌহ আবিষ্কৃত হয়। তবে পৃথিবীর সমস্ত জাতি তখন হইতেই পিত্তল বা লৌহের ব্যবহার আয়ত্ত করিয়া লয় নাই। দাসতাযুগে লৌহ পিত্তলের আবিষ্কার না হওয়ায় সেই যুগে অস্ত্রপাতির কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই—প্রাচীন ধাতুদ্রব্যের উপর কারুকার্য এবং পুরাতন তাম্রাস্ত্রকে নূতন প্রণালীতে তীক্ষ্ণ করার কাজ তখন কিছু কিছু অগ্রসর হইয়াছিল।

৩ সম্পত্তি

দাসতা যুগকে আমরা পিতৃসত্তা ও সামন্তবাদী যুগের সন্ধিকাল বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। ইহার মধ্যে প্রথম যুগটির সম্পর্কে বিশেষ কোন ঐতিহাসিক উপকরণ পাওয়া যায় না—শুধু কয়েকটি কাহিনী, তাহাও আবার শুধু য়িহুদি জাতির কাহিনী এবং ইহার সঙ্গে কয়েকটি মাত্র আধুনিক পিতৃসত্তাক জাতির* সাক্ষ্য লইয়াই আমরা এই যুগে পরিচয় পাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সামন্তযুগে অন্ধকার হইতে মধ্যাহ্নালোকে না হইলেও, অন্তত ইতিহাসের অরুণোদয় কালে যে আমরা পৌঁছিতেছি তাহা নিশ্চয়। দাসতাযুগে সম্পত্তির উৎপাদন এবং উৎপাদনের সাধনসমূহের সামাজিক বন্ধনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। পিতৃসত্তাক যুগের মত এই সময়ও সম্পত্তিতে পুরুষের অধিকার এবং উত্তরাধিকার রক্ষিত ছিল। পশুপালন, কৃষি, শিল্প এবং বিনিময় ব্যাপারেও দাসতাযুগ পিতৃসত্তা যুগের অনুকল্প ছাড়া কিছুই নয়—দাসতা যুগেও সম্পত্তি মাত্রেই বৈ্যক্তিক ছিল এবং ব্যক্তির তাহার দান বিক্রয়ের অধিকার ছিল।

৪। শিল্প ও ব্যবসায়

দাসতা যুগে কৃষির উন্নতি হইলেও এই সময়ের শিল্পোন্নতিই অধিকতর উল্লেখযোগ্য। কৃষি অপেক্ষা শিল্পে তখন বৈ্যক্তিক অর্থাগম বেশি হইত,

* যে সব জাতি এখনও আদিম পিতৃসত্তাক স্তরে রহিয়া গিয়াছে।

—এইজন্য দাসদের শ্রম তখন বিশেষভাবে শিল্পক্ষেত্রেই নিয়োজিত হইতে থাকে।

(ক) **হস্তশিল্প**—দাসতা যুগে আসিয়া কৃষি, শিল্প এবং গ্রাম ও নগরের মধ্যে এক নূতন বিভাগ সৃষ্টি হয়। প্রথমত কৃষি ও শিল্পের মধ্যে এই প্রকারের শ্রমবিভাগ বর্তমান ছিল না; তখন মানুষ কৃষিকর্ম করিয়াও আবশ্যকীয় শিল্পদ্রব্য নিজ পরিবারে প্রস্তুত করিয়া লইত। বহু পশ্চাদপদ জাতির মধ্যে এই পদ্ধতি এখনও বাঁচিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিনিময় ও ব্যবসায়ের জন্য উন্নত ধরণের জিনিসের চাহিদা ক্রমে বাড়িতে থাকে;—ইহাতে যে আঙ্গুরের শরাব একদিন ঘরে প্রস্তুত হইত, তাহার জন্যও মদ্যবিশেষজ্ঞের প্রয়োজন পড়ে। দাসতা যুগে পরাজিত শত্রু, ক্রীতদাস কিংবা তাহাদের সঙ্কর পুত্রপৌত্রের দ্বারা বিশেষজ্ঞের** কাজ চলিত; অনেক সময় শিল্পস্বামী স্বয়ং অথবা তাহার আপন লোকজনও, শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া উৎপাদনের সাহায্য করিত। ভারতবর্ষে সামন্তবাদের সময় পরাজিত দাসদের মধ্য হইতেই প্রায় সমস্ত শিল্পী জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। আর্যদের মধ্যে এক সময় সীবন, বয়ন এবং এইরূপ পুরাতন শিল্পকাজের প্রচলন থাকিয়া থাকিতে পারে—কিন্তু সামন্তবাদে পৌঁছিবার পূর্বে তাহারা সকল প্রকার শিল্পকর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিল।

পিতৃসত্তার শেষ অবস্থায় দাসতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, স্বামী ও দাস এই দুই পৃথক বর্গে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহার আনুষঙ্গিকভাবে স্বামী ও দাসের মধ্যে তখন একটি নূতন রকমের শ্রমবিভাগও সৃষ্ট হয়। এই বিভাগ অনুযায়ী দাসদের উপর নিজে শোষিত হইয়া প্রভুর সম্পত্তি বাড়াইবার জন্য পরিশ্রম করার ভার পড়ে; এবং স্বামী কিংবা প্রভুরা দাসদিগকে শুধু শাসন অর্থাৎ প্রকারান্তরে শোষণ করিবার দায়িত্বই বাছিয়া লন। ব্যৈক্তিক সম্পত্তির প্রেরণা থাকায় এই অবস্থায় সমাজের বহুতর আর্থিক উন্নতি হয়, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপতিরও বহু নূতন নূতন বিকাশ ঘটে। শিল্পের বিকাশ হওয়ায় তখন আবার নূতন করিয়া শ্রমবিভাগেরও প্রয়োজন পড়ে; এবং ইহাতেই শেষ পর্যন্ত কৃষি ও শিল্প পৃথক হইয়া যায়। এইবার কিছু লোক শুধু শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ইহাকে তাহাদের ব্যবসায়ে† পরিণত করে। অবশ্য গ্রামে বাস করিবার সময় শিল্পীরা যে তখনও একেবারে ক্ষেতখামার করিত না এমন নয়। তবে এই শ্রমবিভাগের ফলেই ভারতবর্ষে কামার, ধুপী, নাপিত এবং বাড়ুই প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতের সৃষ্টি হয়; এবং ধীরে ধীরে ইহাদের বিবাহাদি সম্পর্ক পর্যন্ত নিজস্ব পেশার গণ্ডিতে সীমিত হইয়া যায়। পূর্বোক্ত বিভাগ দুইটা††

** অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ শিল্পীর; † জাত ব্যবসায়ে; †† দুইটি শ্রমবিভাগ—কৃষি ও শিল্প।

ছাড়া এই সময় আর একটি তৃতীয় রকম শ্রমবিভাগেরও সূচনা হয়; উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে ক্রমে একটি মধ্যম শ্রেণী অর্থাৎ ব্যবসায়িবর্গের উদ্ভব ঘটে—তবে সামন্তবাদী যুগের পূর্ব পর্যন্ত ইহারা ভারতবর্ষে কোন স্বতন্ত্র শ্রেণী বা জাতে পরিণত হয় নাই। দাসতা যুগে সমাজের উৎপন্ন পণ্যের ক্রয়বিক্রয় অবশ্য বাণিয়াদের করায়ত্ত ছিল না; কিন্তু সমাজের বহুবিধ উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় তখন খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল। এইভাবে বিনিময় বাড়িয়া যাওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে তখন স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়।

(খ) **বাণিজ্য**—দাসতাযুগে বাণিজ্য যে কোন বিশেষ বর্গের পেশা হইয়া উঠে নাই ইহা পূর্বেই আমরা বলিয়াছি। এই সময় প্রত্যেক শিল্পীকেই নিজেদের পণ্যবস্তু ফিরি করিয়া বেড়াইতে হইত—কখনও বাজারে বা মেলায় কাঁচামাল বা মুদ্রাকল্প ধাতুর* সঙ্গে তাহার বিনিময়ও চলিত। এই বাণিজ্যের বিনিময়বস্তু অর্থাৎ পণ্য যে তখন শুধু নির্জীব পদার্থই ছিল তাহা নহে—ইহাতে সজীব পশু, এমন কি ইহার সঙ্গে জীবন্ত মানুষও† সামিল ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজে মুদ্রার প্রচলন তখনও ছিল না—তাই মুদ্রার বদলে মানুষ জিনিসপত্রই কর্জ নিত, আর এই কর্জের সুদও মুদ্রার স্থলে বস্তুর দরের উপর তাহার পরিমাণ দিয়া নির্ধারিত হইত। ভারতবর্ষে ছয় মাসের মেয়াদে আসলকে দেড়গুণ করিয়া দিবার চুক্তিতে শস্য কর্জ দিবার প্রথাও†† এইরূপ।

৫। বর্গ ও বর্গসংঘর্ষ

পিতৃসত্তার যুগে পুরাতন বর্গবিহীন সমাজ ভাঙিয়া যায় এবং তাহার স্থলে দাসতা ও শোষণের নূতন বর্গযুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু সামাজিক বর্গ বলিতে আমরা প্রকৃতপক্ষে কি বুঝিব?....উৎপাদন ব্যাপারে অভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তির সমূহই সামাজিক বর্গ....এই বর্গ বা শ্রেণীর ব্যক্তি উৎপাদনে একই প্রকারের কাজ করে....এবং অপর বর্গের ব্যক্তি সমুদয়ের সঙ্গে একই প্রকারের সম্বন্ধ রক্ষা করে....এই সম্বন্ধকে উৎপাদনবস্তু অর্থাৎ শ্রমের উপকরণ হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যায়...। এইভাবে দাসতার সমাজে ধনী নির্ধন, দাস প্রভু কিংবা শাসক শাসিত প্রভৃতি বর্গ পরস্পর হইতে পৃথক; এই সকল বর্গের স্বার্থও আবার তেমনই পৃথক এবং বলিতে পারি ইহারা পরস্পর-বিরোধী। তাই

*তখন ধাতুখণ্ডে মুদ্রার কাজ চলিত: † দাসদাসী প্রভৃতি; †† ভারতের গ্রামাঞ্চলে এখনও ইহা বর্তমান আছে; শস্যের বিনিময়ে পশু কর্জ নিবার প্রথাও দেখা যায়।

পরস্পরের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দাসতার সমাজেও ইহাদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই বর্গ-সংঘর্ষ অবশ্য সকল সময়েই খুব উগ্র হইয়া উঠিতে পারিত না, কারণ ব্যৈক্তিক সম্পত্তির বলে বর্গের মধ্যেও আবার স্বার্থের তারতম্য সৃষ্টি হইয়াছিল; এবং ইহার ফলে এক বর্গের ভিতরও স্বার্থিক একতা সর্বদা সম্ভব হইত না।

দাসতাযুগে প্রভুর নিকট হইতে দাসেরা কোন সহানুভূতি পাইত না—ইহার মূলে আর্থিক স্বার্থ ত ছিলই, তার ওপর দাসেরা একসময়ে শত্রুগোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল। চিরকাল আর্থিক পরাধীনতা ও দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে করিতে দাসেরাও* মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া উঠিত—কিন্তু তাহাদের বর্গশক্তি সংগত না হওয়ায় শাসকদের পক্ষে এই বিদ্রোহ দমন করিয়া গুরুতর দণ্ডবিধান করিতে অসুবিধা হইত না। আর একটি কারণ এই যে, দাসতার যুগে বর্গের সীমাভাগও তত স্পষ্ট ছিল না—একবর্গের মধ্যে তখন বহু রকমের উপবর্গ এবং বহু অসমস্বার্থের অস্তিত্ব ছিল। এইজন্য সেই সময় কোন বর্গের বিপক্ষে নিজেদের সমগ্র শক্তি কেন্দ্রিত করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাই আপন শ্রম দিয়া শোষিত-সমাজবর্গও তখন শুধু শোষক শ্রেণীর সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া দিত—ইহার প্রভাবে অবশ্য সমাজও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইত—কিন্তু এই সমৃদ্ধির স্রষ্টা হইয়াও শোষিতেরা নিজেদের অবস্থার কোন উন্নতি করিতে পারিত না। দাসতা ও সামন্তবাদী যুগের বর্গ-সংঘর্ষের রূপ অবশ্য বলিতে গেলে প্রায় একই রকম—পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সামন্তবাদের বর্ণনাপ্রসঙ্গে উভয়েরই একত্র আলোচনা করিব।

৬। রাজ্যশাসন

এই যুগে রাজ্যশাসনক্ষমতা বা রাজসত্তা দাসের মালিকদের হাতে ছিল—তাই দাসদিগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা রাজ্যশাসনের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া ধার্য হয়। সমাজে তখন দাস ও প্রভু ছাড়া অন্যান্য স্ব-তন্ত্র ব্যক্তিও যথেষ্ট ছিল এবং রাজ্য-শাসন ব্যাপারেও ইহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তখন একেবারে কম ছিল না।

দাসতাযুগ পিতৃসত্তাযুগেরই বিকশিত রূপ; এইজন্য দাসতাযুগের শাসনতন্ত্রও পিতৃসত্তার অনুরূপ। দাসতার সমাজে পিতৃসত্তা কালের মতই ব্যক্তির পরিপূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—তাই শাসনযন্ত্র উচ্চবর্গের হিতার্থে নিয়োজিত হইলেও সমাজের মধ্যমদিগকে** একেবারে উপেক্ষা করা চলিত না। এমন কি, অনেক সামাজিক ও ধার্মিক সভায় স্বয়ং প্রভুবর্গই ইহাদিগকে সম্মানিত করিতেন। ইহাতে মধ্যমদের অভিমান খুব প্রবলভাবে চরিতার্থ হইত এবং দাসদের স্তর হইতে তাহাদের পার্থক্যও প্রতিপন্ন হইত।

---

* শুধু দাসই নহে, সমস্ত শোষিতই। ** দাস ও প্রভুর অন্তর্বর্তী স্তরের ব্যক্তি।

৭। ধর্ম

ধর্মবিষয়ে সামন্তবাদী যুগ ও দাসতাযুগের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই—এইজন্য ইহার আলোচনাও আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে সামন্তবাদের বর্ণনা প্রসঙ্গেই করিব। এখানে প্রসঙ্গত ইহা বলিয়া রাখা যায় যে, 'ধারণ করিয়া রাখে বলিয়া তাহার নাম ধর্ম†।' এই প্রবচনের সত্যতা বা উপযুক্ততা সম্পর্কে আমাদের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই** ; কারণ, ধর্ম চিরকালই চলায়মান এবং প্রগতিশীল সমাজকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। দাসতাযুগেও ধর্ম প্রভুবর্গের স্বার্থের সঙ্গে সমাজশক্তির বিরোধ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে ; এবং এই ধর্মই দাসকে প্রভুর অধিকারের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপণ পাপ বলিয়া শিখাইয়াছে।

†ধরণাদ্ ধর্মমিত্যাহু। **ধর্মের উৎপত্তি ও তাহার বিকাশধারা বুঝিবার জন্য ১২—১৮ পৃষ্ঠা এবং তৎসম্বন্ধে সামন্তবাদী যুগের শেষের দিকে ধর্ম ও সদাচার বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

সভ্য মানব সমাজ (২)

(খ) সামন্তবাদী যুগ

দুইটি বিরোধী বর্গে বিভাজিত হইবার পর সমাজের শাসনযন্ত্র বা রাজ্যও ধনিকবর্গের আয়ত্তে চলিয়া যায়; ইহাতে দীনহীন দাস ও নির্ধনদিগকে করগত রাখিবার কোন বন্দোবস্তেরই আর ক্রটি থাকে না। কিন্তু তাহা হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থসম্পকিত বিরোধিতা তখন ক্রমেই প্রবল হইতেছিল। ধনিকদের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি সেই সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত হইয়া বাস করিত। এই বিভিন্ন ভৌগোলিক প্রদেশগুলিই তখনকার বিভিন্ন রাজ্য এবং তাহার শাসনকর্তারা সেই সব অঞ্চলের সামন্ত অথবা রাজা। অন্যের রাজত্বের প্রতি লোভলিপ্সা থাকায় এই সব রাজ্য ও রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ কখনও বন্ধ হইত না। তখনকার যোদ্ধসম্প্রদায় জনযুগীন গোষ্ঠীর মত তেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিল না—পার্শ্ববর্তী শত্রুর সৈন্যবল বুঝিয়া প্রত্যেক রাজ্যকেই তখন নিজেদের বাহিনী প্রস্তুত করিতে হইত; প্রাচীন যুগের গোষ্ঠীযুদ্ধে প্রত্যেক সেনানী নিজেই নিজের নায়ক ছিল—তখন বাহিনী ছিল না, এইজন্য সেনা-নায়কের প্রয়োজন ছিল না—আদিম অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত কৌশল ও বীরত্বে তখন যুদ্ধ করিত। এক কোষ বা সেল* বিশিষ্ট প্রাণীর শরীর চালনা যেমন অনায়াস হয়—প্রাচীন যুগের যোদ্ধাদেরও তখনকার গোষ্ঠীসংঘর্ষে তেমনই সুবিধা হয়। কিন্তু এই যুগে † সেনার সংখ্যা শতের অঙ্ক ছাড়াইয়া দেখিতে দেখিতে সহস্রাধিকে পৌঁছাইয়া যায়—আর যুদ্ধক্ষেত্রে বহুতর নূতন ও উন্নত ধরণের অস্ত্রপাতিরও ব্যবহার হইতে থাকে। সৈনিকদের মধ্যে এইজন্য অস্ত্রশিক্ষা, সংগঠন এবং সামূহিক শক্তিপ্রয়োগের কৌশল আয়ত্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা পড়ে; এবং ইহার ফলে সেনাবাহিনীর জন্য নূতন করিয়া নায়কোচিত গুণসম্পন্ন সেনানায়কেরও আবশ্যক হয়। পিতৃসত্তার যুগে বলিতে পারা যায়, এইসব সৈন্যনেতাদের পাঠশালার শিক্ষা একরূপ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তখন সৈন্যদল গঠনের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিই যে সমাজে নেতৃত্ব করিবার অধিকতর সুবিধা পাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। তদুপরি পরস্ব

* Cell; † অর্থাৎ সামন্তবাদী যুগে আসিয়া।

লুণ্ঠনের লাভ ও লোভ* মানুষকে তখন নিত্যই যুদ্ধে ও সমরাভিযানে আকৃষ্ট করিয়া লইতেছিল। যুদ্ধের এক সমসাময়িক রাজার উপাখ্যান হইতে আমরা এই মনোবৃত্তির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিব; বুদ্ধের শিষ্য রাষ্ট্রপালা† কুরুদেশের‡ রাজা কৌরব্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

"তোমার একজন বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধেয় পুরুষ পূর্বদিশা হইতে আসিয়া বলিল, 'মহারাজ, আমি পূর্বদিশা হইতে আসিতেছি....সেখানে একটি সমৃদ্ধ জনবহুল দেশ দেখিয়া আসিলাম....তাহাতে অগণিত অশ্ব, গজ, রথ, পদাতিক....অগণিত গজদন্ত, মৃগচর্ম....এবং অজস্র সুবর্ণ§....বহু সুলভ লাবণ্যবতী নারী....মহারাজ, এত সৈনিক হইলে আপনি ঐ দেশ জয় করিতে পারেন...বিজয়ী হউন রাজন্!'—তাহা হইলে তুমি কি কর রাজা?...."

"....আমি তাহাও জয় করিয়া আমার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লই।"

রাজা কৌরব্যের উত্তর সামন্ত যুগের চিরঅতৃপ্ত লোভের একটি চমৎকার উদাহরণ। কোন দেশের সঙ্গে শত্রুতা থাকুক বা নাই থাকুক, কিংবা সেই দেশের লোকে কোন অহিত করুক বা নাই করুক—কিন্তু ধন, সুবর্ণ কিংবা স্ত্রীর অধিকারী হইলে তাহারও নিস্তার নাই। জনযুগেও অবশ্য যুদ্ধ হইত—কিন্তু তাহা প্রায়ই সমগ্র সমাজের স্বরক্ষা ও লাভের জন্য হইত।** রাজা কৌরব্যের মত শুধু পরধন ও পরস্ত্রীর লালসায় তখন কেহ যুদ্ধ করিত না। কিন্তু বৈযক্তিক সম্পত্তির বংশানুক্রমিক প্রভাবের পরে লোকনায়কও লোভান্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাই লোভের পূর্তিকর সকল রকমের কাজই সামন্ত সমাজে ন্যায্য বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। যুদ্ধে বিজয়লাভের ফলে সেনানায়ক তখন শুধু বীরতারই খ্যাতিলাভ করিত না—যুদ্ধজয়ের ফলে তাহাদের বৈযক্তিক সম্পত্তি এবং শাসনাধিকার বৃদ্ধিরও বহু সুবিধা হইত। এইভাবে সেনানায়ক সামন্তেরা এই যুগে আসিয়া সমগ্র শাসনযন্ত্রের কর্ণধার হইয়া বসে, এবং পরে এই শাসন-ক্ষমতাই আনুবংশিক হইয়া সমাজে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। প্রাচীন মিশর, মেসোপোতামিয়া বা সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায়ও পিতৃসত্তা যুগের নায়কেরা††† রাজতন্ত্রের স্রষ্টা হয়। কিন্তু পরবর্তী য়ুনানী‡‡ ও ভারতীয় এবং সম্ভবত ইরাণী সমাজেও রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র এই দুই ধারায়ই সমাজের বিকাশ হইতে থাকে।

*তুলসীদাস বলিতেছেন, 'জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাঈ'—অর্থাৎ লাভ যত অধিক হয়, লোভও তত বাড়িয়া যায়; † রট্‌ঠপাল সুত্ত (মজ্ঝিমনিকায়, ২৪১); ‡ মেরঠ জিলা; §প্রাকৃতিক ও নির্মিত উভয়বিধ।

** অর্থাৎ সেই যুদ্ধের স্বার্থ বৈযক্তিক হইত না; ††† অর্থাৎ পিতৃসত্তা ও দাতাযুগের সেনানায়কেরা; ‡‡ গ্রাসীয়।

ভারতবর্ষের পঞ্জাব, যুক্তপ্রান্ত, এবং বিহারের প্রজাতন্ত্র বা গণ সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। ভারতে পুরাতন জাতির সহিত নূতন নিত্য-আগত জাতির মিশ্রণ না হইলে এখানে বর্গভেদ এত জটিল হইত না; এবং তাহা না হইলেও হয়ত বা প্রজাতন্ত্র কিংবা গণপরম্পরাও এখানে এত বিস্মৃত হইত না।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে সামন্ততন্ত্রকে আমরা অনেকটা ব্যাপক অর্থেই ধরিয়া লইয়াছি—ইহাতে ধনতন্ত্রের প্রাক্কালীন রাজতন্ত্রের যেমন স্থান আছে তাহার সমকালীন প্রজাতন্ত্রও ঠিক তেমনি স্থান পাইয়াছে; কিন্তু রাজতন্ত্রই হউক, আর প্রজাতন্ত্রই হউক—দেশের রাজনীতিক ও সৈনিক শক্তিকে উভয়েই শোষক-বর্গের হিতের জন্য ব্যবহার করিয়াছে। সমাজের অক্ষুণ্ণস্বার্থ বর্গের মুখে এইজন্য সামন্ততন্ত্রের এত অজস্র প্রশংসা শোনা যায়—সামন্তযুগ তাহাদের নিকট সত্যই সুবর্ণযুগ ছিল; কিন্তু আজ সত্যযুগ ও সুবর্ণযুগের দিন গিয়াছে, তাই শ্বাস টানিয়া ইহারা অতীত দিনকে স্মরণ করিয়া শুধু দুঃখিত হন।

সামন্তযুগে মানব সংস্কৃতির প্রকৃত বিকাশ হইয়াছিল—পশ্চাৎবর্তী যুগ হইতে এই সময় বিকাশের বেগও তীব্র ছিল। কিন্তু ইহা না-ই বা হইবে কেন? জীবন তখন শুধু আবশ্যক বস্তুপাতি সংগ্রহ করিতেই ব্যয়িত হইয়া যাইত না। এই কাজের জন্য সামন্তযুগে দাস ও শ্রমিকের ফৌজ সদা মজুত থাকিত। এইভাবে অন্যবর্গের শ্রমসাহায্যে ভদ্রজনের নিকট উৎপাদনশ্রম তখন নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হয়। বস্তুসংগ্রহের* চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া ভদ্রেরা সাহিত্য, কলা, দর্শন প্রভৃতি ব্যাপারে সময় ও শ্রম নিয়োগ করে। দাস ও শ্রমিকের শ্রমসৃষ্ট সমৃদ্ধির উপরা এইভাবেই সমাজে সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ইহাতে দাস বা শ্রমিকের কৃতির কথা ইতিহাস মোটেই স্মরণ রাখে নাই—এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে প্রভুর সৃষ্টির গৌরবে শ্রমিকও নিজের বর্গস্বার্থ ভুলিয়া গিয়াছে।

মিশরে সেখানকার শাসকদের শরীর এবং আত্মাকে অমর করিবার প্রচেষ্টায়ই কলার প্রথম সূত্রপাত হয়। সামন্তেরা ক্রমে সমাজে দেবতার আসন লাভ করিবার পর তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া ধার্মিক কলাও বিস্তৃতি লাভ করে। সামন্ত যুগের কলা সমাজের বস্তুস্থিতিকে স্বীকার করিয়া তাহাকে প্রগতিশীল করিবার আদর্শে সৃষ্ট হয় নাই। তখনকার কলাকর্মের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের মূল সমস্যা হইতে মানুষকে ভুলাইয়া রাখা—অর্থাৎ বর্গস্বার্থপূর্ণ সমাজের সমস্ত বিরোধ ও অন্যায়কে লুকাইয়া রাখা। কোন কলাকার, সাহিত্যস্রষ্টা বা

* জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যক জিনিসপত্র; † ইহারা নিজে অভুক্ত থাকিয়া এবং বহু ক্রূর যাতনা সহ্য করিয়া সমাজের জন্য ধন সৃষ্টি করিয়াছে; আর প্রভুবর্গ সেই ধনে সমৃদ্ধ হইয়া সমাজে কলা, দর্শন প্রভৃতির সূক্ষ্ম চর্চা চালাইয়াছে।

দার্শনিক এই আদর্শ না মানিলে তাহার কৃতিকে সমাজ গ্রহণ করিত না—সেই কাব্য, দর্শন ও শিল্পকে অপাংক্তেয় করিয়া তাহা লুপ্ত ও বিস্মৃত করিয়া দেওয়া হইত। সামন্তযুগের কলানায়ক ছিল সামন্ত এবং তাহার নিজেরই বর্গ; এইজন্য ইহার পশ্চাতে সামন্তীয় বর্গস্বার্থ এবং সামন্তবাদের প্রেরণা ক্রিয়াশীল থাকিলে আশ্চর্য কি?

১। বিভিন্ন দেশের সামন্তবাদ

(১) **মিশর**—মিশরের ইতিহাস হইতে জানা যায় সেখানকার গোষ্ঠীপিতা পিতরেরাই নিজেদের অধিকার বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে সামন্ত শাসকে পরিণত হয়। ইহার পর ধর্মের সাহায্যে মানুষের দৃষ্টি ইহলোক হইতে সরাইয়া লইয়া পরলোকের দিকে নিবদ্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ইহার ফলে তখন সাধারণ মানুষ সমাজের স্বামী ও শাসকের অন্যায়ের প্রতি উদাসীন হইয়া ন্যায় ও বরপ্রাপ্তির জন্য একমাত্র দেবতার দিকে তাকাইয়া থাকিতে শিখে। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন* মিশরের অন্তর্গত থেবার পুরোহিত রাজারা শক্তি ও প্রভাবের দিক দিয়া প্রায় অনন্য হইয়া উঠিয়াছিল। জনসংখ্যা বর্ধন, পরস্বের প্রতি লোভ এবং দেশের অন্যান্য আন্তর ও বাহ্যিক অবস্থার জন্য যুদ্ধজয়েব প্রতিও তখন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। কিন্তু থেবার পুরোহিত রাজা সেনাসঞ্চালনে সমর্থ ছিল না বলিয়া সেখানকার সেনাচালকেরা ক্রমে সমাজে প্রধান** হইয়া বসে। প্রাচীন মিশরীয় সমাজে প্রথমত মানুষ ও দেবতার এক অপরূপ সংমিশ্রণ ঘটাইয়া রাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনা হইয়াছিল। সেখানকার সমাজের উপর তখন বিশেষ প্রাধান্য ছিল দেশের রাজার—এবং মিশরীয়দের দৃষ্টিতে এই রাজা ছিল দেবঅংশসম্ভূত অর্থাৎ তিনি মানুষ হইয়াও ছিলেন দেবতা। তখনকার মিশরে স্বয়ং রাজা এবং তাঁহার কয়েকজন সর্দার বা সামন্ত সমগ্র দেশের ভূস্বামী হইত; তাঁহার ফলে তখন মিশরে জনতার অধিকাংশই হইত দাস কিংবা কর্মী†; আর এইসব দাস, কর্মী ও ভূ-স্বামীর মধ্যে মধ্যম বর্গীয়ের সংখ্যা তখন খুব বেশি ছিল না—সামান্য যাহা কিছু ছিল তাহা সংখ্যায় যেমন নগণ্য, শক্তিতেও তেমনই নগণ্য ছিল। তাই পুরোহিতদের শাসনের সময় পুরোহিত এবং তাহাদের সহায়ক যোদ্ধবর্গ ছাড়া অন্যের বিশেষ কোন সুবিধা ছিল না। সাধারণ—অর্থাৎ কৃষক, মাল্লা, লোহার, বাড়ুই-

---

* ২৫০০ খ্রীঃ পূঃ *Ancient Records of Egypt*—Vol. I. pp. 126—Breastead (106).

** অর্থাৎ সামন্ত, সামন্তরাজা এবং রাজা; † Serf, কমীব।

কিংবা বানিয়া বা দাস—ইহাদের সকলের অবস্থাই তখন খারাপ ছিল। এই সব নিপীড়িত মানুষ সহ্যের সীমা অতিক্রম করিলে কখনও কখনও বিদ্রোহও করিয়া বসিত; তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য তখন দুই একজন ধার্মিক নেতা কিংবা ভবিষ্যৎবক্তাও জুটিয়া যাইত, এবং কখনও 'ধর্মাত্মা' হিসাবে পরিচিত দুই একজন রাজাও যে মিলিত না তাহাও নয়। এইসব রাজারা প্রজার সহিত রাজার সম্বন্ধকে পুত্রের সহিত পিতার সম্বন্ধের অনুরূপ বলিয়া প্রচার করিতেন। ১৬২৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে মিশরে হেক্কু নামে এইরূপ একজন রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। ইতিহাসে হেক্কুর সমদৃষ্টি ও ন্যায় সম্পর্কে প্রশংসা আছে —এই হেক্কু নিরন্নকে অন্নদান করিতেন এবং নির্বস্ত্রকে বস্ত্র দিতেন—তাঁহার রাজ্যে দাস এবং কর্মীরাও রাজপুরুষের কাজ পাইত। পুরালেখ হইতে জানা যায় হেক্কু দুর্বলকে পীড়া দিতেন না—সহায়হীনকে ভীত করিতেন না, তিনি গ্রামীণ জনতার পরিপোষক এবং পরম হিতৈষী ছিলেন। কিন্তু তবু হেক্কুর রাজত্বে ব্যৈক্তিক সম্পত্তির লোভ কত বড় হইয়াছিল তাহা তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই জানা যায়।....হেক্কু বলিতেছেন: 'মানুষের হৃদয় বড় নির্মম এবং নির্লজ্জ; ইহারা সর্বদাই প্রতিবেশীর সম্পত্তি লুঠিতে চায়...সৎকর্মীর এখানে বিন্দুমাত্র কদর নাই—যে দুষ্কর্ম করে তাহারই প্রভাব ও প্রতিপত্তি সর্বাপেক্ষা বেশি।'

এই যুগে মিশরের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করিত—কারণ, ব্যবসায়পত্রের তখনও খুব বেশি উন্নতি হয় নাই। নীল নদের বন্যা এবং ভূমির বণ্টন ও কর নির্ধারণের জন্য মিশরীয়দের অঙ্কগণিত ও রেখাগণিতের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদে তাহারা বহু নূতন গণিতসূত্রের আবিষ্কার করে, এবং এইভাবে অন্যান্য বহু বিষয়ের মত গণিত বিষয়েও তাহারা পৃথিবীর সভ্য জাতিসমূহের অগ্রণী হয়। ইহা ছাড়া, মিশরবাসীরা সর্বপ্রথম অক্ষর অর্থাৎ চিত্রলিপি আবিষ্কার করে; এবং ধর্ম-বিষয়ক আবিষ্কার উদ্ভাবনেও* তাহারাই পৃথিবীর সর্বাগ্রগণ্য হয়। সমাজের আদিম অবস্থায় মানুষ পিতামাতা এবং সমাজের নিকট হইতে দেখিয়া শুনিয়া যাহা শিখিত তাহাই পর্যাপ্ত হইত। কিন্তু জ্ঞানের ভাণ্ডারে বহু জিনিস জমিয়া যাওয়ার পর এই ভাবের শ্রুতিপাঠ আর সম্ভব হইত না—দেখিয়া শুনিয়া যে যৎসামান্য বিদ্যা আয়ত্ত হইত, তাহা সমাজের প্রয়োজনের কাছে তুচ্ছ হইয়া যাইত। এইজন্য সমাজবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শিক্ষার জন্যও নূতন রকম বন্দোবস্ত করিতে হয়। সমাজের প্রথম অবস্থায় মানুষের চলা, বলা, ধরা এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন

* দেবতা নির্মাণ, ধর্ম নির্মাণ ইত্যাদি।

কাজের শরীরসঙ্কেত আশ্রয় করিয়া চিত্রকলার বিকাশ ঘটে—তাহার পর এই সব আকৃতিচিত্রের সাহায্য লইয়াই মানুষের ভাষা প্রকাশের জন্য আদিম অক্ষর অর্থাৎ চিত্রলিপির সৃষ্টি হয়। প্রাচীনকালে চীনীলিপিও প্রথমত ঠিক এইরূপ ভাবে চিত্রলিপি হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল; এমন কি, এখনও তাহা ধ্বনি বা বর্ণলিপিতে রূপান্তরিত হয় নাই—তবে চীনের প্রাচীন চিত্রলিপিতে ক্রমে এত পরিবর্তন হইয়াছে যে, বর্তমান সঙ্কেতলিপি দেখিয়া তাহাতে প্রাচীন চিত্র-ইঙ্গিত আর আবিষ্কার করা যায় না। মিশরে শিক্ষার নানারূপ প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার পর তাহা হইতেও শাসক এবং পুরোহিতরাই বেশি লাভবান হয়। তবে ইহা হয়ত সত্য যে, চিত্রের ইঙ্গিত থাকার জন্য প্রথম প্রথম মিশরীয় লিপিগুলিকে অধিকাংশ লোকই একরকম বুঝিতে পারিত। কিন্তু সময় অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও সংখ্যা বাড়িতে লাগিল—এবং ইহার ফলে লিপির প্রাথমিক সরলতা আর অক্ষুণ্ণ থাকিল না; তাই সাধারণের পক্ষে তখন ইহা বোধের সম্পূর্ণ অগম্য হইয়া গেল। মিশরের পুরোহিত শাসকেরাও বর্তমানকালীন শাসক সম্প্রদায়ের মত জনসাধারণকে শিক্ষিত করিতে চাহিত না—তাহাদের মধ্যে অন্ধকার, অজ্ঞানতা এবং মিথ্যাবিশ্বাস যত বেশি থাকে ততই শাসকের পক্ষে সুবিধা ছিল—কারণ, মূর্খকে শাসন করা সোজা, ইহারা কখনও প্রতিবাদ করে না, এবং প্রভুর হালুয়ার হাঁড়িতে ভাগও বসাইতে জানে না।

প্রাচীন মিশরীয় সামন্তবাদ ভৌতিক অর্থাৎ পার্থিব সুখকেই একমাত্র প্রকৃত ও বাস্তব সুখ বলিয়া জ্ঞান করিত; এইজন্য পুরোহিতদের বহু চেষ্টায়ও সাধারণ মানুষ ইহজীবনের সুখদুঃখ ভুলিয়া গিয়া স্বপ্নস্বর্গকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সম্ভবত পরলোকের জন্য জন্মমৃত্যু উৎসর্গ করিবার মত মানসিক উৎকর্ষতা লাভ করিতে সমাজের তখনও বাকী ছিল। মিশরীয়দের প্রাচীন ধার্মিক অনুষ্ঠানগুলিতে আমোদ-প্রমোদের বিশেষ প্রকার বন্দোবস্ত হইত—এই সময় নেশা বা শরাবের কোনরূপ দুর্লভতা থাকিত না—তাহার উপর গীত, বাদ্য, নৃত্য সমস্ত কিছুরই ব্যবস্থা থাকিত। মিশরীয় সমাজে সময় কর্তনের জন্য ভারতীয় দাবা-পাশার অনুরূপ গুটিখেলা এবং ব্যসনেরও প্রচলন ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি নীল উপত্যকায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপত্তির ভয় বড় বেশি ছিল না—তার উপর জনসংখ্যার পরিপোষণের জন্য কৃষি ও পশুপালন ব্যবস্থাও সেখানে একরূপ পর্যাপ্ত ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দলিতশোষিতকে আয়ত্তে রাখিবার জন্য সেখানে সিপাহীশাস্ত্রীরও প্রয়োজন হইত; তবে উচ্চতরবর্গেরা ক্রমে বেশি আমোদী হইয়া যাইবার পর এইভাবে অস্ত্রধারী জীবন আর তাহাদের সহ্য হইত না—তখন আপন বর্গ হইতে সৈনিক বা সেনানায়ক নিযুক্ত না করিয়া

তাহারা রাজ্যরক্ষার জন্য ভাড়াটিয়া সৈন্য পোষণ করিতে আরম্ভ করে। প্রথমত, এই বৈতনিক সৈনিকেরা প্রভুর দাস অর্থাৎ সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ ছিল—কিন্তু ক্রমে তাহাদের শক্তি এত প্রবল হইয়া পড়ে যে, থেবার পুরোহিত-শাসন ইহার সম্মুখে ভাঙ্গিয়া যায়।

প্রাচীন মিশরীয় সমাজের শ্রেণীবিন্যাসেও ঘোরতর বিরোধ ছিল; এইজন্য মধ্যে মধ্যে এই বিরোধের আকস্মিক বিস্ফোট ঘটিলে তাহাও আশ্চর্যের কিছু নয়। ডেলব্রুইক্* একটি মিশরীয় পুরালেখ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, প্রাচীন মিশরের দাসেরাও একবার সমগ্র শাসনযন্ত্র হস্তগত করিয়া লইয়াছিল। ইহার পর ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর ধরিয়া মিশরের শাসক সম্প্রদায় তাহাদের 'দৈবী' অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে। অতীতকালে এইরূপ সমস্ত জন-বিদ্রোহকে শাসক ও পুরোহিতেরা ধর্মবিরোধী ও দৈববিরোধী বলিয়া প্রচার করিত—এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই তরবারির জোরে তাহা দমিত করিয়া দিতে তাহাদের অসুবিধা হইত না। এখানে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমাজের পরিবর্তনকামীরাও অনেক সময় ঈশ্বর এবং ধর্মের নাম লইয়াই তাহাদের কাজ আরম্ভ করিত। লোদী ও সুর বংশের শাসনকালে** মেঁহদি† তখনকার সামন্তবাদ ও শাহনশাহীর বিরুদ্ধে একপ্রকার সাম্যবাদী মত প্রচার করিতে থাকে। ইহার ফলে সামন্তী সমাজের অত্যাচারিত বর্গের মধ্যে মেঁহদির প্রতিপত্তি ও প্রভাব দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছিল। এমন কি, ক্রমে শাহী ফৌজের হাজার হাজার সিপাহীও কাজ ছাড়িয়া দিয়া মেঁহদির অনুগত হইয়া যায়—কিন্তু এইবার বাদশাহ আর আগের মত স্থির ও অবিচলিত থাকিতে পারিলেন না—পূর্বে যাহাকে একটি ক্ষুদ্র ধর্ম-সম্প্রদায় ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, এখন তাহারই নিকট হইতে বিপদ আশঙ্কায় তিনি স্থৈর্য হারাইলেন। বাদশাহ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুদিন পর মেঁহদিকে তাঁহার নিকট ডাকাইয়া পাঠাইলেন; মেঁহদি চল্লিশ কদম দূর হইতে জমিনের উপর দুইবার ঝুঁকিয়া সিজদা বা কুর্ণিশ বাজাইলেন না—তিনি সোজা বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুসাফার জন্য তাঁহার হাতের উপর নিজের হাত রাখিয়া দিলেন। মেঁহদি সত্য সত্যই সকল মানুষকে সমান ভাবিতেন, সেইজন্য মানুষের আর্থিক সাম্যও তাঁহার নিকট ন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাই ধর্মাস্ত্র ধারণ করিয়া মেঁহদি অকুণ্ঠস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'আমি পৃথিবীর অন্তিম পয়গম্বর মেঁহদি,....সোজা খোদার তরফ হইতে আমি প্রেরিত হইয়াছি, দুনিয়ার সমস্ত ঝুটা ও অন্যায় দূর করিয়া এখানে

* Delbruick.

** ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দ, † জৌনপুরের জনৈক ফকির।

সাম্য ও সমানতার রাজ্য কায়েম করিব।' ইহাতে বাদশাহ নিরুপায় হইয়া মেঁহদির বিরুদ্ধে নরকবাসের ফতোয়া* লইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মেঁহদির প্রভাব তখন এত প্রবল যে, শাহী দরবারের মোল্লারা তাঁহার বিরুদ্ধে নরকের ফতোয়া দিলেন না।† এখানে উল্লেখযোগ্য, শোষক বা শাসক প্রথমে যে শোভন আচরণ করে তাহা শুধু দেখাইবার জন্যই—কিন্তু শেষ অবধি উদ্দেশ্য-পূরণের ব্যাঘাত হইলে সমস্ত শোভনতা ত্যাগ করিতেও ইহাদের বাধে না। মেঁহদি ও তাঁহার অনুযায়ীদিগকে বাদশাহ কিরূপ নির্দয়ভাবে কতল করাইয়াছিল এখানে সে আলোচনার প্রয়োজন নাই। হইতে পারে ভারতবর্ষে এখনও মেঁহদির অনুযায়ী কিছু কিছু লোক বর্তমান আছে—তবে অন্যান্য দল পূর্বগামীর আত্মদানকে যেভাবে কাজে লাগায়‡ ইহারাও তাহা হইতে স্বতন্ত্র নয়।

মিশরীয় সমাজের বিরোধগুলিকে আমরা পাঁচটি পৃথক্ পৃথক বিষয় হইতে বুঝিতে পারি :—

(১) সমাজে উচ্চবর্গের কর্তব্য কি, এবং তাহাদের তাহা পালনের উপায়ই বা কি§ ? (২) মিশরীয় সমাজের বর্গদ্বেষ, অসন্তোষ ও বিদ্রোহ ** (৩) আদর্শ রাজা ও শাসক সম্পর্কে বহুবিধ সদ্‌গুণের উল্লেখ †† ; (৪) শাসক ও অধিকারী-বর্গের স্বার্থে আইন প্রণয়ন‡‡ ; এবং সর্বোপরি (৫) ধর্ম অর্থাৎ ধার্মিক আচার ও প্রচারের সাহায্য সমাজের পরিবর্তন বন্ধ করা।§§

(২) **ভারত**—হিন্দু ভারতের সামন্তকালের দিকে তাকাইলে আমরা পূর্বের প্রায় সকল রকম ব্যাপারই এখানে দেখিতে পাইব। এখানেও মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারেরা দেশের রাজা এবং প্রজার কর্তব্য সম্পর্কে বহু প্রকার বাগ্‌বিস্তার করিয়াছেন। মোটের উপর শাসক এবং রাজার জন্য এখানেও প্রজার কায়িক শ্রম এবং জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ উৎসর্গ করিতে বলা হইয়াছে—কিন্তু

* 'কুফ্রকা ফতোয়া'—ইহা মোল্লাদের সমর্থিত ধার্মিক বহিষ্কার; † ইহার সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি কারণও অবশ্য থাকিতে পারে—বাদশাহ তাঁহার দরবারের মোল্লাদের সঙ্গে অত্যন্ত হীন ব্যবহার করিতেন; তাই বাদশাহের প্রতিপত্তিহানিতে মোল্লারা পক্ষান্তরে খুশীই হইতেছিল ; ‡ অর্থাৎ ক্রমে তাঁহাদের আত্মদানের মানবকল্যাণ উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহা শুধু দলের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক প্রচারে নিয়োজিত হয় ; § উচ্চবর্গ শাসনের ন্যায্য অধিকারী—এই ধারণা, এবং তাহা পালনের জন্য শোষণও ন্যায্য—এইরূপ বিশ্বাস।

** প্রাচীন পুরালেখ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ; †† এই সমস্ত গুণের উল্লেখ শুধু তখনকার শাসকদিগকে সতর্ক করিবার জন্য ; ‡‡ আইনের আশ্রয়ে তাহাদের লুণ্ঠনকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করা ; §§ বর্গদ্বেষকে দমিত রাখা এবং বর্গস্বার্থকে অক্ষুন্ন রাখা।

প্রজার অধিকারের তালিকায় পরজন্ম বা পরলোকের স্বর্গস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুরই নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। এইভাবে ভারতীয় শাস্ত্রকারও সমাজের অসাম্যকে লেপিয়া মুছিয়া তাহার উপর এক আকর্ষণ ধার্মিক আস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছে। সমাজকে একদেহ পুরুষ কল্পনা করিয়া সমাজের বিভিন্ন বর্গকে তাহার প্রত্যঙ্গ কল্পনা করার উদ্দেশ্য বর্গবিদ্বেষকে নরম করা। এই চেষ্টায় বেদের পুরুষসূক্তে লেখা হইয়াছে—'ব্রাহ্মণ ইহার মুখ, রাজন্য ভুজ, বৈশ্য জঙ্ঘা এবং শূদ্র ইহার পাদস্বরূপ।' গীতা প্রভৃতি পরবর্তী গ্রন্থে স্বধর্মে নিধনকে শ্রেয় বলিয়া পুরুষসূক্তের উদ্দেশ্যকেই পাকা করা হইয়াছে।

আর্য ও অনার্যের মধ্যে কে শাসক হইবে ইহার জন্য যুদ্ধবিগ্রহ পঞ্জাব অঞ্চলেই শেষ হইয়া যায়; তাহার পর গঙ্গাতটে পৌছিতে পৌছিতে সমস্ত আর্য ভিন্ন জাতিই যুদ্ধের ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়া অস্ত্রত্যাগ করে। পরে ধীরে ধীরে শাসকদের স্বার্থ ও আদেশ অনুসারে তাহারা নির্বিঘ্ন জীবন-যাপনের জন্য প্রস্তুত হয়। এইজন্য গঙ্গাতটের জীবনযাত্রা তখন যথেষ্ট সমৃদ্ধ থাকিলেও সাধারণ সম্প্রদায়ের তাহাতে বড় লাভ ছিল না: রাজ্যের সকল ঐশ্বর্য সেই সময় পার্থিব শাসক ক্ষত্রিয় এবং দৈবিক শাসক ব্রাহ্মণ—এই দুই সম্প্রদায়ের হস্তগত হইয় পড়িত। ভারতবর্ষে এই দৈবিক শাসক অর্থাৎ পুরোহিত বা ব্রাহ্মণবর্গকে আমরা গঙ্গার উর্বর মৃত্তিকার উপজ বলিতে পারি। এই স্থানে আসিয়া আর্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুইটি পৃথক্ বর্গের সৃষ্টি হইয়াছিল—কিন্তু তখন উভয় বর্গই নিজেদের স্বার্থগত বিরোধের মধ্যে একটি স্থায়ী সমন্বয় করিয়া লইতে চেষ্টা করে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই স্বার্থসমন্বয় পরবর্তী কালেও প্রায় তিন, সাড়ে তিন হাজার বৎসর ধরিয়া অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতীয় পুরোহিত সম্প্রদায় যে প্রথম প্রথম নিঃস্বার্থ ও ভোগশূন্য জীবন-যাপন করিত—ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা: বেদ, উপনিষদ বা বুদ্ধকালীন যে-কোন গ্রন্থ হাতে লইয়া দেখুন,—দেখিবেন কত বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র রাজদত্ত অর্থ ও অনুগ্রহ লাভ করিয়া সুখের সপ্তস্বর্গে অধিষ্ঠান করিতেছেন,—বহু যাজ্ঞবল্ক্য জনকের গোগৃহ হইতে সহস্র স্বর্ণক্ষুরা* গাভী দক্ষিণা লইয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন,—এমন কি দেখিবেন, ঋষি আপন পত্নীদ্বয়ের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের চিন্তা করিতে করিতে দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন। আর বুদ্ধকালীন ভারতে ব্রাহ্মণের 'ভোগশূন্য' জীবন সম্বন্ধে জানিতে হইলে ত্রিপিটক† খুলিয়া চকি, সোনদণ্ড, কুটদন্ত প্রভৃতির

* গাভী দান করিবার সময় তাহার শিঙ ও ক্ষুর সোনারূপায় মুড়িয়া দেওয়া হইত; † মৎকৃত 'বুদ্ধচর্যা' দ্রষ্টব্য (পৃঃ ২২২, ২৩২, ২৪২)—ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মীয়-সুত্ত (সুত্তনিপাত ২।৭)।

ধনসম্পত্তির বিবরণ পড়িয়া দেখুন। ব্রাহ্মণের পুরাতন ও তৎকালীন স্বার্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে বুদ্ধ একস্থানে* বলিতেছেন :—

....“রাজার সম্পত্তি—তাহার সালঙ্কারা নারী, উত্তম অশ্বযুক্ত ও চিত্র-বিচিত্র এবং সূচীকর্মকৃত রথ, বহু প্রকোষ্ঠ অট্টালিকা....এই সমস্ত দেখিয়া ব্রাহ্মণের লালসা হইল। ব্রাহ্মণ ভাবিল তাহার নিকটও রাজার মত....গবাদি পশু অজস্র হউক, অলঙ্কৃতা স্ত্রী অসংখ্য হউক....এবং মনুষ্যের অন্য ভোগ্যও অপরিমিত হউক। ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র রচনা করিয়া ইক্ষ্বাকু রাজার নিকট গেল—‘তুমি প্রভূত ধনধান্যবান, তোমার বিত্ত অপরিসীম, যজ্ঞ কর।’ রাজা অশ্বমেধ, পুরুষমেধ,† বাজপেয় নিরর্গল ‡ প্রভৃতি যজ্ঞে ব্রাহ্মণকে বহু বিত্ত দিলেন....উত্তম অশ্বযুক্ত সুন্দর রথ দিলেন... এবং বহুপ্রকোষ্ঠ অট্টালিকা ধনেধান্যে পূর্ণ করিয়া দিলেন। ....ব্রাহ্মণের তৃষ্ণা আরও বাড়িল .. মন্ত্র রচনা করিয়া ব্রাহ্মণ আবার ইক্ষ্বাকুর নিকট গেল—‘যেমন জল, ভূমি, হিরণ্য....কিংবা ধন বা ধান্য, তেমনি গাভীও মানুষের নিমিত্ত সৃষ্ট....ইহা ভোগবস্তু; রাজা যজ্ঞ কর!... এইবার ব্রাহ্মণের অনুশাসনে রাজা যজ্ঞে বহু সহস্র গোবধ করিলেন।”

অন্যান্য দেশেও পুরোহিত ও শাসকের স্বার্থকে এই একই ভাবে সমন্বিত করিয়া লওয়া হইয়াছিল। সেখানেও রাজারা দান-দক্ষিণা প্রভৃতিরূপে পুরোহিতকে তাঁহাদের ভোগবস্তুর একটা অংশ ছাড়িয়া দিতেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে রাজন্যদের শোষণকে নির্বিরোধ ও ধর্মানুমোদিত রাখিবার জন্য পুরোহিতকে উৎকোচ দান ছাড়া কিছুই নহে। ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণের এই স্বার্থসমন্বয় ব্যাপার আরও গভীরভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল—এখানকার রাজারা পুরোহিতকে শুধুমাত্র ভোগসম্পত্তি দান করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁহারা স্ব-ইচ্ছায় সমাজে নিজেদের স্থানও ব্রাহ্মণের নীচে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

(৩) **বাবুল**—বাবুলের প্রাচীন শাসকদের মধ্যে হম্বুরবীর** পূর্বেকার আর কাহারও নাম জানা যায় না। এইসব নানা কারণে হম্বুরবীর ধর্মশাস্ত্রকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রাচীন বলিয়া অনুমান করিতে হয়; ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সুসারা†† প্রত্নতাত্ত্বিক খননে হম্বুরবীর অনুশাসনের একটা প্রতিলিপি পাওয়া যায়। এই পাথরটির চারিদিকেই লিপি উৎকীর্ণ আছে; এই প্রস্তরলেখের উচ্চতা হইবে আট ফুট, এবং মোট ৩৬০০ পুংক্তিতে এই অনুশাসন সমাপ্ত। নীচের দিকের ইহার প্রস্তরভিত্তির পরিধি প্রায় সাত ফুট—অবশ্য উপরের দিকে স্বভাবতই

* বুদ্ধচর্যা পৃঃ ৩৯৫ ; † যে যজ্ঞের বলি মানুষ ; ‡ সর্বমেধ যজ্ঞ।

** হম্বুরবীর (২১২৪-২০৮৩ পৃঃ) ; †† ইরাণ

ইহা অপেক্ষা কিছু কম। পেরিসের লুভ্রে সংগ্রহালয়ে হম্মুরবীর এই অনুশাসনটি রক্ষিত আছে; এই অনুশাসনের কিছু লেখা অস্পষ্ট হইয়া গেলেও নিনেবে প্রতিলিপি হইতে তাহা অংশত পূর্ণ করিয়া লওয়া যায়।

হম্মুরবীর জানিতেন যে, সমাজের দলিত-শোষিতবর্গের সহিষ্ণুতারও সীমা আছে। এইজন্য শোষকবর্গের আপন কল্যাণেই এই সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে যাওয়া উচিত নয়। বাবুলের শোষক-শোষিত উভয়েই তখন প্রায় একই জাতি, ধর্ম ও বর্গের অনুগত ছিল—কিন্তু তাহা হইলেও এই বর্ণসাম্যের ভিত্তিতে বর্গগত অসাম্যকে তখন চাপিয়া রাখা চলিত না। এইজন্যই হম্মুরবীর ব্যবস্থা দিয়াছিলেন*—'কোন ব্যক্তি তাহার উচ্চবর্গীয়ের 'চক্ষুপীড়ক' হইলে ইহার শাস্তিস্বরূপ তাহাকে নিজের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দিতে হইবে।' হম্মুরবীর ন্যায়ই আবার বলিতেছে—'কোন ব্যক্তি তাহার নিম্নবর্গীয়ের চক্ষুপীড়ক হইলে ইহার শাস্তিস্বরূপ তাহাকে এক মীনা রূপা জরিমানা দিতে হইবে।' ইহাতে দেখা যায় হম্মুরবীর বর্গবিদ্বেষের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াও তাঁহার ন্যায়ের বিধান সকলের জন্য একরূপ করিতে পারেন নাই। হম্মুরবীর অনুশাসন বলিতেছে—'যদি কোন রাজগীর কাহারও জন্য দালান তৈয়ারী করে—কিন্তু তাহা উপযুক্ত পরিমাণ মজবুত না করে, এবং ইহারই ফলে যদি দালান ধ্বসিয়া গিয়া গৃহস্বামীর মৃত্যু হয়—তাহা হইলে রাজগীরেরও মৃত্যু বিহিত হইবে'—এইরূপ, 'যদি দালান ধ্বসিয়া গিয়া গৃহস্বামীর পুত্রের মৃত্যু হয়—তাহা হইলে রাজগীরেরও পুত্রের মৃত্যু বিহিত হইবে'—কিন্তু, 'যদি দালান ধ্বসিয়া গিয়া গৃহস্বামীর কোন দাসের মৃত্যু হয়—তাহা হইলে রাজগীর মৃত দাসের বদলে গৃহস্বামীকে একটি নূতন দাস সংগ্রহ করিয়া দিবে।' হম্মুরবীর বিধানে তাঁহার নিজের বর্গহিতই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাধান্য পাইয়াছিল। সেই সময় বাবুলে দাসদাসীরা প্রকৃতপক্ষে প্রভুবর্গের অস্থাবর সম্পত্তি ছিল—এইজন্য তাহাদের শাস্তির বিধানও অন্যান্য বর্গের তুলনায় গুরুতর হইয়াছে; মোটের উপর হম্মুরবীর দৃষ্টিতে তাঁহার বর্গস্বার্থ প্রথম স্থান পাইত, এবং মানবতা, মানব হিতৈষণা প্রভৃতি ইহার পরে আসিত।

(৪) **চীন: (ক) কনফুসিয়স****—কনফুসিয়স চীনদেশীয় সামন্তবাদের অন্যতম প্রধান, হয়ত বা সর্বপ্রধান পরিপোষক ছিলেন। এইজন্য চীন, কোরিয়া এবং জাপান—এই তিন দেশের শাসকবর্গই কনফুসিয়সের মতকে আজও গভীর-ভাবে শ্রদ্ধা করে। কনফুসিয়সের সমাজে বর্গব্যবস্থা খুব পাকাপাকি রকমে

* *The Code Of Hamburabi*, **Section 196 ('F. R. Harder, Chicago University Press, 1904).**

** ৫৫১-৪৭৮ খ্রীঃ পূঃ।

তৈয়ার করা হইয়াছিল—সমাজপ্রগতির সঙ্গে তখন ইহার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। সেই সময় চীন দেশে শাসক, শিক্ষিত ও কৃষক—এই তিন বর্গ ছিল; কৃষকের সংখ্যা তখন বর্তমানের সংখ্যা হইতেও অনেক বেশি ছিল বলিয়া মনে হয়। কনফুসিয়স কৃষকদিগকে অজ্ঞান রাখিয়া তাহাদিগকে সমাজের উচ্চতর বর্গের অন্ধানুসরণের নির্দেশ দিয়াছিলেন। তারপর কনফুসিয়সের শিক্ষায় পূর্বজ পূজা অতিরিক্ত রকম প্রাধান্য পাইয়াছিল—ইহার উদ্দেশ্য অবশ্য তখন খুবই গভীর ছিল—সমাজের মানুষ এই শিক্ষার প্রভাবে বর্তমানকে উপেক্ষা করিয়া অতীতকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিত—ফলে শাসকবর্গের পক্ষে নির্বিচার ন্যায়-অন্যায় কাজ করিয়া যাওয়াও সম্ভব হইত।

(খ) মোতী*—মোতী চীনদেশে প্রায় কনফুসিয়সের সমকালীন বিচারকই ছিলেন; তিনি সমাজের বর্গস্বার্থের স্বরূপ বুঝিয়া তাহার প্রতিকারের উপায়ও নির্দেশ করেন। কিন্তু সামন্তস্বার্থের অনুকূল না হওয়ায় মোতীর শিক্ষা দূরদেশে বিস্তৃত হওয়া ত দূরের কথা, এমন কি, চীনেও ইহার প্রভাব হইতে জনসাধারণকে তখন মুক্ত করিয়া লওয়ার চেষ্টা হয়। মোতী সমাজের আন্তর বিরোধকে কনফুসিয়সের মত স্বাভাবিক মনে করিয়া তাহাকে চাপিয়া রাখিতে চান নাই, কিংবা লাউত্‌জুর** মত সামন্তবাদের অনুগমন করিয়া মানুষকে প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাইবার জন্যও নির্দেশ দেন নাই। মোতী ঐকান্তিক এবং একনিষ্ঠভাবেই সমাজের দুঃখ ও বিরোধের কারণ আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছিলেন—এইজন্য প্রাচীন সামন্তবাদী চীনের যুদ্ধ, লোভ এবং দুষ্কৃতিকে তিনি কখনও সমর্থন করিতে পারেন নাই। সামাজিক বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে মোতী বলিতেন, ইহারা মানুষের আবশ্যকতার জন্যই সৃষ্ট, তাই কনফুসিয়সের মত ইহাকে শুধু পূজা করা নিরর্থক।

(গ) য়ুনানা—সামন্তবাদীযুগে লিপি, ভাষা, সাহিত্য, কলা—এই সকল বিষয়েই বিশেষরূপ বিকাশ ঘটিয়াছিল; কিন্তু এই বিকাশ হইতে সমাজের সাধারণ মানুষের অবস্থা তখন কি ছিল, তাহা সঠিক বোঝা যায় না। কারণ, সেই সময়ে সমাজের শাসকসম্প্রদায় একরূপ সর্বশক্তিমান হইয়া পড়িয়াছিল—এবং নিজেদের অন্যায় অত্যাচারের চিত্র তখন তাহারা সমাজসমক্ষে প্রকাশ করিতে চাহিত না। তাহা হইলেও পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে তখনকার সামাজিক অবস্থা আমরা জানিতে পারিব। সমাজের বিপ্লব-বিদ্রোহ দমনের জন্য দূরদর্শী মহাপুরুষেরা যে-সব নীতি প্রচার করিয়াছেন—তাহাই এইক্ষেত্রে আমাদের নিকট পরোক্ষ প্রমাণ হিসাবে বিশেষ সহায়ক হইতে পারে।

* ৪৭০-৩৯১ খ্রীঃ পূঃ ; ** ৬০০ খ্রীঃ পূঃ ; † গ্রীস।

অন্যান্য হিন্দীয়ুরোপীয় জাতির মত য়ুনানীরাও প্রথম দিকে নিজেদের গোষ্ঠী বা জনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে চাহিত। এইজন্য পিতৃসত্তার পরে পঞ্জাববিহারের গণতন্ত্রের মত তাহারাও নিজ নিজ অঞ্চলে গোষ্ঠীক ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। তখন য়ুনানী হেল্লা জাতির মধ্যেও এই একই রূপে পিতৃসত্তা যুগ শেষ হইবার পর নূতন জনতন্ত্রতার সৃষ্টি হয়। কৃষি, ব্যবসায় প্রভৃতির জন্য য়ুনানের প্রজাতন্ত্রী নগরগুলি তখন সত্য সত্যই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সমৃদ্ধি কোনরূপেই সমগ্র সমাজের সমৃদ্ধি ছিল না—ধনী-দরিদ্র ও প্রভু-দাসের বর্গভেদ য়ুনানী সমাজে তখন ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল; এইজন্য নগরের সমৃদ্ধি সাধারণ মানুষের শ্রমের উপজ হইলেও ইহাতে তাহাদের অংশ ছিল না। এই সব কারণে হেল্লাদের মধ্যে অসন্তোষ ও বর্গবিদ্বেষ ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠে—লাইকর্গস্[১] ইহা দূর করিবার জন্য প্রত্যেক শিশু রাজ্যের চোখে সমান বলিয়া দাবী করেন। তাঁহার মতে শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার ভার ব্যক্তির উপর না হইয়া রাজ্যের উপর ন্যস্ত হইবে, এবং রাজ্যই সমভাবে সমাজের সকল শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। দার্শনিক অনাখিমন্দর[২] এবং কবি থেবজনিস[৩] পরবর্তী কালে লাইকর্গসের এই বিচার সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈয়ক্তিক সম্পত্তি সমাজের প্রকৃতিই যেখানে বদলাইয়া ফেলিয়াছিল—সেইখানে শিশুর শিক্ষা-দীক্ষা বা তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে সাম্যবাদ চলিবে কি করিয়া?

(ক) **সোলোন***—সোলোনের সময়ে শ্রেণীবিদ্বেষ এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, উচ্চতর বর্গেরা হেল্লাদের নিকট হইতে কোন সময় বিদ্রোহের আশঙ্কা করিতেছিল। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান হইতে উত্তমর্ণের নিকট দেনদারকে স্বয়ং বিক্রীত হইবার কথা আমরা শুনিয়াছি....সোলোনের সময়ও ঋণ আদায় করিতে না পারিলে অধমর্ণকে স্বয়ং বিক্রীত হইয়া মহাজনের দাস হইতে হইত। অবশ্য সোলোন শেষ পর্যন্ত নিজে উদ্যোগী হইয়া এই কুপ্রথা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা হইলেও বৈয়ক্তিক সম্পত্তির ফলে সমাজে দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছিল; তাই ঋণের দায়ে অধমর্ণকে ক্রয় করিতে না পারিলেও মহাজনেরা তাহাদের ক্ষেত-খামার কাড়িয়া লইতে লাগিল। সোলোন দেখিলেন, দীন নিরাশ্রয়ের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, ইহারা মৃত্যুভয় ত্যাগ করিয়া যে-কোন সময় শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। এইবার সোলোন একটি নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া প্রত্যেকের ভূমির পরিমাণ নির্ধারিত করিয়া দিলেন। সোলোনের আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের বিধান অবশ্য তখনকার সমাজবিপ্লবকে

১। ৯০০ খ্রীঃ পূঃ; ২। Anaximander; ৩। Theogenes of Rhegium.
* ৫৯০ খ্রীঃ পূঃ।

প্রতিহত করার জন্যই নির্মিত হইয়াছিল—কিন্তু তাহা হইলেও বর্তমান যুগের 'জনতন্ত্রবাদী' শাসকদের কাছে সোলোনের সম্পত্তিবিধানও তিক্ত বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে এথেন্সের রাজশক্তিও বর্তমানকার জনতন্ত্রের মত† জনতাকে এত কাবুতে রাখিতে পারে নাই।

(খ) **সক্রেতিস**[১]—সোলোনের বর্গসমন্বয় প্রচেষ্টায় জনসাধারণ নিশ্চয়ই কিছুটা প্রভাবিত হইয়াছিল—কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থের সমাজে এই প্রভাবও বেশি দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। সোলোন সমাজব্যাধিব মূল উৎপাটন না করিয়া তাহাব পত্র ছেদন করিতে গিয়াছিলেন—এইজন্য সমাজকে সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে নাই। পরবর্তী সময়ে সক্রেতিস এই দিক দিয়া সোলোন অপেক্ষা আরও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় দেন :—সক্রেতিস মূলত দার্শনিক হইলেও তাঁহার সমাজব্যবস্থা সম্পর্কিত মতামত শুনিয়া শাসকবর্গ বিচলিত হইয়াছিলেন। সক্রেতিসের মতবাদ অনেকটা তাঁহার শিষ্য প্লেটোর মতবাদেরই অনুরূপ—তবে প্লেটো সক্রেতিস অপেক্ষাও এই বিষয়ে অধিক প্রগতিশীল ছিলেন। যাহাই হউক, সক্রেতিসের মতবাদে শাসকবর্গ যে কত ভীত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে বিষ দিয়া হত্যা করিবার ব্যাপারেই বোঝা যায়। সক্রেতিসের বিরুদ্ধে শাসকদের অভিযোগ ছিল—তিনি তরুণদিগকে বিপথগামী করেন ; এবং আর একটি অপবাদ এই—তিনি দেশধর্মের বিরোধী প্রচার করেন : আজও সমাজের বৈষম্য দূর করিয়া সমাজকে সুখী ও সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে শাসকবর্গের কোপভাজন হইতে হয় ; তাই দেখিতেছি, প্রাচীন এথেন্সের সমাজ হইতে বর্তমান সমাজ এই বিষয়ে বেশি অগ্রসর হয় নাই—আর ফ্যাসিস্ট শাসকরা ত এথেন্সকে ছাড়াইয়া আরও বহু দূর পিছনে চলিয়া গিয়াছে—এমন কি আদিম নরভোজী সমাজের সঙ্গে তুলনা করিলেও ফ্যাসিস্ট ক্রূরতার ঠিক উপমা হয় না।

(গ) **প্লেটোর[২] স্বপ্নরাজ্য**—প্লেটোর বিচারের উপর তাঁহার দার্শনিক মতগুরু সক্রেতিসের স্পষ্টতই যথেষ্ট প্রভাব ছিল—ইহা ছাড়া, গুরুর প্রতি তৎকালীন শাসকদের ক্রূর আচরণ হইতেও তিনি গভীর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সক্রেতিস নিজে অবশ্য কোন পুস্তক প্রণয়ন করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই—তাই অন্যের, বিশেষত প্লেটোর, গ্রন্থাদি হইতে তাঁহার মত ও বিচারের পরিচয় লইতে হয়। প্লেটো এথেন্সের সমাজবিন্যাসের আভ্যন্তরীণ অন্যায় ও ক্রটি বিশেষভাবে

† জনতন্ত্রী ইংলণ্ড আমেরিকা।

১। ৪৭০–৩৯৯ খ্রীঃ পূঃ ; ২। ৪২৭-৩৪৭ খ্রীঃ পূঃ।

লক্ষ্য করিয়াছিলেন তখন এথেন্সের শাসক নির্বাচন করিবার সময় জনসাধারণের ভোট গ্রহণ করিবার রীতি ছিল; কিন্তু প্লেটো শাসক সম্প্রদায়ের ত্রুটির সঙ্গে এই জনসত্তাক রীতিকেও নিন্দনীয় বিবেচনা করেন। তিনি পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্র বা প্রজাতান্ত্রিক শাসনের প্রচলন সম্পর্কে কোন আশা পোষণ করিতেন না। এইজন্য সমাজের উপযোগী শাসনবিধান নির্মাণ না করিয়া তিনি তাঁহার দর্শনের মতই নভোচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্লেটোর দর্শনে দুইটি স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন জগত আছে: তাহার একটি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল, এবং তাহা বস্তুজগত কিংবা ভৌতিক জগত; কিন্তু অপরটি সম্পূর্ণ অপরিবর্তনশীল, অর্থাৎ সেই জগত নিত্য এবং একরস। প্লেটো তাঁহার একরস নিত্য জগতকে বস্তু জগতের উর্ধ্বে স্থাপনা করিয়া তাহাকে "বিজ্ঞানময়" আখ্যা দিয়াছেন।

এখানে লক্ষণীয়, প্লেটো সমাজ আদর্শ সম্পর্কে চিন্তা করিতে গিয়াও তাঁহার অবাস্তব জগতকে ভুলিতে পারেন নাই। সমাজের ত্রুটি এবং তাহার নিবারণের উপায় আবিষ্কার করিতে করিতেও তিনি কল্পলোকে ঘুরিয়া মরিয়াছেন। তাঁহার সমাজবিধানও এই কারণেই লৌকিক সমাজের উপযোগী না হইয়া এক স্বপ্নরাজ্যেব কল্পনা হইয়া রহিয়াছে। প্লেটোর আদর্শ সমাজেও বর্গ আছে, সেখানে বর্গের সংখ্যা মোট তিনটি; ইহার প্রথমটি 'সত্য সংরক্ষক' বা শাসক, এবং দ্বিতীয়টি 'শাসন-সহায়ক' বা যোদ্ধা, এবং সর্বশেষে তৃতীয়টি 'শিল্প সঞ্চালক' অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমজীবী প্রভৃতি। বেদের পুরুষসূক্তের মত প্লেটোও দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন বর্গের তুলনা করিয়াছেন; এবং তিনিও ভারতীয় শাস্ত্রকারের মত প্রত্যেক বর্গকে আপন আপন কর্তব্যে নিযুক্ত থাকিতে নিদেশ দিয়াছেন। প্লেটোর বিধান মতে তাঁহার বর্গব্যবস্থাও তাঁহার দর্শনের একরস জগতের মতই নিত্য, অর্থাৎ তাঁহার এই ত্রিবর্গ আবহমান কাল ধরিয়া সমাজে বিরাজ করিতে থাকিবে, ইহাতে কোন পরিবর্তন চলিবে না। যাহাই হউক, প্লেটো তাঁহার ত্রিবর্গের শ্রমবিভাগ সম্পর্কে এইরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন—(১) সাধারণ মানুষ অর্থাৎ শিল্পী ও কৃষকেরা নিজের ক্ষেত খামার ও শিল্পের জন্য শ্রম করিবে; অক্ষর পরিচয়ের অতিরিক্ত তাহাদের আর কোনও বিশেষ শিক্ষাদি লাভের প্রয়োজন নাই; তারপর, শাসক নির্বাচন বা শাসন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই ইহাদের কোন প্রকার হাত থাকিবে না। (২) যোদ্ধার কর্তব্য হইবে দেশের শান্তি ও সমাজব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখা, এবং প্রয়োজন হইলে বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা। জনসংখ্যা বাড়িলে নূতন ভূমির জন্যও আবার যুদ্ধ আবশ্যক হইতে পারে—কিন্তু এইজন্য আক্রমণাত্মক এবং রক্ষাত্মক দুই প্রকার যুদ্ধেই যোদ্ধাকে অভ্যস্ত হইতে হইবে। যোদ্ধারা যাহাতে এই সব কর্তব্যের

সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়, এই জন্য তাহাদিগকে খুব ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে; কিন্তু যোদ্ধার শিক্ষা এইরূপ হইবে—যাহাতে সে অস্ত্রচালনায় নিপুণ হয়, যাহাতে সে নির্ভয় হয়, প্রয়োজন মত নির্দয়ও হয়। (৩) শাসককে সর্বদাই শিক্ষিত ও উচ্চ বংশজাত হইতে হইবে—'সত্য-সংরক্ষণ' বিষয়ে তাহার যোগ্যতা থাকা চাই; ইহার উপর দর্শন এবং কলাদি শাস্ত্রেও তাহার অধিকার দরকার; শাসক কখনও স্বার্থী, বিলাসী বা মদ্যপ হইবে না, অহম্মন্যতা শাসকের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; শাসক সর্বদা সমাজের হিতকারী হইবে—রাজ্যের অহিতকর সমস্ত কর্ম শাসকের পক্ষে নিন্দনীয়।

প্লেটো তাঁহার শাসকদের শিক্ষার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট প্রণালীও নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন:—এই প্রণালী অনুসারে ভাবী শাসককে সর্বপ্রথম সাধারণ শিক্ষায় নিযুক্ত করা হইবে, বিশ বৎসর বয়সে শাসক এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহার বিশেষ শিক্ষা আরম্ভ হইবে; বিশেষ শিক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জ্যোতিস্তত্ত্ব, অঙ্কগণিত ও রেখাগণিতের চর্চা চলিতে থাকিবে—তাহার পর ত্রিশ বৎসর বয়সে বিশেষ শিক্ষার ব্যুৎপত্তি বুঝিবার জন্য শাসকের আবার পরীক্ষা হইবে; এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে শাসককে একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর দর্শন অধ্যয়ন করিতে হইবে—অবশ্য এখানে স্মরণীয় যে, এই দর্শন প্লেটোর 'বিজ্ঞানময়' জগতের দর্শন, ইহার সহায়তায় শাসক প্লেটোর মতই স্বপ্নাশ্রয়ী হইতে পারিবে।

এইভাবে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় শাসকের সত্যকার সার্বজনিক জীবন আরম্ভ হইবে—এবং তখন হইতে তিনি সমাজের 'সাধারণ অধিকারী', হিসাবে পরিগণিত হইবেন। এই সময়ও তাঁহাকে তাঁহার সিদ্ধান্তিক শিক্ষা সম্পর্কিত পরীক্ষা* দিতে হইবে; ইহার সঙ্গে সঙ্গে তখন তাঁহাকে বিবিধ প্রলোভনে অবিচলিত থাকিতেও অভ্যস্ত হইতে হইবে। ইহার পর 'নাগরিক অধিকারী' হইবার জন্য শাসককে আরও কয়েক বৎসর অনবরত পরীক্ষা দিতে হইবে—এবং সর্বান্তে আরও তিন প্রকারের অন্তিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি শাসক পদবাচ্য হইবেন। এই সর্বশেষ পরীক্ষাগুলির প্রথমটি হইবে তর্কসম্বন্ধীয়—এই পরীক্ষায় সেবাই যে প্রত্যেক ব্যক্তির, বিশেষত শাসকদের পক্ষে প্রধান কর্তব্য—তাহা যুক্তি দিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়। দ্বিতীয় পরীক্ষা শাসকের মতবাদের নির্ভীকতা সম্পর্কে—ইহার প্রয়োজন এই যে, নিরপেক্ষভাবে মত ব্যক্ত করিলে, কিংবা তাহাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গেলে উচ্চবর্গের সঙ্গে

* এখন হইতে সমস্ত পরীক্ষাই পূর্বার্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে, অর্থাৎ শাসক 'সাধারণ অধিকারী' হইবার পর সমস্ত পরীক্ষাই ব্যবহারিক পরীক্ষা।

শাসকের বিরোধিতার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু যিনি শাসক হইবেন তাঁহার এই বিরোধিতা জয় করিয়া যাওয়ার ক্ষমতাও থাকা চাই। তারপর তৃতীয় পরীক্ষা শাসকের শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনার বিষয় লইয়া—শাসক এই ক্ষেত্রে সমস্ত কায়িক সুখ বিসর্জন দিয়া 'সমাজ সংরক্ষক' পদের জন্য তিনি কত উপযুক্ত তাহা প্রমাণ করিবেন।

কিন্তু সংরক্ষকের পদ পাইবার পরও শাসক প্রলোভনের শিকার হইয়া পড়িতে পারেন।* এইজন্য প্লেটোর বিধান হইল সামান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া শাসকের আর কোনরূপ ব্যৈক্তিক সম্পত্তি থাকিবে না। এমন কি সংরক্ষকদের বাসের জন্য কোন ব্যক্তিগত ঘরবাড়ীরও বন্দোবস্ত হইবে না—রাজ্যের সকল সংরক্ষক একস্থানে বাস করিবেন এবং একসঙ্গে আহার করিবেন। রাজ্য হইতে তাঁহারা খরচপত্র নির্বাহের জন্য মাত্র একটি নির্ধারিত মাসোহারা পাইবেন—কিন্তু কোনক্রমেই এই মাসোহারার অতিরিক্ত অর্থ তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। শাসকের পক্ষে স্বর্ণ-রৌপ্যের কোন ভূষণ ত দূরের কথা, সোনারূপা স্পর্শ করাও তাঁহাদের পক্ষে পাপ।† শাসক ভাবিবেন যে তিনি স্বয়ং ঐশ্বরিক স্বর্ণরৌপ্যে গঠিত হইয়াছেন। তাই তুচ্ছ সাংসারিক সোনাচাঁদিতে তাঁহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্লেটো শাসককে দিয়া শুধু কাঞ্চন ত্যাগ করাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই—তাঁহার লক্ষ্য আরও দূরপ্রসারী—অর্থাৎ তাঁহার মতে কাঞ্চনের মত কামিনীতেও শাসকের কোন ব্যৈক্তিক অধিকার থাকিবে না। শাসক বিবাহ করিলে তাঁহার স্ত্রীর উপর সকল শাসকেরই সমন্বিত অধিকার থাকিবে।§ প্লেটোর সমকালীন প্রজাতন্ত্রী শাসকেরা নিজেদের ব্যৈক্তিক সুখভোগের জন্য কোন অন্যায় করিতেই দ্বিধা করিত না। নিজের পুত্র, কন্যা, স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনের সুখের জন্য তাহারা নিম্নতর বর্গের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিত। প্লেটো এই অত্যাচার ও অবিচার দমন করিবার জন্যই তাঁহার আদর্শ সমাজের শাসকদের পালনীয় নীতিগুলিকে কঠোর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

প্লেটোর সম্মুখে সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন এই যে, এথেন্সের প্রজাতন্ত্রী নাগরিক

---

* এমন কি তখন তাহার সম্ভাবনা আরও বেশি; তুলসীদাস এই সম্পর্কে বলিতেছেন, 'প্রভুতা পাই কাহ মদ নাহী'—অর্থাৎ প্রভুতা পাইলে কে না মত্ত হয়।

† সংরক্ষকদের জন্য নির্ধারিত এইরূপ আর্থিক সাম্যবাদ বুদ্ধমতের অনেকটা অনুরূপ; বুদ্ধও ভিক্ষুকদিগকে সোনারূপা স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এবং সর্বপ্রকার ব্যাপার-ব্যবসায় এবং মুদ্রাদির ব্যবহার বর্জিত করিয়া দিয়াছেন (সংস্কৃত বিনয় পিটক দ্রষ্টব্য)।

§ অর্থাৎ শাসকদের জন্য প্লেটো আদিম যূথবিবাহের পুনঃপ্রচলন করিতে চাহিয়াছিলেন;

তাহাদের শাসক নির্বাচন ক্ষমতা* বিসর্জন দিয়া স্বেচ্ছায় সমাজের নিম্নবর্গে স্থান লইবে কেন? এই সম্পর্কে প্লেটোর উত্তর হইতেছে—সাধারণ নাগরিকদিগকে ইহার উপযুক্ত হইবার জন্য শিক্ষা দাও, এবং এইভাবে ক্রমে জনসম্মতিকে তোমার স্বপক্ষে আনয়ন কর; তাহাদিগকে অবিরত বল, সমস্ত নাগরিক সেই ধরিত্রী মাতারই সন্তান।† ইহাতে মানুষ যে জন্মত একই প্রাণী তাহা তাহারা সহজেই বুঝিবে—কিন্তু ইহার সঙ্গে আবাব এই কথাও বলিতে হইবে, ধরিত্রী মাতা সকলকে এক উপাদানে নির্মাণ করেন নাই—অর্থাৎ ভিন্ন বর্গের মানুষে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর মিশাল দিয়াছেন: আর যাহাদিগকে সৃষ্টি করিতে মাটির সঙ্গে‡ সোনা মিশানো হইয়াছে—তাহারাই শাসন করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন হয়—ইহারাই সমাজের শাসক বা 'সত্য সংরক্ষক'; আর যাহাদের শরীরে ধরিত্রী মাতা রূপা মিশাল দিয়াছেন—তাহারা সমাজের যোদ্ধা বা 'শাসন সহায়ক' হইতে পারে; কিন্তু সাধারণ মানুষকে সৃষ্টি করিবার সময় সোনা রূপার বদলে লোহা ও পিতল মিশান হইয়াছে—এইজন্য তাহারা শুধু শিল্পীই হইতে পাবে, অর্থাৎ শারীরিক শ্রম ছাড়া তাহাদের আর অন্য কিছুরই যোগ্যতা নাই। কিন্তু প্লেটোর এই উত্তরের পরও আবার এক প্রশ্ন থাকিয়া যায়—সাধারণ মানুষ এই উদ্ভট উপাখ্যানে বিশ্বাস করিয়া নিম্নতর বর্গে যাইতে স্বীকৃত হইবে কেন? এই প্রশ্নের খণ্ডনে প্লেটোর নিজের চরম উত্তর হইতেছে—শিশুকাল হইতে মানুষকে এই স্বর্ণ-রৌপ্য-লৌহ-পিত্তলের উপাখ্যানটি শুনাও—তাহা হইলেই তাহারা আমার আদর্শ সমাজের বর্গবিন্যাস মানিয়া লইবে। প্লেটো দেখিয়াছিলেন এথেন্সবাসীরা ধর্ম ও দেবতা বিষয়ক বহু অলৌকিক কাহিনী বিশ্বাস করে§—শিশুকাল হইতে শুনিতে শুনিতে এই সব কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে তাহারা আর সন্দেহ করে না। এই ক্ষেত্রে লক্ষণীয় প্রোপাগাণ্ডা শুধুমাত্র আধুনিক সমাজেরই একচেটিয়া বিশেষত্ব নয়, দার্শনিক প্লেটোও মিথ্যাকে সত্য করিবার কৌশল চমৎকারই জানিতেন—এবং তাহার মূল্যও আধুনিক কূটনীতিকের মতই তিনি সম্যক উপলব্ধি করিতেন; তবে প্লেটোর এই জ্ঞান সেই সময়ের এথেন্সীয় সমাজ-বীক্ষণেরই যে ফল তাহাও ভুলিলে চলিবে না।

---

* অনেক ক্ষেত্রে শাসক পরিবর্তনের ক্ষমতাও;

† অর্থাৎ মানুষের দেহের মূল উপাদান মাটি, ইহা সকল বর্গের মানুষের মধ্যেই আছে—এই হিসাবে জন্মত, কিংবা বলিতে পারি মূলত, মানুষ এক।

‡ অর্থাৎ মূল উপাদানের সঙ্গে;

§ ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও এখন পর্যন্ত ধর্মসংক্রান্ত বহু অলৌকিক কাহিনীই বিশ্বাস করেন।

প্লেটো অন্যান্য কাজের সঙ্গে সমাজের শিশুদিগকে ধাতু অনুসারে বর্গীকরণের ভারও শাসকদের উপরই দিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে লৌহ-পিত্তল বর্গের শিশুও অনেক স্থলে প্রতিভাবান্ হয়—এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের বংশজাত সন্তান নিম্নতর বর্গের গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। হিন্দুদের চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা হইতে এই দিক্ দিয়া প্লেটোর মত অবশ্য অনেক গুণে উদার—কারণ তিনি মানুষের গুণকে কখনও বংশগত বলিয়া স্বীকার করিতেন না—তাঁহার সমাজে প্রতিভা থাকিলে নিম্ন বর্গের শিশুও উচ্চতর বর্গের অধিকার পাইতে পারিত। তবে বর্গসংস্থানের দিক হইতে প্লেটোর এই সংরক্ষকেরাও হিন্দুব্যবস্থার ব্রাহ্মণেরই মত—এবং তাহার সহায়কেরাও এই দিক্ দিয়া ক্ষত্রিয় এবং শিল্পীরা বৈশ্যবর্গেরই অনুরূপ। প্লেটোর বর্গবিন্যাসে অপর বিশেষত্ব হইতেছে যে তাহাতে দাসদের কোনপ্রকার স্থান নাই; বস্তুত পক্ষে প্লেটো দাসদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হউক ইহা কামনাও করিতেন না। বুদ্ধিবলহীন শিশু তাই প্লেটোর মতে সমাজের ভার স্বরূপ বলিয়াই প্রতীত হইয়াছিল; যোগ্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের শক্তি বা সময় ইহাদের জন্য অপব্যয়িত হয়—ইহা প্লেটো তেমন চাহিতেন না। তাই 'আদর্শ রাষ্ট্রের' কল্যাণে ইহাদের অন্ন কাড়িয়া লওয়ার বিধান দিতেও* প্লেটোর কোন কুণ্ঠা হয় নাই।

প্লেটো ধনাঢ্যতা ও দরিদ্রতা** এই দুই অবস্থাকেই সমাজের পক্ষে হানিকর বিবেচনা করিতেন। তিনি বলিতেন, দরিদ্রতা মানুষকে নীচতা শিখায়, এবং ধনাঢ্যতাও সেইরূপ ব্যসন ও আসক্তির সৃষ্টি করে। তাঁহার সমকালীন ধনিক সম্প্রদায় সম্পর্কে প্লেটো লিখিয়াছেন, 'রাজ্যকে সম্পত্তির আধারের উপর স্থাপিত করিলে, অধিকার ধনীদের হাতে চলিয়া যায়; ইহাতে সকল সৎকর্মের মত দরিদ্রেরা ধনীর নিকট হইতে শুধু উপেক্ষাই পাইতে পারে। কিন্তু রাজ্যে কোন আকস্মিক সঙ্কট আসিলে এই নিম্নবিত্তেরা তখন আর ধনীর ঘৃণার পাত্র থাকে না—এই সময় দরিদ্রদিগকে ধনীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই তাহার উচ্চবর্গের স্বার্থে নিজের জীবনপাত করিতে হয়। এথেন্সের জনসত্তাকতার ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট স্বরূপ হয়ত আর কিছুই নাই'...ইহার পর প্লেটো তাঁহার পূর্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রেও দেখি দরিদ্রই ধনীর তুলনায় সর্বত্র অধিক রণক্ষমতার পরিচয় দিতেছে, আর ধনী সূর্যস্পর্শ-মুক্ত মেদভার লইয়া কিছুতেই তাহার সমকক্ষ হইতে পারিতেছে না।' প্লেটো ধনিক বর্গের প্রসঙ্গ আলোচনায় ইহাও বলিয়াছেন, 'সমাজে বহু ব্যক্তিই অন্যে তাহার ধন কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে না বলিয়াই শুধু ধনী হইয়া রহিয়াছে,'—

* অবশ্য প্লেটো ইহা কৌশলে, লোকদৃষ্টির অন্তরালে, সু-ধীরে করিতে নির্দেশ দিয়াছেন;

** অর্থাৎ অতি ধনাঢ্যতা ও অতি দরিদ্রতা।

অর্থাৎ প্লেটোর মতে জনসত্তাক এথেন্সের ধনী বর্গের ধনী হইবার মত কোনরূপ সদ্‌গুণই বর্তমান ছিল না। প্লেটো দারিদ্র্যের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনটি বিষয়ে অবহিত হইবার নির্দেশ দিয়াছেন—(১) উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, কিংবা (২) কুশিক্ষা বা কুব্যবস্থা, এবং সর্বশেষে (৩) অন্যায় সামাজিক নিয়ম ও অন্যায় রাজ্যবিধান। ইহা ছাড়া দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য প্লেটো তাঁহার 'আদর্শ সমাজে' প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তির একটি নিম্নতম পরিমাণও নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহার পর ব্যক্তি তাহাকে তাহার সুবিধামত চতুর্গুণ বর্ধিত করিয়া লইলেও রাষ্ট্র কোন আপত্তি করিবে না—তবে তখন তাহার পূর্ব সম্পত্তির উপর শত শত হারে কর ধার্য করিয়া পুরাতন আয় হইতে তাহাকে রক্ষিত করা হইবে। দায়ভাগ সম্পর্কে প্লেটো বলিতেন, সন্তানকে পিতা-মাতা কোনরূপ সম্পত্তি দিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই—তাহারা তাহাকে শুধু যশ ও সম্মান দিয়া গেলেই রাজ্যের পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্লেটো এথেন্সের জনসত্তাক শাসনের মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না; এথেন্সের জনতন্ত্র তাঁহার গুরুকে যে ভাবে হত্যা করিয়াছিল—ইহা তিনি জীবনে কখনও বিস্মৃত হন নাই। বৈয়ক্তিক সম্পত্তির বলে শাসক যে লোভী ও ন্যায়ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে ইহা অবশ্য প্লেটো স্বীকার করিতেন—কিন্তু শুধু ইহার জন্য সাধারণ জনতার হাতে শাসন ছাড়িয়া দিতেও তিনি স্বীকৃত ছিলেন না। জনতার শাসন সম্পর্কিত যোগ্যতার উপর প্লেটোর প্রকৃতপক্ষে ঘোরতর অবিশ্বাস ছিল; তিনি সমাজকে বহু ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র বলিয়া মনে করিতেন—তাই ব্যক্তির নিজস্ব ব্যবহার ও সমাজগত ব্যবহারে যে ভেদ আছে তাহা তিনি বুঝিতেন না—অর্থাৎ ব্যক্তির পৃথক্ নির্ণয় ও সামাজিক নির্ণয়ের পার্থক্য তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল; আর এই কারণেই প্লেটো এথেন্সের জনসত্তাক শাসন পরিবর্তন করিয়া ইহার স্থলে পিতৃসত্তার বিধান চালাইতে চাহিয়াছিলেন। য়ূনানী সমাজে পিতৃসত্তাকাল অবশ্য ইহার বহু পূর্বেই অতীত হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু তাহা হইলেও প্লেটোর সময় ইহার স্মৃতিও যে একেবারে মুছিয়া গিয়াছিল এইরূপ মনে হয় না।

(৬) **মধ্যকালীন য়ুরোপ**—মধ্যকালীন য়ুরোপের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় খ্রীষ্টীয় পুরোহিতেরা তখন সমাজে প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন; অথচ খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর রোমের দরিদ্রদের প্রতি ইহাদের যে সহানুভূতি দেখা গিয়াছিল তখন তাহার অবশিষ্টও আর বর্তমান ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দে খ্রীষ্টবাদ সমগ্র য়ুরোপে সামন্তবাদের অন্যতম প্রধান শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।*

* ইহার ফলে দরিদ্রেরা ধার্মিক ক্ষেত্র হইতে তখন সহজেই ও স্বভাবতই বিতাড়িত হয়, এবং ধর্মসংশ্লিষ্ট শক্তি ও সম্পত্তি সমুদয় খ্রীষ্টীয় মঠের মোহান্তদের হাতে চলিয়া যায়।

রোম রাজ্যের পতনের সময় একদিন অবশ্য দেখা গিয়াছিল খ্রীষ্টবাদ সম্পত্তিকে ধিক্কারই দেয়; কিন্তু সামন্তশক্তি লাভ করিবার পর মধ্যযুগে আসিয়া সম্পত্তিই তাহার সর্বপ্রধান কাম্য হইয়া উঠে। পূর্বে সমাজ হইতে দারিদ্র্য দূর করা খ্রীষ্টপন্থীদের একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত—আর এখন ধর্মের নূতন ব্যাখ্যায় সেই দারিদ্র্যই নিঃসঙ্কোচে ভগবানের দান বলিয়া গৃহীত হইল; তবে অবশ্য দরিদ্রের জন্য যৎসামান্য উঞ্ছ, ভুক্তাবশেষ কিংবা মুষ্টিভিক্ষার বিধান করিতে খ্রীষ্টসমাজ কার্পণ্য করে নাই—কারণ, এইটুকু না হইলে সমাজের ধনীদিগকেও তাহাদের পুণ্যার্জনের সুযোগ হইতে একেবারে বঞ্চিত করা হয়।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন সমাজ বিশেষ করিয়া কৃষির উপর ব্যবস্থিত ছিল। সেই সমাজে মূলত সামন্ত, মোহান্ত এবং কৃষক এই তিনটি পৃথক্ পৃথক্ বর্গ দেখা যাইত। ইহার মধ্যে সামন্তেরা শাসক, সেনানায়ক এবং স্বয়ং ভূমির কর্তা হইত; আর মোহান্তেরা তখন হইত এই সব সামন্তেরই অধীনস্থ প্রজা, বা মঠের সম্পত্তি কবলিত করিতে পারিলে খোদ সামন্তই হইয়া বসিত। বলা বাহুল্য, কৃষকের অবস্থা এই সময়ে খুব খারাপই ছিল, কারণ তাহারা তখন সমাজের সর্বাপেক্ষা অধঃপতিত বর্গ—নিজের কায়িক শ্রমে ধন উৎপাদন করিয়া ইহারা প্রভু সামন্ত ও মোহান্তের উদর পূরণ করিত। ইহার পরিণামে আমীর বা সামন্তের নিকট হইতে ইহাদের ঘৃণার অতিরিক্ত অবশ্য কিছুই জুটিত না—শক্তিধর দেবতা ও মানুষের সম্মিলিত বলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতা তখনও তাহাদের ছিল না। কৃষক তখন সম্পূর্ণভাবেই তাহাদের সামন্ত ও মোহান্ত প্রভুদের অর্থদাস ছিল—অর্থের বিনিময়ে সে তাহাদের নিকট নিজের প্রাণ বেচিত, মান বেচিত। সমাজের নিম্নবর্গের মধ্যে তখন কৃষক ছাড়া আর একটি ক্ষুদ্র বর্গেরও সৃষ্টি হইতেছিল—ইহারা হইতেছে মধ্য যুগের নবজাত কারিগর ও ব্যবসায়ীর দল। নিজেদের পেশার বিষয়ে ইহারা অন্য কোন বর্গেরই বিশেষ এলেকা রাখিত না; ব্যবসায় সংক্রান্ত কলহাদি[১] মিটাইবার জন্য ইহারা নিজেদের সংঘ অর্থাৎ পঞ্চায়েত তৈয়ার করিয়া লইয়াছিল —সামন্তের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলে ইহারা স্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইত—ইহাতে তাহাদের তেমন বিশেষ কোন অসুবিধা যে হইত তাহা নহে, কারণ ব্যবসায়ী ও কারিগরের তখন সকল দিকেই খুব কদর ছিল,

---

১। এই কলহ নিজেদের সংঘেরই আভ্যন্তরীণ কলহ, কিংবা অপর সংঘের সঙ্গে কোনরূপ বাহ্যিক কলহ, অথবা দেশের বা বহির্দেশের সামন্তস্বার্থের সঙ্গে কলহ;

আর ভূসম্পত্তি না থাকায় পিছনের আকর্ষণও তাহাদের তেমন কিছু প্রবল ছিল না।

মধ্যকালীন য়ুরোপে এইরূপ সামাজিক বর্গপার্থক্য প্রকৃতই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, সামন্ত মোহান্তের ভব্য প্রাসাদ ও গীর্জার পাশে কৃষকের দারিদ্র্যকে তখন আর উপেক্ষা করা যাইতেছিল না। দয়া-ধর্মের ধ্বজাবাহী খ্রীষ্টীয় যাজকদের মধ্যেও এই অবস্থা কেহ কেহ উপলব্ধি করিতেছিলেন—সন্ত ফ্রান্সিস অসীসী[১] প্রমুখ কয়েকজন সাধু তাই মঠের নিশ্চিন্ত জীবন ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন—এইরূপ সন্ত মোহান্তের সংখ্যা অবশ্য অঙ্গুলিপর্বেই গুণিয়া লওয়া যায়। তবে ইঁহাদের স্বেচ্ছাদারিদ্র্যের ফলও খ্রীষ্টধর্মের পক্ষে খুবই অনুকূল হইয়াছিল—পূর্বে মোহান্তদের বিলাসব্যসন দেখিয়া লোকে ধর্মের প্রতি প্রায় উদাসীন হইয়া পড়ে; এখন মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসীর ত্যাগে তাহারা আবার ধর্মাচরণের প্রেরণা পায়।

একাদশ শতাব্দীর পূর্বে কয়েক শতাব্দ খ্রীষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ চলিতেছিল। তখন খ্রীষ্টীয়েরা মুসলমান তীর্থ জেরুজালেম দখল করিবার জন্য বহুবার অভিযান করে।* এই যুদ্ধের মধ্য দিয়া অন্যান্য দেশের সঙ্গেও খ্রীষ্টানদের সম্পর্ক স্থাপিত হইতে থাকে। ইতিমধ্যে মুসলমানেরা বাগদাদ ও স্পেন জয় করিয়া সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনাদির চর্চা আরম্ভ করে—এইরূপ দর্শনের চর্চা প্রথমত প্রাচীন য়ুনানী দর্শনের অনুবাদ ও অধ্যয়নের মধ্য দিয়া শুরু হয়;—কিন্তু তাহাতেই মধ্যযুগীয় য়ুরোপের এক নূতন ও স্বতন্ত্র সমাজ-চিন্তার সূত্রপাত ঘটে। খ্রীষ্টান দার্শনিক টমাস অক্বিনা† এবং আরও চিন্তাশীল ব্যক্তি এই সময় জন্মগ্রহণ করেন। অক্বিনা য়ুনানী, বিশেষত এরিষ্টটলের, দর্শনের ভিত্তিতে খ্রীষ্ট সমাজের এক নূতন চিন্তার প্রবর্তক হন। তাই বলিয়া তিনি যে কোন বিশুদ্ধ য়ুনানী মতবাদের প্রচারক ছিলেন ইহা নহে—অক্বিনা য়ুনানী দর্শনের যুক্তি গ্রহণ করিয়া সেই দার্শনিক পদ্ধতিতে খ্রীষ্টবাদের সেবায় লাগাইয়াছিলেন। শাসক ও শোষিতের পারস্পরিক বিদ্বেষ দেখিয়া অক্বিনা চক্ষু মুদিয়া থাকিতে পারিতেন না—এইজন্য তাঁহার দর্শনে শোষিতদের প্রতি সহানুভূতির কথা থাকাও স্বাভাবিক। এরিষ্টটলের মত এই মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টীয় দার্শনিকও বলিয়াছেন: 'মানুষ স্বভাবতই এক সামাজিক পশু; ভগবান তাহাকে সমাজে থাকিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; সমাজে না থাকিলে সে সুখী হয় না····কিন্তু সমাজ শাসন ছাড়া হইতে পারে না—তাই সমাজের জন্য শাসনযন্ত্রেরও প্রয়োজন····নিশ্চিন্ত আরামে

১। ১১৮২-১২২৬ খ্রীঃ।

* এই সব অভিযান য়ুরোপ হইতে হইয়াছিল; † ১২২৫-১২৭৪ খ্রীঃ।

জীবনযাপন করা কিংবা শুধু ধন বৃদ্ধি করা—মানুষের উদ্দেশ্য হইতে পারে না.... শুধু লোভী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির নিকটই ইহা ভাল লাগিতে পারে।'

মোর তাঁহার উটোপিয়ায় পনর ষোল শতাব্দীর ইংলণ্ডের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা মর্মস্পর্শী। সে সময়ের ভারতের কথা স্মরণ করিলে তাহাকে ইংলণ্ডের তুলনায় কিছুটা অগ্রসরই দেখা যায়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মধ্যযুগে ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র ও কৃষক ছিল, আর তাহার উপর বেকারের সংখ্যাও তখন ছিল যথেষ্ট। ইংলণ্ডের দণ্ডব্যবস্থা যে তখন কত ভয়ঙ্কর ছিল তাহা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়—সাধারণ চৌর্যের অপরাধে মধ্যযুগীয় য়ুরোপে অপরাধীর প্রাণদণ্ডের বিহিত হইত। অবশ্য বুদ্ধকালীন ভারতেও তস্করকে এইরূপ মৃত্যু-দণ্ড দিবারই বিধান ছিল; মুসলমানী শাসনের সময় চোরের প্রাণদণ্ড রদ করিয়া তাহার হাত কাটিয়া দিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু য়ুরোপে তখনও ক্ষুধিত ব্যক্তি এক টুকরা রুটি চুরি করিলে তাহার মৃত্যু ভিন্ন গতি থাকিত না। আর চোরেরাও এই কারণে কৃতকর্মের সাক্ষী না থাকার জন্য গৃহস্বামীকে প্রায়ই হত্যা করিয়া ফেলিত।

২। বিকাশক্রম

ভিন্ন ভিন্ন যুগের সামন্তবাদী সমাজের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা এই অধ্যায়ে কিছু কিছু আলোচনা করিলাম। এই সময় শোষক ও শোষিতের আর্থিক তারতম্য যে কত বড় হইয়া উঠিয়াছিল ইহাতে তাহারই কতক আভাস পাওয়া যায়। সামন্তযুগে ধনের পরিমাণ যে বাড়িয়াছিল এই বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই—কিন্তু যাহাদের অক্লান্ত শ্রমে এই ধনের সৃষ্টি সেই শ্রম-জীবীদের তাহাতে কিছুমাত্র সুবিধা ছিল না। সামন্তযুগে এক বর্গের সুখসমৃদ্ধির অনুপাতে অপর বর্গ অর্থাৎ কৃষকশ্রমিকের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছিল। ইহা এক সময় শোষিতদের সহের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়া সমাজবিদ্রোহের রূপও লইতে পারিত—কিন্তু শাসক-সামন্ত এই বর্গদ্বেষের পরিণাম বুঝিয়া পূর্ব হইতেই তাহার প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। সামন্তযুগে শ্রমিকশক্তিকে করগত রাখিবার জন্য শাসনযন্ত্রের গঠন পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ দৃঢ় করা হয়; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরলোক প্রভৃতির রক্তচক্ষু দেখাইয়া ইহাদিগকে বিহ্বল করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা চলে; তাহার উপর শ্রমিকদের*

* এই শ্রমিক অর্থে অবশ্য আধুনিক অর্থের শ্রমিক নয়, ইহারা প্রায়ই ভূমিদাস, ভূমিহীন দাস এবং প্রভুর অন্যান্য প্রকারের গোলাম।

নিজ বর্গের মধ্যে বহুস্বার্থ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উপর শক্তি অসংহত করিয়া দেওয়া হয়।

সামন্তবাদ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন যুগের পিতৃসত্তা বা পিতৃবাদেরই রূপান্তর এবং সামন্তশাসকও এই হিসাবে পুরাতন পিতরদেরই বিকশিত সংস্করণ। পিতৃসত্তা হইতে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র এই দুই প্রকার শাসন-প্রণালীর উদ্ভবের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই সকল প্রজাতন্ত্রেরা† নেতা কখনও সমাজের প্রজাসাধারণ হইতে পারিত না—এই প্রজাতন্ত্রের নেতা হইত সর্বদাই ধনী, অর্থাৎ সমাজের সেই উচ্চতর বর্গ। জনযুগের অন্তিম সময়ে আসিয়া সমাজের এককালে প্রজাতন্ত্রের গোড়াপত্তন হইয়াছিল—পরে দাসতাকালে এই জনতন্ত্রের শাসকেরাই প্রভূত ব্যৈক্তিক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া বসে—এইভাবে পরবর্তী স্তরে আবার ইহারাই আর্থিক ও অন্যান্য শক্তিবলে সমাজের সামন্তশাসকে পরিণত হয়। এই সকল প্রজাতন্ত্রেরা‡ রূপ আমরা প্রাচীন এথেন্স, এবং ভারতবর্ষে বৈশালী, কপিলাবস্তু প্রভৃতির সমাজলক্ষণ হইতে জানিতে পারি। তারপর রাজতন্ত্রের রাজা সম্পর্কে বলিতে হয় যে তিনি সামন্তদের প্রভু, কিন্তু আসলে নিজেও তিনি এক সামন্তই—শুধু পার্থক্য এই যে তিনি সকল সামন্তের প্রধান সামন্ত। জাপানের মিকাডোও ঠিক এইভাবেই নিজের দেশের সর্বাপেক্ষা বড় জমিদার—ইংলণ্ডের রাজারও তেমনই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া নিজের জমিদারী আছে; বিলাতী বাদসাহেরা পুঁজিবাদ হইতে লাভ পিটিবার নয়া কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন—বড় বড় কোম্পানী ও কারখানার শেয়ার কিনিয়া তাঁহারা সবাই এখন শিল্পপতি। এই সব আধুনিক সামন্তের* সঙ্গে তাঁহাদের দেশের অন্য জমিদার বা সামন্তের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।** জাপান ও ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সেখানকার শাসন-প্রণালীতে কোন বিশেষ নূতনত্বের চিহ্ন নয়; কারণ নির্বাচনের প্রশ্নটি সেখানে শুধু সাধারণ সভার সদস্যদের সম্পর্কেই সম্ভব হয়—লর্ড ভবনের সদস্যের জন্য কোন নির্বাচন কিংবা এইরূপ অন্য কোন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাই, ইহারা শুধু নিজেদের বিশুদ্ধ বংশক্রমের দাবীতেই ঊর্ধ্ব সভায় আসন গ্রহণ করে—এবং সাম্রাজ্য শাসনের বেলায় ইহারাই সাধারণ সভ্য অপেক্ষা

† অর্থাৎ জনযুগের পরের বৈক্তিক সম্পত্তিসম্পন্ন প্রজাতন্ত্রের; ‡ ব্যৈক্তিক সম্পত্তির প্রজাতন্ত্রের।

* এই আধুনিক সামন্তেরা সামন্তবাদের কোন নববিকাশ নয়, প্রকৃতপক্ষে তাহারা পুরাতন সামন্তবাদের অবশেষ; ** অর্থাৎ ব্যৈক্তিক ধনসম্পত্তির দিক্ দিয়া কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

অধিকতর ক্ষমতাবান হয়। তাই বলিতে পারি—ধনতন্ত্রের মধ্যাহ্নকালেও পুরাতন সামন্তযুগের বংশক্রমিতা সমাজ হইতে একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি সামন্তযুগের রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে কোন বিশেষ মূলগত পার্থক্য নাই—প্রজাতন্ত্রের সামন্তকে শাসক হইবার জন্য তাহার বংশ ও ধনের অতিরিক্ত জনসাধারণের একটা সম্মতি লইতে হইত—তাহা ছাড়া প্রজাতন্ত্রের সামন্তদের নিজ বর্গের মধ্যে আর্থিক বা বংশক্রমিক অসাম্যও তত বেশি রাখা চলিত না ; আর রাজতন্ত্রের ইহা হইতে প্রভেদ এই যে সেখানে সকল সামন্তবংশের গৌরব একরূপ হইত না—তাহাতে একটি বিশেষ বংশ অর্থাৎ রাজবংশ অন্য সকল বংশের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত—এবং ইহাদের রাজক্ষমতাও বংশক্রমে প্রাপ্ত বলিয়া সেখানে রাজার নির্বাচনের কোন প্রশ্ন উঠিত না। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি রাজতন্ত্রের রাজা সামন্তকুলের প্রধান হইলেও তিনি সামন্তই—তাই তিনি নিজ বর্গস্বার্থের খাতিরে সকল সামন্তের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখিতেন—আর ইহারই প্রতিদানে প্রয়োজন হইলে সামন্তশক্তিও সংহত হইয়া সিংহাসনের পিছে আসিয়া দাঁড়াইত।

৩। সম্পত্তি

এই যুগে আসিয়া ব্যৈক্তিক সম্পত্তি মানুষের একটি 'পবিত্র' অধিকার রূপে গণ্য হইয়া যায়। দাসতার সময়ে সম্পত্তির উপর ব্যৈক্তিক অধিকার সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—তখন ইহাকে চিরন্তন বা চিরকালীন বলিয়া ধর্ম বা দেবতার আশীর্বাদের সহিত মিলিত করা যাইত না। ব্যৈক্তিক সম্পত্তি 'পবিত্র' হইয়া উঠার পর ইহার হানিকর সামাজিক অপরাধের* জন্য দণ্ডের বিধান হয়। কিন্তু চৌর্যের জননী দরিদ্রতা না মরিলে অপরাধীর মৃত্যু বিহিত করিয়াই চৌর্য বন্দ করা যায় না। সামন্তযুগের শাসকও যে এই সত্য একেবারে বুঝিতে পারিতেন না ইহা মনে করিবার হেতু নাই। বুদ্ধের এক সমসাময়িক রাজার উপাখ্যানা হইতে আমরা এই বিষয়ে তাঁহার মতামত বুঝিতে পারি :—

"....রাজা ধর্মপথে চলিবার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু দরিদ্রের জন্য ধনের সংস্থান করিলেন না....ইহাতে রাজ্যে দরিদ্রতা আরও বাড়িয়া গেল....লোক পরের ধন অপহরণ করিতে লাগিল···তস্করকে ধরিয়া লোকে শেষে রাজার নিকট লইয়া গেল···রাজা তখন সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি অন্যের ধন অপহরণ করিয়াছ—হে পুরুষ, এই অপবাদ কি সত্য ?'

* চৌর্য প্রভৃতি; † দীর্ঘনিকায় ৩।৩।

'হাঁ দেব, সত্য...'

'কিন্তু কি কারণে?'

'জীবিকা চলিতেছিল না দেব...'

"...রাজা সেই পুরুষকে ধন দেওয়াইলেন...তাহার পর বলিলেন, 'হে পুরুষ, এই ধনে তুমি জীবিকা নির্বাহ কর, পিতামাতার অন্নসংস্থান কর, দয়াপুত্রের প্রতিপালন কর'...রাজ্যের লোক শুনিল রাজা চোরকে ধন দেওয়াইয়াছেন; তখন সকলে ভাবিল, 'আমরাও চুরি করিব'...কিন্তু রাজা আর কত ধন দিবেন? তিনি মনস্থ করিলেন, 'এইভাবে তস্করকে ধন দিলে রাজ্যে চুরি বাড়িয়া যাইবে, এখন হইতে চোরের কঠোর শাস্তিবিধান করিতে হইবে...তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া লইলে রাজ্যে চুরি একেবারে বন্ধ হইতে পারে।'

"রাজার আজ্ঞায় চোরের মুণ্ডচ্ছেদ করা হইল...তখন চোরেরা ভাবিল, 'যে চুরি করে রাজা তাহার শির কাটাইয়া লয়...তাহা হইলে চল আমরাও এখন অস্ত্র শানাই, যাহার চুরি করিব তাহার শিরও কাটিয়া লইব'...এইভাবে লোকে ধীরে ধীরে অস্ত্র শানাইল; পরে শাণিত অস্ত্র লইয়া গ্রাম লুঠ করিল—পদচারী পথিকের মাথা কাটিয়া লইয়া যথাসম্পত্তি অপহরণ করিল..."

বুদ্ধ এই উপাখ্যানে নির্ধনতা দূর করিবার কোন উপায় নির্দেশ করেন নাই। তিনি এখানে শুধু বলিয়াছেন—দণ্ডবিধান করিয়া অর্থবিষম সমাজের অপরাধ দূর করা যায় না। তাঁহার মতে দারিদ্র্য দূর না করিয়া চৌর্যের জন্য শাস্তি দিলে—চুরি দূর হওয়া ত দূরের কথা বরং চৌর্যের সঙ্গে হত্যা ও অন্যান্য অপরাধ আসিয়া মিলিত হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে বৈয়ক্তিক সম্পত্তির জন্য যে পাপ সৃষ্টি হইয়াছিল বুদ্ধ তাহার কতক এইরূপ গণনা করিয়াছেন*:—দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা চুরি, এবং মাপ সংক্রান্ত অন্যান্য চুরি—ইহা ছাড়া ঘুষ, বঞ্চনা, কুটিলতা, কৃতঘ্নতা—এবং ছেদন, বন্ধন, ডাকাতি, লুঠ, রক্তপাত ইত্যাদি।

৪। বাণিজ্য

দাসতা যুগে পৌঁছিয়া অস্ত্রপাতির ও শ্রমের বিশেষরূপ বিকাশ ঘটে—ইহার ফলে সমাজে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়েরও তখন যথেষ্ট উন্নতি হয়। পূর্বে বলিয়াছি, সামন্তযুগ সমাজে নূতন শাসক ও সৈনিক অধিকারীর সৃষ্টি করিয়াছিল—ইহার সঙ্গে পণ্যের উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে এক নূতন বর্গ অর্থাৎ বানিয়া বর্গও সামন্তকালেরই দান। পূর্বে

* দীর্ঘনিকায় ৩।৭।

দুই উৎপাদনের মধ্যে পণ্য বিনিময়ের ব্যাপারটি খুব সুবিধার ছিল না ; কৃষি প্রভৃতি অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকায় পণ্য সওদা করিবার সময় তখন কম মিলিত, তার উপর নিত্য হাটে গিয়া বসিয়া থাকিলে উৎপাদন ক্ষেত্রেও শ্রমের কমি হইত এবং ইহার সঙ্গে খাওয়া খরচ প্রভৃতিতে ব্যয়ও যথেষ্ট হইয়া যাইত। তখন হাটে পণ্য লইয়া গেলে সকল সময় যে তাহার ক্রেতা মিলিত এমনও নহে—অনেক ক্ষেত্রে আবার ক্রেতাও পণ্যের জন্য আসিয়া হাটে প্রত্যাশা করিয়া থাকিত, কিন্তু পণ্যের উৎপাদক বা বিনিময়-কর্তার তখন কোন দেখাই পাওয়া যাইত না। হয়ত এই সব অসুবিধা মিটাইবার জন্যই পূর্বে নির্দিষ্ট হাট বা বড় মেলা বসাইবার রেওয়াজ ছিল ; এই সময় পণ্যের উৎপাদক এবং গ্রাহক উভয়েই ক্রয়বিক্রয়ের জন্য আর্থিক সংখ্যায় আসিয়া* একত্র হইত। পণ্যের উৎপাদন ও চাহিদা অনুযায়ী তখনও কোন জিনিস সুলভ এবং কোনটা মহার্ঘ হইত—যেমন দুই হাত কাপড়ের সঙ্গে বিনিময় করিলে আট সের কিংবা ততোধিক মাংস মিলিত ; কিন্তু ক্রয়ক্ষমতার দিক হইতে ধাতুর দাম তখনও অন্য সকল জিনিসের তুলনায় বেশি ছিল—তাই সামান্য ধাতুর টুকরা হইলে তাহার পরিবর্তে কুড়ি হাত কাপড় বা দুই মণ মাংস আসিত—এই ধাতুর সঙ্গে বিনিময় করা জিনিস তখন একজনের পক্ষে বহন করিয়া নেওয়া প্রায়ই সম্ভব হইত না। এইভাবে মানুষ তামা ও অন্যান্য ধাতুর অস্ত্র ও তৈজস নির্মাণ ছাড়া তাহাদের নূতন গুণ আবিষ্কার করে। পণ্যের ক্রয়বিক্রয়ের সময় ধাতুকে মধ্যস্থ করিয়া এইভাবে একসঙ্গে অধিক জিনিসের হস্তান্তর আরম্ভ হয়। প্রথম অবস্থায় এই সব ধাতুখণ্ডের উপর কোনরূপ রাজচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিবার প্রয়োজন হইত না—ধাতুর গুণ ও পরিমাণের উপর মূল্য নির্ধারণ করিয়া তাহা দিয়াই পণ্য বিনিময়ের কাজ চলিয়া যাইত ; কিন্তু পরে ব্যাপারী এবং তাহারও পরে রাজতন্ত্রের চেষ্টায় ধাতুর বিভিন্ন মুদ্রারূপের সৃষ্টি হয়। ইহাতে সাধারণ মানুষ ধাতুর ভেজাল ও ওজন সংক্রান্ত প্রতারণা হইতে বাঁচিয়া গেল, তবে তাহাদের ব্যাপারবাণিজ্য ও আর্থিক জীবন রাজতন্ত্রের নিকট বাঁধা পড়িল।

যাহা হউক, প্রথম দিকে পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা এই উভয়েই স্বয়ং উৎপাদক ছিল ; নিজেদের জিনিস সওদা করিবার জন্য তখন তাহারা নিজেই হাটে বাজারে লইয়া যাইত। ধরা যাউক, এক গ্রাম হইতে কয়েকজন বিক্রেতা আসিয়া কয়েকদিন হাটে বসিয়া রহিল ; কিন্তু এক দিন দুই দিন তিন

---

* তাহাদের সংখ্যা যেমন অধিক হইত, পণ্যের পরিমাণও তেমনি পর্যাপ্ত হইত—তাই হাট বা মেলা পণ্যপ্রাপ্তির অনেকটা নিশ্চিন্ত স্থল ছিল ; † পণ্যের উৎপাদনব্যয়, তাহার পরিমাণ, তাহার চাহিদা এবং দুষ্প্রাপ্যতা, সুলভতা সমস্ত এক্ষেত্রে গণ্য।

দিন করিয়াও কিছুতেই তাহাদের পণ্যের ক্রেতা জুটিল না ;—এই অবস্থায় গ্রামিক লোকের সময় ও অর্থ দুইই যথেষ্ট পরিমাণে নষ্ট হইল। তখন দুই এক জনকে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বসাইয়া রাখিয়া অপর সকলে গ্রামে ফিরিয়া গেল ; আর যাহারা বসিয়া রহিল তাহাদের উৎপাদন শ্রমের লোকসানও অন্য ভাবে পূর্ণ হইল—অর্থাৎ উৎপাদকেরা সকলেই লাভ হইতে অংশ দিয়া তাহাদের ঘাটতি মিটাইয়া দিল। এইভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের অসুবিধায় সমাজে ধীরে ধীরে ব্যবসায়ীবর্গের সৃষ্টি হয়, ইহাতে উৎপাদকেরা নিজে পণ্যবিক্রয়ের দায় হইতে মুক্ত পায়, এবং অপরদিকে ব্যবসায়ীকেও তাহারা উৎপাদন শ্রম হইতে অব্যাহতি দেয়।

ব্যবসায়ীদের উদ্ভবের পূর্বে পণ্যবিনিময়ের যে অসুবিধা ছিল তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক :—কাটামুণ্ডু* হইতে লাসা† যাইবার পথে এনম্ বা কুত্তী বলিয়া একটি স্থান আছে ; উহা বলিতে গেলে প্রায় তিব্বতের সীমান্ত দ্বারেই অবস্থিত—সেখানে একজন তিব্বতীয় শাসনকর্তা বা তিব্বতের ম্যাজিষ্ট্রেটও বাস করেন। বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে দেড় দুই মাস কুত্তীতে খুব লোকসমাগম হয়—একদিক হইতে নেপালী কৃষকেরা তখন নেপালের ফসল সওদা করিবার জন্য কুত্তী আসে—পিটের উপর চাউল ভুট্টার টুকরি লইয়া তাহাদের এক এক দল পাঁচ সাত দিনে আসিয়া কুত্তী পৌছে ; অন্যদিক হইতে মধ্য তিব্বতের ক্ষারী ঝিলের নুন, তিব্বতের সোডা ও তিব্বতের কাপড় লইয়া আসে তিব্বতীয়ের দল—শতেক চামরী গাই ও হাজার ভেড়ার উপর লাদ চাপাইয়া কুত্তী আসিতে তাহাদের দুই তিন সপ্তাহ কাটিয়া যায়। নেপালী ও তিব্বতীরা এখানে বৎসরান্তে একবার তাহাদের উৎপাদিত জিনিস অদলবদল করে। নেপালীদের দেশে সোডা, লবণ বা কাপড় তেমন পাওয়া যায় না—তিব্বতের মত তুলা সেখানে নাই, তার উপর ক্ষারনির্ঝরও কম। তিব্বতে আবার নেপালের মত ভুট্টা বা চাউলের ফসল ফলে না—তাই ভুট্টা, চাউল ও অপর শস্যের সঙ্গে তিব্বতীরা নিজের জিনিস বদলাইয়া লয়। এই বিনিময়ের জন্য তিব্বতীদিগকে কুত্তীতে আসিয়া পাঁচ ছয় সপ্তাহ বসিয়া থাকিতে হয়—নেপালীরাও নিজেদের চাউল ভুট্টা খরচ করিতে করিতে দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। নেবার সওদাগরেরা ব্যবসা শুরু করিবার পর** তিব্বতী ও নেপালী কৃষকের এই অসুবিধা দূর হইয়াছে—এই নেবাররা কিন্তু তিব্বতী নয়, তাহারা নেপালের অধিবাসী ; প্রায় হাজার বছর ধরিয়া ইহারা জাতব্যবসায়ী।

* নেপালের অন্তর্গত ; † তিব্বতের রাজধানী।

** অর্থাৎ সেই অঞ্চলে ব্যবসা শুরু করিবার পর ;

তিব্বতীদের মধ্যে এত পূর্বে ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব হয় নাই—তাই নেবাররাই তখন এই ক্ষেত্রে একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইহারা তিব্বতীদের নিকট হইতে লবণ, সোডা ও অন্যান্য পণ্য কিনিয়া লইত—তাহার সঙ্গে সঙ্গে নেপালী কৃষকের ফসল চাউল ভুট্টাও তাহারা মজুত করিত—পরে প্রয়োজন অনুযায়ী উভয় সম্প্রদায়েরা নিকট তাহারা প্রার্থিত পণ্য বিক্রয় করিত। এখানে অবশ্য বলা বাহুল্য যে এই বিক্রয় কখনও খরিদ দরে হইত না—খরিদের উপর নেবার ব্যবসায়ী নেপালী ও তিব্বতী, উভয় পক্ষের পণ্যের উপরই মুনফা রাখিত। উৎপাদক মধ্যগের সাহায্য ছাড়া পণ্যবিনিময় করিলে তাহা দামে সস্তা হয়—কিন্তু এই ক্ষেত্রে অসুবিধা যে বিনিময়ের বাজারে পণ্যমূল্যের নিশ্চয়তা নাই; ব্যবসায়ীরা বাজারে পণ্যের একটা সর্বনিম্ন ও উচ্চতম দর বাঁধিয়া লয়—ইহাতে বাজার দরের আপেক্ষিক নিশ্চয়তাও অনেকটা বাড়িয়া যায়। ব্যবসায়ীরা উৎপাদকের নিকট হইতে পণ্য কিনিতে নিম্নতম দরে কিনিতে চেষ্টা করে—এবং পণ্যের উৎপাদককেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর দেওয়া দর মানিয়া লইতে হয়। কুত্তীর নেবার ব্যাপারী আজ হঠাৎ ব্যবসায় বন্ধ করিলে তিব্বতী ও নেপালী উভয়েরই অসুবিধা হইবে—নেপাল হইতে আবার চাউল-ভুট্টার টুকরি বহিয়া কৃষককে কুত্তীযাত্রা করিতে হইবে—আর তিব্বতী কৃষককেও তেমনি হাজার ভেড়ায় লাদ চাপাইয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে—ইহাতে তাহাদের পণ্যক্রয়ে ব্যয় বাড়িবে এবং উৎপাদন শ্রমেও বহু কমি পড়িবে।

উপরের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়, সামন্তযুগে ব্যবসায়ীদের উদ্ভবের ফলে উৎপাদকের বহু শ্রম ও সময় বাঁচিয়া গিয়াছে। ব্যবসায়ীরা প্রথম প্রথম কুত্তীর নেবারদের মত একস্থানে থাকিয়া উভয় পক্ষের পণ্যের খরিদবিক্রীর কাজ করিত। পরে অবশ্য তাহারা নিজেই উৎপাদকের ঘরে গিয়া সেখান হইতে বিক্রয়ের পণ্য ক্রয় করিয়া আনিত, এবং বিভিন্ন দেশের জিনিস উহাদের নিকট পৌঁছাইবার জন্য গ্রামাঞ্চলে দোকান খুলিয়া রাখিত। ইহাতে উৎপাদককে আর পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য দীর্ঘ দিন ধরিয়া দেশান্তরে পড়িয়া থাকিতে হইত না। প্রথম দিকে ব্যবসায়ীরা শুধু পণ্য ক্রয় করিবার সময় উৎপাদককে তাহার পণ্যের মূল্য বুঝাইয়া দিত; কিন্তু পরে তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বানিয়ারা দাদন হিসাবে পণ্যমূল্যের একাংশ অগ্রিমও দিতে আরম্ভ করে। ইহার পর কারখানা স্থাপন করিয়া দেশের শিল্পীদের সাহায্যে তাহারা বিক্রেয় বস্তুর নির্মাণ শুরু করিয়া দেয়।

ব্যাপারীরা উৎপাদককে তাহাদের পণ্য বিক্রয়ের চিন্তা হইতে অব্যাহতি

† নেপালী ও তিব্বতী।

দিয়াছে ইহা সত্য কথা—কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদক আবার সম্পূর্ণভাবে বানিয়াদের অধীনও হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায়ীরা উৎপাদকের তুলনায় সর্বদাই নিজের স্বার্থ সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন ছিল—তাহার উপর সকল ব্যবসায়ীর মূল স্বার্থ এক হওয়ায় পণ্যের দর ও ওজন সম্বন্ধে তাহারা যদৃচ্ছা নিয়ম করিত। সমস্ত বাজার এক কথা বলিলে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে তাহাকে আর অনুচিত বলিয়া গণ্য করা যাইত না—সাধারণ ক্রেতা কিংবা উৎপাদকের নিকট উহা ন্যায্য এবং সর্বসমর্থিত পণ্যমূল্য বা বাজার দর বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু কেহ ব্যক্তিগত ভাবে পণ্যের দর বা ওজন সম্পর্কে নূতন বিধি স্থাপন করিতে চাহিলে সকলে তাহাকে ঠগ সাব্যস্ত করিত—এই ক্ষেত্রে কখনও ক্রেতা-বিক্রেতায় কলহ হইত এবং অবস্থা বিশেষে লাঠ্যৌষধি আয়োজনেরও ত্রুটি হইত না। এই সব কারণে ব্যবসায় ব্যাপারে ওজনের মান ও মুদ্রানিয়ন্ত্রণের ভার শেষ পর্যন্ত রাজ্যব্যবস্থাপকদের হাতে চলিয়া যায়।

ব্যাপারীবর্গ দেশের উৎপন্ন দ্রব্য অল্প সময়ে বিতরণ করিবার ভার নিয়া উৎপাদনের বেগ বাড়াইয়া দেয়—ইহার ফলে দেশের ব্যাপার-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর পণ্যের চাহিদাও বাড়ে। আবার পণ্যোৎপাদন ক্ষেত্রে ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে চতুর শিল্পীর কদরও পূর্বাপেক্ষা বর্ধিত হয়; এবং ইহার আনুষঙ্গিক ভাবে মানুষের শ্রমক্ষমতার অধিক অংশই তখন উৎপাদক কর্মে নিয়োজিত হইয়া যায়। উৎপাদন ব্যাপারে এই সব নূতন সাহায্য অনিবার্য হইয়া পড়ায় সমাজে ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবসায়ী বা বানিয়ার দল উৎপাদককে ফাঁকি দিয়া দুই দিক হইতে তাহাদের শ্রম চুরি করে।* কাঁচা মালের উৎপাদনে কিংবা তাহাকে অন্তিম পণ্যরূপ দেওয়ায় বানিয়ার সত্যই কিছুমাত্র শ্রম ব্যয়িত হইত না। এইজন্য লোকের চোখে ব্যাপারীর বৃত্তি তখন অনেকটা জুয়াচ্চুরির সামিল বলিয়াই গণ্য হইত। ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে ভারতবর্ষে কয়েকটি প্রচলিত লোকোক্তি হইতে আমরা ইহা বুঝিতে পারি—

বানিয়া তোর কেমন বান
যায়না জানা জানি।
না ছেঁকে তুই লোহু খাস
ছেঁকে খাস্‌রে পানি॥**

---

* অর্থাৎ বানিয়া উৎপাদনের জন্য শ্রম না করিয়াও উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয়জাত ফল ভোগ করে—এই শ্রম চুরির বিশদ ও মনোজ্ঞ আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

**মূল প্রবাদটি ইইল, 'জাণনহারা জাণিয়া বণিয়া তেরা বাণ। বিণ ছাণে লোহ পিবে পানী পিবে ছাণ॥'

বণিকবৃত্তিকে ভারতবর্ষের সাধারণ লোক অশ্রদ্ধা করিত বলিয়া তাহাদের কবির মুখে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'র আবৃত্তি শুনিতে পাই না—লোককবি ভারতীয় কৃষকের মর্যাদাকে পূর্বে স্থান দিয়া তাহার পর বণিকবৃত্তির উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

উত্তম ক্ষেতি মধ্যম বান।
অধম চাকরী ভিখ নিধান ॥*

এই সব দৃষ্টান্ত হইতে বোঝা যায়, উৎপাদক পণ্যবিক্রয়ের জন্য ব্যাপারীর প্রয়োজনীয়তা বুঝিলেও তাহাদের শঠতাকে কখনই শ্রদ্ধা করিত না—দেশের শঠ ও শাহুদের উচ্চ মহল ও রাজৈশ্বর্য দেখিয়া সাধারণ লোক অতি সহজে এই ঐশ্বর্যের কারণ বুঝিতে পারিত। তাই বানিয়ার ভাগ্যে উৎপাদকের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা যত না জুটিত তাহার চেয়ে অনেক বেশি জুটিত ঘৃণা। তবে তখনকার সমাজেও বানিয়ার একটি বড় কৃতার্থতা ছিল এই যে, সামন্ত শাসক চিরদিনই তাহার স্বপক্ষে ছিল—ইহার কারণ রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে বণিক যে নিজস্বার্থে রাজতন্ত্রের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা সামন্তদের অজানা ছিল না। তাহা ছাড়াও, বণিককুল তাহাদের মুনফাহানির ভয়ে প্রকৃতপক্ষে সকল রকম সামাজিক উপপ্লবকে সর্বদাই দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহিত—এবং রাজা বিরাজী হইলে তাহাদের ব্যাপার-বাণিজ্যও যে মাটি হইবে এই বিষয়েও তাহারা খুব সচেতন ছিল। বণিক ও সামন্তের স্বার্থ মৈত্রীর অপর কারণ এই যে, ইহারা উভয়েই পরশ্রমজীবী, জীবিকা অর্জন ব্যাপারে তাহাদের মৌলিক কোন সামর্থ্য নাই।

ছোট ছোট সামন্ত রাজ্যকে তখন বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করায় সেই যুগের স্বার্থবহদের অনেকটা সহায়তা ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দে মগধের বণিকেরা তক্ষশিলা[১] হইতে বাংলা দেশের তাম্রলিপ্ত[২] পর্যন্ত যাতায়াত করিত। বুদ্ধের সমকালীন রাজা বিম্বিসারের[৩] সময় তাহাদের রাজগৃহ হইতে তক্ষশিলা যাইবার বিবরণ পাওয়া যায়। এই বাণিজ্য-যাত্রায়, তাহারা পথে সাকেত[৪], অহিচ্ছত্র[৫], সাগল[৬] ও অন্যান্য ছোট-বড় দেশ অতিক্রম করিয়া যাইত। এইজন্য মগধসীমা পার হওয়ার পর মল্লদের খণ্ড খণ্ড গণতন্ত্রী দেশ পার না হইয়া তাহারা গন্তব্যে পৌঁছিতে পারিত না। পথিমধ্যে আবার রামগঙ্গার পার অবধি বিস্তৃত কোশলের বিশাল রাজ্যও তাহাদিগকে ভেদ

---

* মূল উক্তি হইতেছে, 'উত্তম খেতী মধ্যিম বাণ। অধম চাকরী ভীখ নিদান।'

১। রাওলপিণ্ডি; ২। তমলুক, মেদিনীপুর; ৩। মৃত্যু ৪৯১ খ্রীঃ পূঃ; ৪। অযোধ্যা; ৫। রামনগর, বেরিলি; ৬। শেয়ালকোট।

করিয়া যাইতে হইত। পঞ্চাল ও কুরুরাজ্য পার হইয়া পঞ্জাবেও মল্ল[1], মদ্র[2] অন্যান্য প্রজাতন্ত্র দেশ হইয়া স্বার্থ শেষে গন্ধারে যাইয়া পৌছিত।

পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, কোশলের রাজ্য তখন বিশাল—এমন কি হয়ত বা প্রায় রা'গঙ্গা অবধিই বিস্তৃত ছিল—এইজন্য বণিকেরা একবার কোশলে ঢুকিলে তাহাদিগকে অনেকদিন আর কোনরূপ রাজনীতিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু কোশল ছাড়াইয়া আবার আর একটু অগ্রসর হইলেই দশ-বারো ক্রোশ পরে পরে তাহাদিগকে প্রজাতন্ত্রী রাজ্যের সীমা পার হইতে হইত—ইহাতে রাজ্যের অধিকারীদিগকে বারংবার ভেট-পূজা দিতে দিতে বণিকের হাঙ্গামা ও হয়রানির তখন আর অন্ত থাকিত না। কিন্তু রাজগৃহ হইতে তমলুক, তক্ষশিলা ও ভরোচ ব্যাপিয়া এক রাজ্য হইলে সীমান্ত অতিক্রমের ঝগড়া অনেকটা মিটিয়া যাইত; তাহা ছাড়া, ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রার হিসাব-সংক্রান্ত গোলমাল, বিভিন্ন রাজ্যকর্তাদের তোষামোদ, মনস্তুটি—এই সবও পূর্বের অনুপাতে কমিয়া আসিত। এইজন্য বণিক নিজের স্বার্থের খাতিরে দেশময় ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে বিশাল ও বিস্তৃত সাম্রাজ্যেরই অধিক পক্ষপাতী ছিল। আমরা বলিয়াছি, সামন্তবাদ প্রাচীন জন বা গোষ্ঠী সমাজের স্থলে বহুগোষ্ঠীক ভিত্তিতে রাজ্য বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও বংশক্রমের দিক দিয়া সামন্ত রাজার যে বিশেষ গোষ্ঠীপরিচয় তাহা লুপ্ত হয় নাই। তাই সামন্ত কোন বহু-বিস্তৃত রাজ্যের সম্রাট হইলেও তাহার পক্ষে গোষ্ঠীপক্ষপাত হইতে মুক্ত হইয়া যাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু বণিক সম্প্রদায় এইরূপ সকল প্রকার পক্ষপাত হইতে স্বভাবতঃই মুক্ত—কারণ তাহার বাণিজ্য অন্তর্রাজীয়, তাই বণিকের দৃষ্টি এবং মনও অন্তর্রাজীয়; এই অন্তর্রাজীয় দৃষ্টির ফলে তাহার বাণিজ্য দেশীয় স্থলভাগ ছাড়াইয়া দূরান্তের সাগরসীমান্ত* স্পর্শ করে। বৌদ্ধদের জাতককাহিনী হইতে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দের ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের বহু বিবরণ পাওয়া যায়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, শাসকেরা বণিকদিগকে তাহাদের হিতকারী মনে করিত—রাজ্যের চিরস্থিতি কামনায় তাহারা বিভিন্ন দেশের পণ্য আগমে উৎসাহ না দিয়া পারিত না—রাজধানীতে এবং রাজ্য অন্তর্গত সমৃদ্ধ অঞ্চলে তাহারা ব্যবসায়ীদের ভিড় পছন্দ করিত। বুদ্ধের সমকালীন রাজা প্রসেনজিত তাঁহার ভগ্নিপতি বিম্বিসারের† নিকট কোশলের জন্য একজন বণিক আনিতে গিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বিম্বিসারের এই ক্ষুদ্র রাজ্যই‡ নন্দ ও মৌর্য বংশীয়দের

১। শতদ্রু ও বপাষার মধ্যস্থিত প্রদেশ; ২। রাবী ও চনাব মধ্যস্থিত দেশ।

* সুমাত্রা, জাভা, মেসোপোতামিয়া; † মগধরাজ; ‡ মগধরাজ্য।

সময় এক বিশাল সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল—মগধের জোতিয়, পুন্নক, জটিলমেণ্ডক, কাকবলিয় প্রভৃতি বণিকের বাণিজ্য প্রসারের মধ্য দিয়া তাহা পূর্ব লক্ষণ পাঠ করিতে পারি। প্রসেনজিতের প্রার্থনার কথা বিম্বিসার তাঁহার রাজ্যের বণিকদের নিকট জানাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়—বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রসেনজিতকে মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর পুত্র ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে সন্তুষ্টচিত্তে কোশলে ফিরিবার বিবরণ পাওয়া যায়। সাকেত* আসিয়া পৌছিবার পর ধনঞ্জয় কি একটু ভাবিয়া প্রসেনজিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন †—

'ইহা কাহার রাজ্য?'

'আমারই শ্রেষ্ঠী।'

'এই স্থান হইতে শ্রাবস্তী কতদূর হইবে?'

'সাত যোজন অতিক্রম করিবার পর।'

'শ্রাবস্তীতে বহু লোক বাস করে, আমার পরিজন—দাস এবং অনুচর যথেষ্ট; যদি দেব আজ্ঞা দেন, আমি এই স্থানে বসতি করি।'

ধনঞ্জয় মগধের একজন প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠীর পুত্র—সে নিজেও পিতার সমব্যবসায়ী বিচক্ষণ বণিক ছিল; তাই ঘাঘরার‡ কূলে, তক্ষশিলার পথের উপর, বসতি যে সুবিধাজনক তাহা সে বুঝিতে পারে। শ্রাবস্তী রাজধানীর পার্শ্ব দিয়া তখন রাপতী নদী বহিত; কিন্তু রাপতী সরযূর মত তত বড় ছিল না, আর তাহার পারে জনবসতিও বিরল ছিল।

বাণিজ্য সেই যুগে কত বড় লাভের বস্তু ছিল তাহা ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখার বিবাহ-বর্ণন§ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—

"শ্রাবস্তীর মৃগারশ্রেষ্ঠীর পুত্র পূর্ণবর্ধন যুবা বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন....কিন্তু উপযুক্ত কন্যার অভাবে তিনি তখনও কুমার—অকৃতদার....পূর্ণবর্ধনের পিতা সমজাতীয়া কন্যা খুঁজিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন...শ্রেষ্ঠীর চরেরা শ্রাবস্তীতে কন্যা না পাইয়া সাকেত অভিমুখে রওয়ানা হইল....সেই দিন বিশাখা পাঁচশত সমবয়স্কা সখিসঙ্গে মহাবাপীতে উৎসবে গিয়াছেন....মৃগারশ্রেষ্ঠীর অনুচরগণ নগরে কন্যা না পাইয়া তখন নগরসীমান্তে বিশ্রাম করিতেছিল....এমন সময় চারিদিকে আচ্ছন্ন করিয়া ঘোরতর বর্ষণ সুরু হইল...বিশাখার সখীরা ভিজিবার ভয়ে বেগে দৌড়িয়া গিয়া ঘরে ঢুকিল....কিন্তু বিশাখা এই মেঘ বর্ষণে একটুকুও বিচলিতা হইলেন না—তিনি বর্ষণ মাথায় করিয়া সুমন্দ পাদক্ষেপে

---

* অযোধ্যা; † সংকৃত বুদ্ধচর্যা (পৃঃ ১০৩) দ্রষ্টব্য। ‡ সরযুনদী; § সংকৃত বুদ্ধচর্যা (৩২৬—৩২৮ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

গৃহে প্রবেশ করিলেন....বিশাখার বয়স ও রূপে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রেষ্ঠীর অনুচরেরা তখন জিজ্ঞাসা করিল—

'অম্ম, তোমাকে অতীবা বৃদ্ধার মত মনে হইতেছে...'

'তাত, এইরূপ কথা আপনারা কি দেখিয়া বলিতেছেন?'

'....তোমার অন্যান্য সহচরীরা বর্ষণের ভয়ে ছুটিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিল...আর তুমি বৃদ্ধার মত শেষ অবধি ধীরে ধীরেই চলিলে—তোমার সুমন্দ পদবিক্ষেপ এতটুকুও দ্রুত করিতে চাহিলে না—এমন কি তোমার দুর্লভ শাড়ী যে ভিজিয়া যাইবে তাহাও চিন্তা করিলে না।'...

'তাত, শাড়ী আমার কাছে দুর্লভ নয়, আমার ঘরে অজস্র বহুমূল্য শাড়ী আছে—কিন্তু তাত, স্ত্রীজাতি বিক্রেয় বাসনের মত, হাত পা ভাঙ্গা অঙ্গভঙ্গ স্ত্রীকে লোক ঘৃণা করে...আমি এই সব কথা জানি বলিয়াই ধীরে হাঁটিলাম...'

অবশেষে বিশাখা দাসীগণ পরিবৃতা হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ...বিশাখার পিতার নিকট বিবাহপ্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি বলিলেন, 'তাত, তোমাদের শ্রেষ্ঠী ধনে আমার সমতুল্য না হইলেও জাতিতে আমার সমান ...আচ্ছা তোমরা যাও, গিয়া মৃগারশ্রেষ্ঠীকে আমার সম্মতি জ্ঞাপন কর....'

বিবাহ ঠিক হইবার পর মৃগার শেঠ রাজা প্রসেনজিতের সমীপে যাইয়া নিবেদন করিল—

'দেব, একটি মঙ্গল কর্ম বিষযে আপনার নিকট নিবেদন করি: আপনাব দাস পূর্ণবর্ধনের জন্য ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখাকে আনিতে চাই—আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সাকেত নগরে যাইবার আজ্ঞা দান করুন '

'যথারুচি মহাশ্রেষ্ঠী।...কিন্তু আমরাও আপনার সহগামী হইব কি?'

'দেব, আমি কৃতার্থ হইলাম—আপনার ন্যায় সঙ্গী কোথায় পাইব?'

রাজা মৃগারশ্রেষ্ঠীকে খুশী করিবার জন্য বরযাত্রীদের সঙ্গে সাকেত যাইতে প্রস্তুত হইলেন...সেখানে পৌঁছিবার পর ধনঞ্জয় সকলকে সন্তুষ্টচিত্তে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া গেলেন...কয়েকদিন কাটিবার পর প্রসেনজিত ধনঞ্জয়ের নিকট এক বার্তা প্রেরণ করিয়া জানাইলেন—

'শ্রেষ্ঠী, মৃগার শেঠ বেশিদিন আমার খরচ বহন করিতে পারিবেন না—তাই আমার নিবেদন আপনি যথাশীঘ্র কন্যা বিদায়ের দিন স্থির করুন...'

...ইহার উত্তরে ধনঞ্জয় প্রসেনজিতের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, 'মহারাজ, বর্ষাকাল আসিয়া গিয়াছে, এখন চার মাস পথ চলা অসম্ভব ..আপনার বান্ধব ও পরিচরদের ভার আমার উপর অর্পণ করুন—আপনি অনুগ্রহ করিয়া যখন আসিয়াছেন, তখন আমার ইচ্ছা ব্যতীত যাইতে পারিবেন না'..."

পালি গ্রন্থে দেখা যায়, ধনঞ্জয়ের পক্ষে এই বিরাট জনতার ব্যয় বহন করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই; শুধু শেষ দিকে ইন্ধনের অল্পতায়[১] তাহাকে হাতীসার, ঘোড়াসার ও গোসার উৎপাটন করিতে হইয়াছিল। বিশাখা পিতার নিকট হইতে যে যৌতুক পাইয়াছিল তাহাতে 'মহালতা' নামে এক হারের উল্লেখ আছে—পালি গ্রন্থে[২] ইহার মূল্য 'নয় কোটি' এবং নির্মাণ-ব্যয় 'শত সহস্র' বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কিন্তু 'নয় কোটি' সংখ্যাটি তখনকার কার্যাপণ[৩] সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়া থাকিলেও মহালতার মূল্য বড় কম ছিল না—এই মূল্যে বিশাখার বিবাহের পর তাহার জন্য 'মৃগারমাতা'র নামে[৪] একটি প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল—এই দ্বিতল প্রাসাদের প্রত্যেক তলেই পাঁচ পাঁচ শত প্রকোষ্ঠ ছিল বলিয়া পালি গ্রন্থে বর্ণনা আছে।

এই উপাখ্যান হইতে সামন্ত যুগে বণিক সমাজের সমৃদ্ধি এবং রাজকুলের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মধ্যকালীন ভারতে শ্রেষ্ঠী ও তাহাদের কুমার-কুমারীর সহিত রাজকুমার ও কুমারীদের মিত্রতা ও একসঙ্গে ব্যসনাদির বিবরণ আছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বণিক সমাজ কখনও রাজ্যের স্বল্প-বিস্তৃত সীমা পছন্দ করিত না—অব্যাহত ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য রাজ্য যত বড় হয় ততই তাহাদের সুবিধা ছিল; রাজ্যের ভিতরে বাহিরে অশান্তি, যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা উপপ্লব ঘটিলে ব্যবসায়ের বিঘ্ন ঘটিত—তাই তাহাদের পক্ষে শান্ত এবং নির্বিরোধ জীবন কামনা করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। আর বণিকেরা সমাজের উৎপাদন-ক্রিয়ার সঙ্গে কখনও প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল না—ইহাতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা প্রকৃতির কোনরূপ বিরোধিতার সম্মুখেও তাহাদিগকে যাইতে হইত না।[৫] এইভাবে সকল সংঘর্ষ হইতে দূরে থাকায় বণিকের পরুষ প্রকৃতিগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল—তাই তাহার আচার-প্রচারে কোনরূপ রূঢ়তা বা দৃঢ়তার পরিচয় সহজে পাওয়া যায় না।[৬] অন্তরের কপটতা ঢাকিয়া মধুর বচনে কাজ হাসিল করিতে বণিক তখন সিদ্ধহস্ত ছিল। ভারতীয় বৈশ্যদের অধিকাংশ ব্যক্তিকে আজও বৈষ্ণব, জৈন প্রভৃতি শান্তধর্মে বিশ্বাসী দেখিতে পাই—তাহাদের দিক হইতে ইহাকে সামাজিক শান্তি কামনার প্রকাশ বলিয়া মনে করিলে ভুল হয় না। আমরা জানি, বৌদ্ধ ধর্ম এক সময় ভারতবর্ষে এমনি এক শান্তি ও অহিংসার ধর্ম ছিল—ভারতের বড় বড় বণিক ও ব্যাপারী এইজন্য অতি সহজে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়; তাহাদের ব্যাপার-বাণিজ্য

১। লক্ষণীয় যে তখন বর্ষাকাল; ২। ধম্মপদ অট্‌ঠকথা, ৪।৪৪; ৩। তাম্রমুদ্রা; ৪। মৃগারশ্রেষ্ঠীর মাতা (?) ৫। বণিকদের সাগরাভিযানের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র; ৬। এই চরিত্র চিত্রণ যে মধ্যকালীন বণিকের তাহা মনে রাখিতে হইবে।

দূর দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে বৌদ্ধ ধর্মও বহির্ভারতে প্রসার লাভ করে—বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্রাষ্ট্রীয় প্রচারে ইহা একমাত্র কারণ না হইলেও অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দ পর্যন্ত* ভারতীয় ব্যাপারীরা বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতির জন্য মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন—ত্রিপিটকে এবং সাঁচি, ভরহুত, কার্লে ও নাসিকে শিলালেখগুলিতে ইহার প্রমাণ মুদ্রিত আছে—তাহা হইতে দাতাদের তালিকা প্রস্তুত করিলে ব্যাপারীর সংখ্যা অপর সকল বর্গকে বহু ব্যবধানে অতিক্রম করিবে। বুদ্ধকালীন ভারতে বণিকেরা শাসন ব্যাপারে প্রধান না হইলেও তাহাতে তাহাদের প্রত্যক্ষ অংশ ছিল—প্রত্যেক নগরে নগরশ্রেষ্ঠীর রাজকীয় পদ হইতে আমাদের পূর্ব উক্তি প্রমাণিত হইবে।

৫। ধাতু ও হাতিয়ার

তাম্র আবিষ্কারের পর লক্ষ বর্ষ হইতে চলিয়া-আসা প্রাচীন প্রস্তরাস্ত্রের প্রচারও কমিয়া আসে। ইহার পর খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্বে পিত্তল—এবং পিত্তলের প্রায় তিন শতাব্দী পরে লৌহ আবিষ্কৃত হয়। পিত্তল তাম্রের তুলনায় অনেকগুণ দৃঢ় এবং স্থায়ী—এই দিক দিয়া লৌহ আবার পিত্তল হইতেও অধিক গুণসম্পন্ন। অবশ্য দামের বিচারে লোহা আজ অন্যান্য সকল ধাতুর তুলনায় সস্তা; কিন্তু এক সময় ইহার মূল্য তামা, রূপা প্রভৃতি ধাতু হইতে বেশি ছিল। ইহার কারণ এই যে, তখন লৌহ প্রস্তুত করিতে মানুষের যথেষ্ট শ্রম ব্যয়িত হইত—আর কয়লার ব্যবহার না জানায় মাটি হইতে ধাতু পৃথক করাও সহজ ছিল না।†

এই সব ধাতুর আবিষ্কারে অস্ত্রপাতির সংখ্যা ও শক্তি স্বাভাবিকভাবেই বাড়িয়া গেল; পুরাতন কাঠ পাথরের অস্ত্র লুপ্ত হইয়া কাষ্ঠ ও প্রস্তর তখন নানা শিল্পকার্যে প্রযুক্ত হইল। সামন্ত যুগে লৌহের মত প্রয়োজনীয় ধাতু আবিষ্কৃত হওয়ায় অবশ্য শাসকদেরই সুবিধা হইল বেশি—কারণ সাধারণ মানুষ অস্ত্র-নির্মাণের ব্যয়াধিক্যের জন্য নিজদিগকে তখন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত রাখিতে পারিত না—কিন্তু সামন্ত শাসক তাহার শোষিত প্রজা ও প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্তের ভয়ে নিত্যই নূতন অস্ত্রে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিত। এই সব যুদ্ধসম্বন্ধী জ্ঞান ও আবিষ্কারকে তাই সামন্তের পক্ষে স্বাগত না করিয়া কোন উপায় ছিল না—কারণ বহুসংখ্যকের উপর সংখ্যালঘুদের শাসন কায়েম রাখিতে হইলে শক্তির‡ প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার্য।

---

* খ্রীঃপূর্ব পঞ্চম শতাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া।

† পাথুরে কয়লার ব্যবহার জানিবার পর এই বিদ্যা অনেকটা আয়াসসাধ্য হইয়া যায়।

‡ অর্থাৎ অস্ত্রশক্তির, অস্ত্রবলের।

কিন্তু সমাজে প্রস্তর ও দারু অস্ত্র প্রচলিত থাকিবার সময় সংখ্যাই* বিশেষভাবে শক্তির কাজ করিত ; তাই তখন মাটির একটা সাধারণ দেওয়াল হইলে তাহাই কেল্লার চারদেওয়ারীর মর্যাদা পাইত। অবশ্য ইহার পর নিক্ষেপাস্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধনুর্বাণের ব্যবহার আরম্ভ হয়—এবং ইহারই কিছুদিন পরে তাম্রাস্ত্র বা তাম্র-নির্মিত আয়ুধের আবির্ভাব ঘটিয়া যায়। এইবার তামার আয়ুধ লইয়া স্বল্পসংখ্যক মানুষও প্রস্তরাস্ত্রের বিরাট বাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে—তাই আত্মরক্ষার জন্য সামন্তকে আদিম দুর্গ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া তাহা আর একবার পুনর্গঠিত করিয়া লইতে হয়। মিশরের অন্যতম প্রস্তরকীর্তি চেয়োপ্ সমাজের আদি ধাতু যুগেরই† একটি লক্ষণীয় নিদর্শন। হেরোদেতসের কথা অনুসারে ইহার চত্বর খুঁড়িতে এক লক্ষ লোক তিন মাস পরিশ্রম করিয়াছিল। ভারতবর্ষে আদি ধাতু যুগের অবশেষ যে একেবারে অপ্রাপ্ত তাহা নহে, কিন্তু কথা এই—কিংবদন্তী ইহাকে মানুষের কৃতি বলিয়া স্বীকার করে না। রাজগৃহের পাহাড়ের উপর যে একটি প্রাচীর চারিদিকে ঘুরিয়া আসিয়াছে—তাহার বিশালতার জন্য লোকে উহাকে অসুরের সৃষ্টি বলিয়া মনে করে। পরবর্তী যুগে এই সব পাষাণ দুর্গের অপেক্ষাকৃত লঘু উপকরণের সাহায্যে দুর্গাদির নির্মাণ আরম্ভ হয়। বুদ্ধকাল কি মৌর্যকালে এই সব দুর্গ সাধারণত কাঠের উপকরণ দ্বারাই তৈয়ারি হইত—তখন কাঠ অবশ্য খুবই সুলভ এবং পর্যাপ্ত ছিল—আর ধাতুর আবিষ্কারে কাঠের কারিগরীও বাড়িয়া গিয়াছিল। য়ুনানী রাজদূত‡ পাটলিপুত্রের§ দুর্গপ্রাচীরের যে বর্ণনা দিয়াছেন, এই ক্ষেত্রে তাহারও স্মরণ করা চলিবে। পাটনার প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এই দুর্গপ্রাচীরের কিছু অংশ এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে—বনাকীর্ণ স্থানে এই প্রাচীর স্বভাবতঃই কাঠ দিয়া তৈয়ারী—কিন্তু পাহাড়ের সন্নিকটে তাহা আবার প্রস্তরময়, আর পাহাড় ও জঙ্গল হইতে দূরে ইটের সাহায্যেও ইহার নির্মাণ হইয়াছে। তখন কেল্লার চারদেওয়ারী ঘিরিয়া প্রায়ই জলে-ভরা অনতিগভীর খাড়ি থাকিত। তারপর ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দ পর্যন্ত ভারতে এই দুর্গনির্মাণ-কৌশলের আর বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু মোঙ্গোলেরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়া পৃথিবীতে হঠাৎ এক নূতন সমর-কৌশলের সৃষ্টি করে ; ভারতবর্ষেও মোগল সম্রাট বাবর সর্বপ্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে এইরূপ বারুদের ব্যবহার করেন ;—এইভাবে যুদ্ধরীতি পরিবর্তিত হইবার পর তোপের গোলার সম্মুখে পুরাতন দুর্গপ্রাচীর

* জনসংখ্যাই। † অর্থাৎ তাম্র যুগের ; চেয়োপ্‌কে (২৮০০ খ্রীঃ পূঃ) তাম্র যুগের মধ্যে ধরিবার কারণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ‡ মেগাস্থিনিস, § পাটনা।

বিকল প্রতিপন্ন হয়—তাই অবরোধকে নূতন আক্রমণের উপযুক্ত করিবার জন্য দুর্গাদির গঠনেও আবার পরিবর্তন আসে। নূতন অস্ত্রের সম্মুখে পুরাতন অবরোধের বিকল হইবার দৃষ্টান্ত এই যুগেও অবশ্য যথেষ্টই আছে। আর অস্ত্রশস্ত্রের এই যে নিত্যনূতন প্রয়োগ তাহা বর্গরাজ্যের সমাপ্তি না হইলে শেষও হইতে পারে না—কারণ বর্গশাসনে সমাজের স্বল্পসংখ্যকের হাতে গিয়া রাজনীতিক ও আর্থিক সমস্ত অধিকারই পুঞ্জিত হয়—ইহাতে শাসকের প্রতিপত্তি সুরক্ষিত রাখিবার জন্য এক বর্গকে সশস্ত্র ও অপরকে নিরস্ত্র করা ছাড়া উপায় থাকে না। তাই বলিতে পারি, শোষণ* যতদিন বর্তমান আছে ততদিন পরদেশ লুণ্ঠনের ক্ষান্তি নাই—কিংবা যুদ্ধবিগ্রহেরও নিবৃত্তি নাই। ইতিহাসে বর্গরাজ্য এইজন্যই চিরদিন তলোয়ারের রাজ্যরূপে চিহ্নিত হইয়া আছে।

৬। বর্গ ও বর্গসংঘর্ষ

সামন্ত যুগে অর্থগত ও বর্গগত বৈষম্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। নিম্নবর্গের শ্রমফল ভোগ করিয়া উচ্চতরবর্গ তখন সমাজে নিজের আসন পাকা করিয়া লইয়াছিল। এইভাবে উৎপাদন-ক্রিয়ার সহিত সম্পর্ক না থাকায় কায়িক শ্রমকে তাহারা ঘৃণার চোখে দেখিতে থাকে স্ত্রীজাতি সম্পর্কে তখন যুগনির্দেশ কি ছিল তাহা তুলসীর সীতার আদর্শ হইতে বুঝিতে পারি—

কোল দোলা ত্যজি সীতা পালঙ্কে শয়ান।
কঠোর ভূমিতে নহে পদের সংস্থান॥†

তখন স্ত্রী-চরিত্রে ইহার কোন ব্যতিক্রম হইয়া থাকিলে তাহা শুধু অস্ত্রশিক্ষা সম্পর্কেই হইতে পারে; আমরা পূর্বে বলিয়াছি, সামন্ত যুগে বীরতার প্রকৃতই খুব কদর ছিল‡—আর প্রত্যেক সামন্তই তখন বুঝিত, তরবারির ধার ক্ষয় হইলে তাহার ভোগযশও বেশি দিনের নয়। এইজন্যই দেখিতে পাই সামন্ত যুগে সকল দেশেই শাসকেরা নিয়মিতভাবে অস্ত্রচর্চা করিত। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দে উত্তর ফ্রান্সের একমাত্র যুগাদর্শ হইয়াছিল প্রেমচর্চা ও

---

*শোষণতন্ত্র সর্বদাই বর্গাভিত্তিক।

† অর্থাৎ, দোলা ও কোল ছাড়িবার পরই সীতা পালঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—এমন কি এই কঠোর পৃথিবীতে তিনি ভুলেও পাদস্পর্শ করান নাই; তুলসীদাসের মূল হিন্দী হইতেছে—"পলঁগ পীঠ তজি গোদ হিঁডোরা। সিয়ন দীন্হ পগ অবণি কঠোরা॥"

‡ এই পুরাতন বীরতার কদর বর্তমান ভারতের সামন্তদের মধ্যে ক্রিয়ায় না হইলেও আদর্শে টিকিয়া আছে; বাংলাদেশে পার্বত্য ত্রিপুরার রাজাদের রাজচিহ্নের নীচে 'কিলবিদু বীরতা সারমেকং' এই কথাটি লেখা থাকে।

যুদ্ধচর্চা ; আর এই যুদ্ধচর্চাও যে তখন সমাজসম্বন্ধী কাজে খুব বেশি নিয়োজিত হইত তাহা নহে—ফরাসী সীমান্তের বীরতা রমণীর অনুগ্রহ লাভের জন্য সামন্তে সামন্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই শেষ হইয়া যাইত।*

রাজপুত যুগে† ভারতীয় সর্দার ও সামন্তদের আচরণও ফরাসী বীরদের অনুরূপ ছিল। তখন রাজপুত বীরও ফরাসীর মতই কখনও মৃত্যুর ভয় করিত না—এবং অপরাপর ব্যাপারেও সে প্রায় ফরাসীরই সমকক্ষতা অর্জন করিয়াছিল : আল্‌হা উদলের যুদ্ধে রাজপুতেরা বিজিত রাজ্যের কুমারী হরণ করিবার জন্য যোগ দিয়াছিল বলিয়া বর্ণনা আছে। দণ্ডীর দশকুমারচরিতে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতীয় সামন্তদের সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায় ; সেখানেও প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বীরতা এবং সুন্দরীর সহিত প্রেম এই দুই বস্তু সামন্ত শাসকের জীবনাদর্শ গণ্য হইয়াছে। দণ্ডীর কাব্যে নায়ক রাজবাহন ও তাহার সাথী কুমার উজ্জয়িনী যাইয়া দুইটি কুমারীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিল—কবি অবশ্য এই প্রেমকে যথাসম্ভব মর্যাদা দিয়া তাহাকে কবিজনোচিত ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরই তিনি বালচন্দ্রিকার নায়ককে দিয়া তাঁহার প্রেয়সীর জন্য অপর প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করান—ইহাতে মধ্যযুগে য়ুরোপীয় বীরদের যে আদর্শ অর্থাৎ সেই 'বীরতা ও প্রেম'—তাহাই দণ্ডীর নাটকে ভারতীয় ভূমিকায় দেখিতে পাই। ইহা ছাড়া, রাম অথবা পঞ্চ পাণ্ডব, কিংবা সিদ্ধার্থ গৌতমের বিবাহেও আমরা বীরতার টুর্নামেণ্ট হইতে দেখি। স্বয়ম্বর সভায় সুন্দরী রাজকুমারীকে পণ রাখিয়া তখন সামন্তবীরদের মধ্যে শস্ত্র-প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত হইত। শাসকজাতিকে যুদ্ধবিদ্যায় প্রেরণা যোগাইতে ইহা অপেক্ষা চতুর কৌশল আর কি হইতে পারে ?

বর্গভেদের প্রসঙ্গে অবশ্য শাসকের পরেই পুরোহিতের কথা বলিতে হয়—কিন্তু যাজক ও পুরোহিত সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা পূর্বেই হইয়া গিয়াছে—এবং এই বিষয়ে অন্যান্য বাকী প্রসঙ্গও আমরা বিষয়ান্তরে সারিয়া লইব। তারপর শাসক ও পুরোহিতের কথা হইয়া গেলে বলিতে হয় ব্যাপারীর কথা—কিন্তু ব্যাপারীর সম্পর্কে আলোচনা আমরা পূর্বে বিশদ্‌ভাবেই করিয়া আসিয়াছি। ইহার পর—অর্থাৎ শাসক, যাজক ও ব্যাপারীর পর চতুর্থ বর্গ কারিগর ও কৃষাণ—ইহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্বে হইয়া গেলেও তাহা তেমন পর্যাপ্ত হয় নাই।

* অবশ্য এই সময় ফ্রান্সের অভিযাত্রীরা নূতন দেশ আবিষ্কারেও বাহির হইয়াছিল—তবে দেশের অভ্যন্তরে তাহাদের বীরতাও রমণীর মনস্তুষ্টিতে ব্যয়িত হইত।

† খ্রীষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

দাসতা যুগে সকল কৃষকই তাহার কর্ষিত ভূমি অর্থাৎ নিজ জোতের অন্তর্ভুক্ত ভূমির স্বামী ছিল—কিন্তু সামন্ত যুগে রাজা বা সামন্তকে রাজ্যের সমস্ত ভূমির মালিক করিয়া দিবার চেষ্টা হয়।* পূর্বে শাসককে রাজ্যসেবার বেতন হিসাবে প্রজারা কিছু কর ও লভ্যের কিছু অংশ দিয়া দিত; কিন্তু সামন্ত যুগে এই প্রথা বদলাইয়া তাহার স্থলে রাজা স্বয়ং ভূমির স্বামী বলিয়া ঘোষিত হন। য়ুরোপীয় সামন্তেরা এই উপায়ে কৃষকের নিকট হইতে তখন বহু ভূমি কাড়িয়া লইয়াছিল—পরে খ্রীষ্টবাদ জনসাধারণের ধর্ম হওয়ায় কৃষককে অর্ধদাস† করিয়া লইতে তাহাদের আরও সুবিধা হয়।

নূতন ধর্মপ্রসারের সঙ্গে পুরাতন বিধি-ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া দিবার সর্বত্রই এইরূপ সুযোগ আসে—কারণ তখন প্রাচীন নিয়মনীতিকে অবিশ্বাসী কাফিরের মতবাদ বলিয়া প্রচার করা খুব সহজ হয়—আর ইহাতে জনসাধারণও তাহার আচরিত রীতিনীতির উপর স্বভাবতঃই বীতশ্রদ্ধ হইয়া যায়। ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে সনাতন নিয়মের উপর এতটা আকস্মিক অবিশ্বাস জন্মানো সম্ভব হয় নাই—কারণ কোন ধর্ম এখানে একচ্ছত্র হইতে না পারায় প্রাচীন পরম্পরা অব্যাহত রহিয়া গিয়াছে। পঞ্জাবে গত শতাব্দীতে শিখ শাসনকাল পর্যন্ত ভূমির উপর সমগ্র গ্রামের সম্মিলিত অধিকার‡ ছিল; ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে অষ্টাদশ শতকের অন্তকাল অবধি ক্ষেত্রে শুধু কৃষকের দাবি স্বীকৃত হইত—জোতদার ও সরকার এই দুই দলের মধ্যে জমিদার নামীয় নূতন শ্রেণীর তখনও সৃষ্টি হয় নাই। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয় সামন্ত শাসকের প্রভুতা বিস্তৃত হইবার পর এখানে ইহাদের সৃষ্টি হয়।

কোম্পানির শাসনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের গ্রামগুলিতে পঞ্চায়তী প্রথার প্রচলন ছিল। গ্রামের আভ্যন্তরিক বিষয়ে তখনও রাষ্ট্র ব্যক্তি অপেক্ষা পঞ্চায়তকেই অধিক প্রাধান্য দিত। সামাজিক দিক হইতে ভারতের এই গ্রাম্য পঞ্চায়তকে আমরা জনযুগীন শাসনেরই অবশেষ বলিতে পারি—কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের প্রকৃতই কোন উন্নতি না অধোগতির চিহ্ন তাহা লইয়া প্রচুর বিসম্বাদ হইতে পারে; সামাজিক দিক হইতে বিচার করিলে তখনকার পঞ্চায়তকে শুধুমাত্র প্রাচীনত্বের আকর্ষণ অর্থাৎ মোহ বলিয়াই মনে হয়—ইহা অব্যবহার্য পুরাতন জীর্ণ জামাকে তালি দিয়া ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি ছাড়া আর অন্য কিছুই নহে। তবে কথা হইল, এই জীর্ণবাসের প্রতি আসক্তিই বা

* এই চেষ্টা সিদ্ধান্তিক দিক হইতে অর্থাৎ আইনের আশ্রয়েই হইয়াছিল; † অর্থাৎ Serf, কর্মী বা কমীন; ‡ ইহা জনযুগীন প্রথারই অবশেষ।

ভারতবর্ষে এমন সামাজিকভাবে সার্থক হইল কেন? ইহার কারণ হইতেছে —(১) আর্থিক বর্গভেদ ছাড়া ভারতবর্ষে বর্ণগত বর্গভেদেরও যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল—আর এইজন্য ভারতীয় সমাজে অর্থসাম্যের জন্য কোনরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবও সম্ভবপর হয় নাই; (২) উষ্ণ জলবায়ুর জন্য এখানকার জীবনের সাধারণ মান চিরকালই নীচে পড়িয়া থাকিতে পারিয়াছে—য়ুরোপের মত এখানে উন্নতধরনের খাদ্য, বস্ত্র বা গৃহ জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য নয়—য়ুরোপে শীতের উপযোগী পরিচ্ছদ বা গৃহ তপ্ত রাখিবার সরঞ্জাম না রাখিলে ফেব্রুয়ারি পড়িতেই মৃত্যু হয়—কিন্তু ভারতবর্ষে এই সময়ও কৌপিনসার হইয়া নিষ্পত্র গাছের তলায় রাত্রি কাটাইয়া দেওয়া চলে; তারপর আরও কারণ হইল (৩) ভারতবর্ষের ভূমির ফলন-শক্তি বেশি, এখানে প্রায় জমিতেই বৎসরে তিনবার ফসল হইত, অথচ ভূমির তুলনায় জনবসতি তখন বিরল ছিল; (৪) বিজেতা ও অন্যান্য জাতির আগমে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মধ্যেই এখানে জনতন্ত্রী চিন্তার অবসান হয়—এবং ইহার পর হইতে দীর্ঘদিন ধরিয়া ভারতবর্ষে একতান্ত্রিক সামন্তনায়কতার কাল চলিয়া আসিয়াছে; সর্বশেষে (৫) সংস্কৃতি ও বিচার-ধারা পরিবর্তনে ভারতবর্ষের ধর্ম বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারে নাই—নূতন ধর্ম প্রবর্তনের পরও এখানে সাধারণ জনতা তাহাদের পূর্বাচরিত ধর্মে আসক্ত থাকিয়া গিয়াছে।

রাজতন্ত্র যে আমাদের পূর্ব আলোচিত সামন্তবাদেরই অন্তর্গত তাহা আমরা একাধিকবার বলিয়া আসিয়াছি; আপাতদৃষ্টিতে এই রাজাকে সামন্ত ও প্রজার স্বার্থবিরোধিতা হইতে উচ্চে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায় যে, সামন্তপণা ছাড়িয়া দিলে রাজার রাজ্য বা রাজত্ব টিকে না; নিজ জায়গিরের মধ্যে রাজাও অন্যান্য সামন্তের মতই একজন সামন্ত—তবে প্রধান সামন্ত! কিন্তু প্রধান সামন্তও কমীনকে* আধপেটা খাওয়াইয়াই নিজের সুখ-বিলাসের জন্য পরিশ্রম করান; এবং অন্যান্য সামন্তের মতই দরিদ্রের নিকট হইতে সামন্তশাহী নজর নজরানা আদায় করেন—আর বংশরক্তের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য তিনিও সামন্ত ছাড়া অন্য পরিবারে বিবাহ করিতে চান না। তবু পার্থক্য হইল সাধারণ জনতার অতি ক্ষুদ্র অংশই রাজার প্রকৃত রূপের পরিচয় পায়—আর অন্য সকলেই মনে করে তিনি অনুক্ষণ ন্যায়ের পাল্লা হাতে ধরিয়া বসিয়া থাকেন। এই লোকদৃষ্টির কথা ছাড়া, আর্থিক ব্যাপারেও রাজায় ও সামন্তে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়—সমাজে ব্যাপারীর সৃষ্টি হইলে ভেট ও নজরানা বাবদ রাজার এক নূতন আয়ের পথ সৃষ্টি হয়। তখন সাধারণ

---

* কমী, Serf.

প্রজা ও ব্যাপারীতে বিবাদ হইলে, রাজার রায় সর্বদা ব্যাপারীর পক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু এই বিবাদ সামন্ত ও ব্যাপারীর বিরোধী স্বার্থের জন্য হইলে রাজা বিব্রত বোধ করেন—তবে ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির আশা বেশি হইলে সেখানেও ব্যাপারীর পক্ষে বাজিমাৎ হয়—আর ইহার ফলে ব্যাপারীরাও চতুর্দেশে রাজার ন্যায়পরতার ঢেঁড়া পিটাইয়া দেয়।

এই ব্যাপারী ছাড়া আর একটি শক্তিশালী মেশিন-ও রাজার পক্ষে প্রোপাগাণ্ডার কাজ করিত: সমাজ-ব্যবস্থার অনুকরণে পৃথিবীতে দেবদেবী ও স্বর্গ-নরকের কল্পনা হয়—সামন্ত যুগে এই সব ধর্মবিশ্বাসই আবার রাজার মহিমা-বর্ধনের সহায়ক হইয়া পড়ে—তাঁহাকে দেব-অংশ মনে করিয়া 'দেব' সম্বোধনে অভিহিত কবার মূলেও তখন ইহাই কারণ। কিন্তু এই নূতন অভিধার প্রভাবে মানুষ ক্রমে রাজাকে বর্গপ্রভাবের ঊর্ধ্বে বলিয়া ভাবিতে শিখে—আর সমাজেব সর্বাপেক্ষা বাচালশ্রেণী পুরোহিতেরা এই শিক্ষায় তাহাদের সহায়ক হয়। য়ুনানী দার্শনিক প্লেটো-ও সমাজে এইভাবে নূতন রাজ্যশাসন প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন—তাঁহার সমাজ-ব্যবস্থা যে হিন্দু বর্ণ-ব্যবস্থার অনুরূপ ইহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। প্লেটো ইহাতে অসমর্থ হইলেও প্রোপাগাণ্ডার মূল্য যে তিনি বুঝিতেন, তাহা লক্ষ্য করিবার। ভারতবর্ষেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকলে মিলিয়া নিজস্বার্থে রাজপক্ষীয় প্রচার চালাইয়াছে—এবং জনসাধারণও তাহাকে ধার্মিক প্রচারের সমতুল মনে করিয়া সহজেই মানিয়া লইয়াছে।*

৭। রাজ্য ও শাসন

শাসন-শক্তি চিরদিনই মানুষের আর্থিক ও সামাজিক কতব্য পালন কবিয় আসিয়াছে—কিংবা বলিতে পারি, এই সকল প্রয়োজনেই সমাজে চিরকাল ইহার প্রয়োগ হইয়াছে। পূর্বে সমাজে ব্যৈক্তিক সম্পত্তি না থাকায় তাহাব শাসনযন্ত্রও বরাবরই সমদর্শী ছিল—কিন্তু সম্পত্তি ব্যৈক্তিক হইবার পর নূতন ব্যক্তিস্বার্থের আঘাতে তাহাতেও পরিবর্তন আসে; তখন সমাজের শাসনযন্ত্র পূর্ব লক্ষ্য হারাইয়া ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় মনোযোগী হয়—এবং ইহার ফলে পুরাতন জনতন্ত্রের নিয়ম, শাসন, গঠন সমস্তই ভাঙ্গিয়া যায়। এঙ্গেলস্ এই কারণেই এই পরিবর্তনের বর্ণনা করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন: জনের গঠন সম্পূর্ণ হইলে তাহা ফাটিয়া গিয়া সমাজের বর্গরূপে ভাগ করিয়া দিল; আর এই বর্গরূপের মধ্য দিয়াই জন হইতে রাজ্যের স্থাপনা হইল।

* ধর্ম-প্রচারের ক্ষেত্রে জনসাধারণ যেমন সহজেই প্রতারিত হয়, রাজপক্ষীয় প্রচারেও তাহারা তেমনই সহজে মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

বর্গযুক্ত সমাজে প্রাচীন জন-ব্যবস্থা যে টিকিতে পারে না, তাহা আমরা এখন বুঝিতে পারি; জার্মানির সমাজেও একদিন—এমন কি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক অবধি জনসত্তা ছিল; রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া তাহাতে অধিকার স্থাপনার পর[১] জার্মানির জনসত্তা পরিত্যক্ত হয়। ভারতবর্ষেও দেখি, আর্যদের আগমন-কালে তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পিতৃসাত্তিক ছিল—এমন কি প্রাচীন জন-সমাজের স্মৃতিকেও আর্যগোষ্ঠী তখন একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায় নাই; কিন্তু সিন্ধুর[২] সমৃদ্ধ জাতিকে পরাস্ত করিবার পর তাহাদের পিতৃসাত্তিক সমাজেও ভাঙ্গন ধরে—এখানেও নূতন রাজ্য ও প্রজার উপর অধিকার স্থাপনায় প্রাচীন পিতৃতন্ত্র নষ্ট হইয়া যায়—আর তখন স্বাভাবিকভাবে জনসত্তার স্থানে বর্গশাসন-সম্পন্ন সামন্ততন্ত্রেরও প্রতিষ্ঠা হয়।

রাজ্যের কল্পনা কখনও উপর হইতে টপ্‌কাইয়া আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে নাই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, জন-ব্যবস্থার পর সমাজে বর্গবিভেদের সৃষ্টি হয়—তখন রাজ্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া সমাজের গঠন অক্ষুণ্ণ রাখার আর উপায় ছিল না। এইজন্য রাজ্য-ব্যবস্থা ঈশ্বরীয়ও নয়, আকাশীয়ও নয়—তাহা সমাজেরই সৃষ্টি, বলিতে পারি এক বিশেষ স্তরের সৃষ্টি। এই বিশেষ স্তরে সমাজের বৈষম্যগুলিকে আর সমন্বিত করা চলিতেছিল না—তাই শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই সব বিষমতার[৩] একটি সমাধানের চেষ্টা হইতেছিল—রাজ্য সমাজ-বৈষম্যের এই আপাতব্যবস্থিত সমাধান, এই হিসাবে সে সমাজেরই উপজ। কিন্তু সমাজের উপজ হইয়াও রাজ্য চিরদিন সমাজ হইতে উর্ধ্বে থাকিতে চায়, এমন কি সমাজের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক স্বীকার করিতেও সময় সময় কুণ্ঠাবোধ করে।

রাজ্য উদ্ভূত হইবার পূর্বে একবংশিক পরিবারগুলি[৪] আর্থিক ও সামাজিক গঠনের দিক হইতে একক ছিল—অর্থাৎ ভিন্ন পরিবার বা ভিন্ন গোষ্ঠীর সংগঠনের সঙ্গে ইঁহাদের কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না; কিন্তু রাজ্যের সৃষ্টি হওয়ার পর এইরূপ পারিবারিক বা একগোষ্ঠীক স্বাতন্ত্র্য আর সম্ভব হয় নাই—তখন এক প্রদেশের বহু বংশ, বহু বর্ণ ও সংস্কৃতি-সভ্যতার মানুষ[৫] এক সংগঠনের

১। ইহার কালও খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দ। ২। সিন্ধু উপত্যকার।

৩। বিষমতা অর্থে বর্গবিষমতা, বিরোধী স্বার্থের বিষমতা।

৪। একস্থানে বসতিশীল এক শোণিত সম্পর্কের পরিবার।

৫। শুধু বিভিন্ন সংস্কৃতি-সভ্যতার মানুষই নহে, এক সংস্কৃতি-সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের মানুষও।

অন্তর্গত হয়।* এঙ্গেলস্ এথেন্স ও রোমের এই পরিণতির উপর মন্তব্য করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছিলেন : প্রাচীন রক্তগত সংগঠন ভাঙ্গিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে কত কালক্ষয়ী সংঘর্ষের প্রয়োজন হইয়াছিল কে বলিবে? ভারতবর্ষেও আর্য-অনার্যের বর্ণ-বৈষম্যের প্রশ্ন তুলিয়া এই প্রাচীন শোণিত-সম্বন্ধকে স্থায়ী রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে—কিন্তু পিতৃসত্তা যুগের ঐতিহাসিক নিদর্শনের অভাব হইতে এখানে তাহার অসাফল্যেরও প্রমাণ পাই। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আর্যদের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা প্রকৃতপক্ষে সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস—তখন গঙ্গা-উপত্যকায় উত্তরাপথের আর্যদের বসতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের নূতন সমাজ সংগঠিত হইয়াছে—এবং রাজ্যেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

রাজ্য সমাজের উচ্চবর্গের বৈয়ক্তিক স্বার্থ রক্ষার জন্যই একদিন স্থাপিত হইয়াছিল—তাই এই নীচ কর্তব্যপালনে অন্য শক্তি অপেক্ষা পাশবিক শক্তিই অধিক উপযোগী হয়। পূর্বে জন-সংগঠনে জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন অপর কোন সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব ছিল না; তখন একমাত্র জনমতই জন-সমাজের সমস্ত কর্তব্য অকর্তব্য নির্ধারণের কর্তা ছিল—তাই বাহিনীর অস্তিত্ব ছাড়াও তখন জনের সকল সমর্থ ব্যক্তিই জনস্বার্থে যুদ্ধ করিত। কিন্তু রাজ্যের বেলায় এইরূপ সামগ্রিক যুদ্ধোদ্যোগ আর ততটা সম্ভব হইতে পারে না†—কারণ, রাজ্য নিজেকে উপরে অর্থাৎ জনতার মিলিত স্বার্থের উর্ধ্বে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে। এইজন্য রাজ্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুরক্ষার জন্য সৈন্য-সৃষ্টিরও প্রয়োজন হয়; আর সৈন্য সৃষ্টি করিতে গেলে রাজ্যবাসীর উপর করের ভারও অনিবার্য হইয়া পড়ে। ইহার পর অস্ত্র বা দুর্গ নির্মাণের ব্যয়াধিক্যের জন্য করের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায়—ক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যের শক্তি এবং রাজ্যের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রবলতার জন্য তাহা পূর্বাপেক্ষাও বর্ধিত হয়। এইভাবে সাধারণ জনতা করদানে অক্ষম হইলে রাজ্য তাহাদের প্রতিশ্রুত করের উপর ঋণ গ্রহণ করে‡—তখন এই ঋণের অর্থ হইতেই সৈন্যসজ্জা এবং অন্যান্য যুদ্ধোদ্যোগের ব্যয় নির্বাহ হয়।

রাজ্য সমাজের উপজ হইলেও অধিকার ও অক্ষমতার দিক হইতে তাহা সমাজ হইতে ভিন্ন। আজ সাধারণ সিপাহীও ব্যক্তির উপর জন-সমাজের সমগ্র পঞ্চায়েত হইতে বেশি কর্তৃত্ব দেখায়—ইহার কারণ এই যে, পুলিশ বা সিপাহী রাজ্যেরই প্রতিনিধি, আর রাজ্যও ব্যক্তি বা সমাজের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু

* ইহা কোনরূপ বর্ণ-সমন্বয় নয়, রাজ্যের সকলের নাগরিক অধিকার।
† বর্তমান টোটেলিটারিয়ান রাজ্যের সামগ্রিক যুদ্ধোদ্যোগের কারণ ইহা হইতে ভিন্ন।
‡ ইহা প্রায় আধুনিক কালের কথা।

জনসংস্থা নিজেকে ব্যক্তি বা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উর্ধ্বে সমাসীন করে নাই—তাই রাজ্যের শাসক বা সেনানায়কের শক্তি যতই হউক না কেন, শ্রদ্ধা-সম্মান জননায়কেরই বেশি ছিল। ইহা ছাড়া, রাজ্যের শাসক বা নায়কের যে মহিমা গৌরব তাহা রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায়ই সৃষ্ট হয়—কিন্তু জন-সমাজের নায়কের জন্য সমাজের উর্ধ্বস্তর হইতে এইরূপ কোন পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন ছিল না। জননায়ক নিজেকে সমাজের উপরে তুলিয়া লইয়া সমাজ হইতে তাহার বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করে নাই—এইজন্য জন-সমাজের স্থিতিকাল পর্যন্ত তাহার শ্রদ্ধা-সম্মান স্বাভাবিক ছিল এবং রাজ্যের নায়ক হইতে তাহা অধিকও ছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, রাজ্য শুধুমাত্র বিত্তবানদেরই সংগঠন—তাই বর্গস্বার্থ রক্ষা করা ছাড়া ইহার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। সামন্তবাদী রাজ্যের কার্য হইল কৃষাণ ও কমীনকে* দাবাইয়া রাখা—এবং সাধারণের উপর ঋণ ও করের ভার চাপাইয়া রাখা। সম্পত্তি-রহিতেরা যাহাতে লোভের দৃষ্টিতে না তাকায় এইজন্য সামন্ত রাজ্যের সৈন্যসজ্জা, অথচ অপর রাজ্যের উপর তাহার নিজের লোভের জন্যই† আবার তাহার যুদ্ধোদ্যোগ। এইভাবে রাজ্যের স্বার্থভিত্তিকতা বুঝিলে তাহা যে চিরকালীন নয় ইহাও বুঝিতে পারি। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই রাজ্য কোন অনাদি যুগ হইতে ভূপৃষ্ঠে চাপিয়া বসিয়া নাই। প্রাচীন সমাজের আচার-নীতি বা সংঘবোধ এইরূপ ছিল যে, তখন রাজ্যের প্রয়োজনই হইত না। রাজ্যের মূল কারণ হইল বর্গভেদ, বর্গভেদ হইতেই রাজ্যের উদ্ভব, এবং বর্গভেদের অবসান হইলেই রাজ্যেরও অবসান। তাই রাজ্যকে বিলুপ্ত করিবার জন্য অরাজকবাদের‡ আশ্রয় লইবার প্রয়োজন নাই—ইহার মূল উৎপাটন করিতে হইলে বর্গ-ব্যবস্থার নিরসনই একমাত্র উপযোগী কাজ।

৮। ধর্ম, দর্শন ও সদাচার

(১) **ধর্ম**—পিতৃসত্তা যুগেও প্রাকৃতিক শক্তি এবং মৃত পিতরদের আত্মা সম্পর্কে মানুষের ভয় ছিল। বুদ্ধ এইরূপ ভয়ের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া একস্থানে§ বলিয়াছেন:

'অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমীর রাত্রে….আমার নিকট মৃগ আসে, ময়ূর গাছ হইতে কাঠ ভাঙ্গিয়া ফেলে, বায়ু বহিয়া পত্রপল্লব শিহরিত হয়, আমার তখন

---

*Serf—কমী, শ্রমিক; † পূর্বে রাজা কৌরব্যের উপাখ্যান দ্রষ্টব্য; ‡ Anarchism;
§ ভয়ভৈরবসুত্ত, মজ্ঝিমনিকায় ৪, পৃঃ ১৪।

মনে হয়—হয়ত বা ভয়ভৈরব আসিতেছে···কোন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা রাত্রিতে দিন অনুভব করেন, এবং দিনে তাঁহাদের রাত্রি অনুভূত হয়···· আমি ইহাকে শ্রমণ ব্রাহ্মণদের সম্মোহ* বলিয়া বলি।'

বস্তুত, মানুষের এইরূপ ভীতিজাত সম্মোহের ফলেই ভূত-প্রেত ও দেবতা-বর্গের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রারম্ভিক অবস্থায় এই সব ভয়ভৈরবের হাত হইতে বাচিবার জন্য মানুষ পূজা বলির বিধান করিয়াছিল—সেই সময় ভয়বারণী উৎকোচাদি ছাড়া ধার্মিক ক্রিয়াকলাপ আর বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্তু বর্গসমাজের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ধর্মবোধই পূজা-বলির পর্ব ছাড়াইয়া ক্রমশ জটিল হইয়া উঠে—কারণ তখন মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে শাসকেরা নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য নিয়োগ করিতে আরম্ভ করে। হিন্দী-আর্যদের ধর্ম ও দেবতা-বিকাশের দিকে লক্ষ্য করিলে এই সত্য আমরা আরও সহজে উপলব্ধি করিতে পারি :—

হিন্দী-আর্যেরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার সময় তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থা পিতৃসাত্তিক ছিল; কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, জনযুগের স্মৃতি তাহারা তখনও একেবারে বিস্মৃত হয় নাই। আর্যদের তখনকার দেবতারাও ঠিক তাহাদের মতই পিতৃসাত্তিক সমাজের অধিকারী ছিল—তবে দেব-সমাজে পিতৃসত্তা অপেক্ষা জন-সমাজে আচার-নীতির প্রভাব কিছু বেশি হইতে পারে। পৃথিবীতে দেখি, তখন যূথমৈথুন পরিত্যক্ত হইয়া পতি-পত্নী সম্পর্ক স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু দেবলোকে তখনও মৈথুনাদি ব্যাপারে পিতৃসাত্তিক সমাজের নিশ্চয়তা আসিতে পারে নাই : সেই সময়ও দেবাঙ্গনারা পূর্বেকার যূথাচরিত রীতিতে সাময়িক বিবাহে ব্রতী হইতেছে—এবং সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে অন্যপূর্বা নারী অপরে আসক্ত হইতে দ্বিধা করিতেছে না। প্রাচীন বেদমন্ত্রে দেখি, ঋষি দেবতার স্তুতি করিতে তাঁহার সমস্ত গুণই ব্যক্ত করিয়া দিতেছেন—ইহার কারণ এই যে, তখনও ইন্দ্র, বরুণ বা সোমের ছোট-বড় হইবার সীমা নির্দিষ্ট হয় নাই। পৃথিবীতে ব্যক্তি সমষ্টির স্থান অধিকার করিবার পর দেবতার মধ্যেও নিজ অধিকার নিশ্চিত হয়—ইহার পর হইতে কখনও† ইন্দ্র, কখনও বা‡ ব্রহ্মা, এবং কখনও§ শিব বা বিষ্ণু সর্বোচ্চ বিবেচিত হন।

* **Hypnotisation.**

† বৈদিক কালেই ; ‡ উপনিষদ্ কালে ; § আর্য-অনার্যের ধার্মিক সমন্বয়ের সময়।

সামন্ত যুগের মধ্যাহ্ন সময়ে[1] দেবলোক, মৃত্যুলোক প্রভৃতিরও এক-একটা কাল্পনিক রূপ নির্দিষ্ট হইয়া যায়—ইহাতে মানবকেও তখন দেবতা কিংবা দেব-অংশ-সম্ভূত অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করা সহজ হয়, এমন কি ষোল হাজার নারী-পরিবৃত কৃষ্ণবাসুদেবকে দেবদেব বা পরমদেব আখ্যা দিতে বাধা থাকে না।[2]

বৈদিক কালের সমাজও তাহার আভ্যন্তরীণ স্বার্থসংঘাত এবং বর্গ ও বর্ণ-ভেদজাত বিদ্বেষে[3] জর্জর ছিল ; এইজন্য পরবর্তী বেদমন্ত্রে সমাজকে শরীর এবং বিভিন্ন বর্গকে তাহার প্রত্যঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়। বর্গ-ব্যবস্থার এই অলৌকিক যুক্তি খাড়া করিয়াও সাধারণ মানুষকে তাহার স্বার্থ ভুলানো গেল না—তাই পরে এই বর্গবৈষম্যকে আবার ঈশ্বরের মর্জি ও পূর্বজন্মের কৃতফল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইল। বেদে আমরা পরলোকের কল্পনা পাইতেছি, কিন্তু পুনর্জন্ম সম্বন্ধে তাহাতে কোনরূপ উক্তি পাইতেছি না ; বৈদিক বিচারে মানুষ পৃথিবীতে একবারমাত্র জন্ম লয় এবং সেই জন্মে সে সুকর্ম দুষ্কর্ম উভয়ই করিতে পারে—তবে মৃত্যুর পর জীবৎকালের কর্মানুসারে তাহার স্বর্গ বা নরক প্রাপ্তি ঘটে। য়িহুদি, ঈসাই এবং ইস্‌লাম ধর্মের অনুশাসনেও পরলোক বা জন্ম-মৃত্যুর ধারণা বেদের অনুরূপ। কিন্তু ইহাতে পৃথিবীর ছোট-বড় কিংবা ধনী-নির্ধন পার্থক্যের কোনরূপ কারণ নির্ণীত হয় না—বরং ঈশ্বরের দৃষ্টি যে পক্ষপাতদুষ্ট এই ক্ষেত্রে শুধু ইহাই প্রমাণিত হইতে পারে। তাই আর্থিক বৈষম্যকে যুক্তিসহ করিবার জন্য উপনিষদের ঋষি পুনর্জন্মের সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেন। ঋষির বিচারে—

'ধনী কেন ?
পূর্বজন্মে দান পুণ্য প্রভৃতি সৎকর্মের জন্য।'
কিন্তু, 'দরিদ্র কেন ?
পূর্বজন্মে দুষ্কৃতির জন্য।'
আর, 'রাজা কেন ?
জন্মান্তরের কঠোর তপস্যার জন্য।'

এইভাবে জন্মের পৌনঃপুনিকতা আবিষ্কার করিয়া বর্গস্থিতি রক্ষায় হিন্দুরাই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখায়—ঋষির জন্মসিদ্ধান্তের বলে এখানে সামাজিক অচলতা সৃষ্টি করা অন্য স্থান হইতে অনেক সহজ হইয়াছিল। মিশরের প্রাচীন

১। গুপ্তযুগে ; ২। রাসকেলির উপাখ্যান স্মরণীয় ; ৩। এই বিদ্বেষ বিশেষ করিয়া নিম্নবর্গের দিক হইতে।

ধর্মে যে পরলোক-বিশ্বাস ছিল, তাহার ফলাফল সম্বন্ধে এক লেখক একস্থানে[১] বলিতেছেন : 'প্রত্যেক ব্যক্তিই পরলোকে নিজ নিজ কৃতকর্মের উপযুক্ত ফল পাইবে বলিয়া মনে করে···এই বিশ্বাস তাহাদের উপর এক প্রবল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের রূপ ধারণ করিয়াছে····পরলোকে নিজেকে পুণ্যাত্মা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাদিগকে সমাজ-বিধান[২] মানিয়া চলিতে হয়।

আজ পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, য়িহুদি, ঈসাই বা ইস্লাম—তাহার সমস্তই সামন্ত যুগের উপজ ; এবং সামন্ত যুগের উপজ বলিয়া ইহারা চিরদিনই এবং স্বাভাবিকভাবেই সামন্ততন্ত্রের পোষক। ধর্মে আজকাল মুক্তির যে নিরাকার রূপ দেখা যায়, তাহা সাকার ভৌতিক সত্যের[৩] সঙ্গে অজ্ঞেয় কল্পনার বিরোধের ফল[৪]—কিন্তু ইহার পূর্বে সকল ধর্মেই সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ সামন্ত পরিবারের আদর্শে স্বর্গ বা দেবলোকের কল্পনা হইয়াছে। হিন্দুদের বৈকুণ্ঠের দৃষ্টান্ত দেখুন,—সেখানেও বিলাসী রাজার প্রমোদশালার মত গুচ্ছ গুচ্ছে সুরসুন্দরীরা বিরাজ করিতেছে—তাহাদের চির-অমলিন বসন, রত্নজটিত ভূষণ, এবং পুষ্প ও গন্ধসারসংপৃক্ত তনু—তদুপরি নৃত্য, গীত, সুরা সমস্ত মিলিয়া চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নর্মশালার দ্বার খুলিয়া দিতেছে। রামানুজের 'বৈকুণ্ঠ গদ্য' পড়িয়া দেখুন, দেখিবেন সংযত ভাষায় এক ভয়ভীত দর্বারী কবি কোন হর্ষবর্ধন বা রাজেন্দ্র চোলের অন্তঃপুর বর্ণনা করিতেছে। তবে দেবতাদের প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, পত্নী গ্রহণের বেলায় তাঁহারা প্রথমত এক পত্নীতেই তৃপ্ত হইতেছেন[৫] ; কিন্তু রামানুজ তাঁহার প্রথমজীবনের আচার্যের মত অনুসারে লক্ষ্মীর অসাপত্ন্য ক্ষুণ্ণ করিতে ছাড়েন নাই—বিষ্ণুর এক উরু শূন্য থাকিবে বলিয়া বিচলিত কবি তাহার উপর আনিয়া নীলা দেবীকে বসাইয়া দিয়াছেন।

বৌদ্ধ ও জৈনেরা হিন্দুদের মতই দেবলোকে অবিশ্বাস করে না—কিন্তু নির্বাণ ও সিদ্ধশিলা তাহাদের নিকট আরও শ্রদ্ধার বস্তু। বৌদ্ধ-জৈনদের দেবলোকও পঞ্চম এবং ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের সামন্ত রাজাদিগের বিলাস-ব্যসনের চিত্র ছাড়া আর কিছুই নহে। পালি গ্রন্থে[৬] দেবরাজ ইন্দ্রের বুদ্ধ সমীপে আগমন করিবার যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত হইবে :—

১। The Development of Social Thought—Emory S. Bogardus, .P 30.
২। অর্থাৎ বর্গস্বার্থপূর্ণ সম্পত্তি-বিভাগ। ৩। Material truth. ৪। এই বিরোধেই দর্শন-শাস্ত্রের সূত্রপাত। ৫। এই পত্নী গুপ্তযুগের ধর্মপত্নী, ধর্মপত্নী এক হইবে—কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কামপত্নী অনেক হইতে বাধা নাই। ৬। সক্কপঞ্হসুত্ত, দীর্ঘনিকায় ২।৮, পৃঃ ১২২।

"ইন্দ্র সভা ত্যাগ করিয়া গীতবিদ্ পঞ্চশিখের সঙ্গে বুদ্ধ সমীপে উপস্থিত হইলেন…বুদ্ধ তখন এক নির্জন পর্বত-গুহায় ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন… ইন্দ্র বলিলেন, 'পঞ্চশিখ, তুমি সঙ্গীত দ্বারা ভগবান বুদ্ধকে প্রসন্ন কর'…ইন্দ্রের আজ্ঞায় পঞ্চশিখ বীণা তুলিয়া লইয়া নিজের প্রণয়গীতি আরম্ভ করিল :—

'ভদ্রা সূর্যবর্চসা, তোমার পিতা তিম্বরুকে আমি বন্দনা করি—কারণ তিম্বরু হইতেই তুমি আমার আনন্দবিধায়িত্রী হইয়া জন্ম নিয়াছ….

'ঘর্মাক্তের নিকট যেমন বায়ু, পিপাসিতের নিকট যেমন বারি—হে কল্যাণি, তুমিও আমার নিকট সেইরূপ প্রিয়….

'রুগ্নের নিকট যেমন ঔষধ, ক্ষুধিতের নিকট যেমন অশন, এবং প্রজ্বলিতের নিকট যেমন জল—ভদ্রে, আমার নিকটও তুমি ঠিক সেইরূপ….কল্যাণি, তুমি আমাকে শান্তিদান কর, তোমার আলিঙ্গনই আমার একমাত্র কাম্য…'

বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলে পঞ্চশিখ বলিয়াছিল—

"এক সময় আমি গন্ধর্বরাজ তিম্বরুর কন্যা সূর্যবর্চসার প্রতি অনুরক্ত ছিলাম; কিন্তু সূর্যবর্চসা আমাকে না চাহিয়া মালতি সারথির পুত্র শিখণ্ডীর প্রতি আসক্ত হয়….আমি সূর্যবর্চসাকে না পাইয়া একদিন উষাসময়ে তিম্বরুর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম…সেখানে বীণা বাদন করিয়া গান করিতেছি এমন সময়ে ভদ্রা অঙ্গনে আসিয়া দেখা দিল…আমার গীতে ভগবান্ বুদ্ধের প্রশংসা ছিল, সূর্যবর্চসা তাহা শুনিয়া পুলকিত হইয়া বলিল, 'মিত্র, এই ভগবান্‌কে আমি কখনও প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারি নাই—কিন্তু ত্রয়স্ত্রিংশ ইন্দ্রলোকে দেবসভায় নৃত্য করিতে গিয়া তাঁহার বিষয়ে আমি শুনিয়াছি…আজ তুমি ভগবান্ বুদ্ধের যে নামকীর্তন করিলে তাহাতেই আমাদের সমাগম সম্ভব হইল।"

প্রসঙ্গ শেষ করিয়া পঞ্চশিখ বলিল—

"সূর্যবর্চসার সহিত আমার একদিনই মিলন হইয়াছে, কিন্তু ইহার পর তাহাকে আর পাই নাই।"

উপরের উদ্ধৃতিতে দেবলোকের নৃত্য, গীত ও প্রণয়ে বুদ্ধের সমকালীন অজাতশত্রু বা উদয়নের রাজসী জীবনের ছায়া দেখিতে পাই। ভদ্রা সূর্যবর্চসার সুলভ প্রেম যে তখনকার গণিকাদের চরিত্র হইতেই গৃহীত হইয়াছে ইহা বুঝিতেও আমাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। ইস্‌লামের জন্নৎ[১] বর্ণনায়ও আঙ্গুরবাগ, ছায়া শীর্ণস্রোতা নদী, এবং মোতির-মত-চোখ অপরূপা হুরীদিগকে[২] দেখিয়া তাহাকে খুস্রো পর্বেজ[৩] বা মোরিশের[৪] রাজমহল বলিয়া চিনিতে পারি।

১। স্বর্গলোক। ২। স্বর্গকন্যা। ৩। ইরাণী শাহ (৫৯০ খ্রীঃ ?); ৪। রোম সম্রাট্ (মৃত্যু ৬০২ খ্রীঃ)।

ঈসাই ও য়িহুদিদের স্বর্গও হিন্দু, বৌদ্ধ এবং ইস্‌লাম ধর্মের মত সামন্ত জীবনের সুখ-বিলাসের আদর্শ লইয়াই রচিত হইয়াছে।

(২) **দর্শন**—আদিম সমাজে মানুষের জীবন তাহাদের শরীর-যাত্রার জন্য শ্রমেই ব্যয়িত হইয়া যাইত—তখন মানবশ্রমের শক্তি এত অধিক ছিল না, এবং তাহাতে নিপুণতাও যথেষ্ট কম ছিল। তাই একদিন উপার্জন করিয়া চারদিন বসিয়া খাওয়া তখনকার যুগে সম্ভব হইত না, আর একজনের বাড়তি কামাই যে আর একজন ভোগ করিবে ইহাও তখন অসম্ভব ছিল। এইজন্য আদিম সমাজে বর্গ হিসাবে কোন সিদ্ধান্তিক[১] বা বিচারকবর্গের[২] সাক্ষাৎ পাই না। কিন্তু পরবর্তী যুগে উৎপাদনের নূতন সাধন আবিষ্কৃত হওয়ায় শ্রমের সৃষ্টিক্ষমতা বাড়িয়া যায়; তখন বহুর সমসৃষ্ট ফল ভোগ করিয়া সমাজের সংখ্যাল্পবর্গ জীবনাতিপাত করিতে আরম্ভ করে। এইভাবে কায়িক শ্রমের দায়মুক্ত হইয়া ইহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও কলার[৩] দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী হয়—এবং ক্রমে এই দায়িত্বই সমাজের জ্ঞানভাণ্ডারের উপর তাহাদের একচেটিয়া উত্তরাধিকার জন্মাইয়া দেয়।

হেরাক্লিতাস্[৪] ও প্লেটোর[৫] দর্শন নির্মাণের সময় য়ুনানী সমাজ দাসদের শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল। দাসেরা তখন প্রভুর[৬] সচল সম্পত্তি, অর্থাৎ বলদ গরুর মত ইহাদিগকে হাটে বাজারে বিক্রয় করিতে কোন বাধা ছিল না[৭]। হেরাক্লিতাস সমাজের এই আভ্যন্তরিক সংঘর্ষকে অনেকটা চিনিতে পারিয়াছিলেন—আর এই সকল সংঘর্ষ যে নবনির্মাণের সূচক তাহাও তিনি অনুভব করিয়াছিলেন—তাই হেরাক্লিতাসের দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য কথা হইল 'সংঘর্ষই ঘটনার জনয়িতা'। হেরাক্লিতাস্ নিজে এথেন্সের এক উচ্চ আমীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—কিন্তু সেখানকার ব্যাপারী সম্প্রদায়ও তখন ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল; হেরাক্লিতাস্ ইহা লক্ষ্য করিয়াই[৮] তাঁহার সংঘর্ষবাদী দর্শনের সূত্র আবিষ্কার করেন—তবে সামাজিক পরিবর্তনের বেলায় তিনি নিজে হয়ত বণিকশক্তির হ্রাসই কামনা করিতেন।

প্লেটোর জন্মের পূর্বে দারযোশ[৯] ও ক্ষয়ার্শের[১০] আক্রমণে য়ুনানীদের অপর ধনজনের হানি নয়—ইহার ফলে এথেন্সীয় প্রজাতন্ত্রের তরুণ আশাপূর্ণ জীবন

১। Theoretician; ২। Critic, Thinker, Philosopher; ৩। শুধু বিজ্ঞান, দর্শন বা কলা নহে, এতৎসঙ্গে শাসনও; ৪। খ্রীঃ পূঃ ৫৩৫-৪২৫; ৫। খ্রীঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭; ৬। বড় বড় দাসপতির ও সামন্তদের; ৭। মনে রাখিতে হইবে ইহা দর্শনের এক সমৃদ্ধতম যুগের কথা; ৮। সামন্ত ও বণিকদের বিরোধী শক্তি ও স্বার্থের সংঘর্ষ দেখিয়া; ৯। খ্রীঃ পূঃ ৫৮১-৪৮৫; ১০। খ্রীঃ পূঃ ৪৮৫-৪৬৫।

নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। প্লেটো তাঁহার চতুষ্পার্শ্বের পৃথিবী হইতে প্রকৃতই কোনরূপ শান্তি বা সমৃদ্ধির আশা করিতেন না—এইজন্য তাঁহার দর্শনও বাস্তবিক পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া এক অপার্থিব লোকে গিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করে। প্লেটোর নিকট এই বাস্তবিক পৃথিবী অসার, অনিত্য, এবং তাহা অসংখ্য ভ্রমপ্রমাদ ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল; তাঁহার কল্পিত জ্ঞানময়ী পৃথিবীতে অনিত্যতা নাই, অসারতা নাই, দোষ ত্রুটি প্রমাদের কণামাত্রও সেখানে দেখা যায় না। এই ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হয়, প্লেটো কল্পচারী হইয়াও তৎকালীন সমাজ-দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই—তিনি বর্গসংঘর্ষের মূলে পৌছিয়া তাহার বিশ্লেষণ ও প্রতিকার নির্দেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, প্লেটোর অসার অনিত্য পৃথিবীর বক্ষে ব্যাধিই কি আর তাহার চিকিৎসাই বা কি[১]? এইপ্রকার কল্পদৃষ্টির জন্যই প্লেটো বর্গসংঘর্ষের স্বরূপ বুঝিয়াও তাহার প্রতিকার নির্দেশে সক্ষম হন নাই—তিনি বাস্তবিক পৃথিবী হইতে মানুষকে ঊর্ধ্বলোকে ঠেলিয়া দিয়া তাহাদের দুর্গতি-মোচনের পন্থানির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে সাধারণ মানুষ লাভবান না হইলেও সম্পত্তিবান শাসকদের পক্ষে এই ব্যবস্থা খুবই অনুকূল হইয়াছিল। কিন্তু সমাজের নিম্নতর বর্গের বেলায় প্লেটোর দর্শনকে তাহাদের দ্বেষবিদ্বেষ ও উৎসাহের উপর জল ঢালিতেই দেখি—কারণ প্লেটোর সিদ্ধান্তমতে অবাস্তব পৃথিবীর সুখসুবিধার জন্য বর্গবিগ্রহ করিয়া লাভ নাই—তাহা অপেক্ষা শাশ্বত জগতের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই হইবে বুদ্ধিমানের কাজ।

দর্শন সম্পর্কে আমি অন্যত্র[২] আলোচনা করিয়াছি, এইজন্য বিশেষ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে মূল কথা এই যে, সমাজে নিম্নতর বর্গের শ্রমের ফলেই দার্শনিকের জন্ম সম্ভব হইয়াছে—এবং সেই দর্শন-শাস্ত্রই পরিণামে তাহাদিগকে ক্ষতি ও দুর্গতির চরম সীমায় ঠেলিয়া দিতেছে—ইহা সকল সময় দার্শনিকের ইচ্ছাকৃত না হইতে পারে, কিন্তু দর্শকের পক্ষপাত হইতে বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় না। প্রাচীন য়ুনানী দার্শনিকের বিচারধারাকেও বর্গ দৃষ্টিতে[৩] এইরূপ পক্ষপাতদুষ্ট দেখা যায়। শাসকেরা প্রথমে দেববাদ ও ধর্মের সহায়তায় অনুচিত সম্পত্তিকে[৪] উচিত প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বাড়িলে ধর্ম ও দেবতাকে সকলে আর সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল না। তখন এই সন্দেহ ও স্বতন্ত্র চিন্তাকে চাপা দিবার জন্যই সমাজে দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ভব হয়—

১। অর্থাৎ পৃথিবীকে অসার মনে করায় প্লেটোর hypothesis বা পূর্ব-সিদ্ধান্তই ভুল।
২। দর্শন দিগ্‌দর্শন দ্রষ্টব্য। ৩। অর্থাৎ বর্গহিতের দিক হইতে। ৪। নিজেদের বৈয়ক্তিক সম্পত্তিকে।

এবং এইবার দেহদ্বেষী বিচারবুদ্ধি দর্শনের ব্যূহপথে পড়িয়া সত্যই দিশাহারা হইয়া যায়।

সমগ্র ভারতীয় দর্শনকেও আমরা এইরূপে সামন্ত যুগের দান বলিতে পারি—প্রাচীন য়ূনানী দর্শনের মত ইহাও সমাজের নিশ্চিন্ত-জীবিকা মানুষের চিন্তার ফল। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের সৃষ্টিতে সামন্তদের প্রভাব অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি ছিল—প্রবাহণ জনক বৈদেহ বা অশ্বপতি কৈকেয় প্রভৃতি রাজা উপনিষদের দর্শনতত্ত্বের অন্যতম নির্মাতা ছিলেন। দক্ষিণালোভী পুরোহিতেরা যজ্ঞবলির প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধিত অবিশ্বাসকে ঠিক লক্ষ্য করিতে পারিতেছিল না—কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা ইহা লক্ষ্য করিয়াই কর্মকাণ্ডের উপর ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যূহ রচনায় উদ্যোগী হয়[১]। বৈদিক ঋষি প্রকৃতই যথার্থবাদী ছিলেন—পৃথিবীকে তিনি যেমন দেখিতেন, সেইরূপই স্বীকার করিতেন; এই স্থান হইতে চরম সুখ ও তৃপ্তি লুটিয়া লওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—স্ত্রী-পুত্র ও গৃহ ছাড়িয়া অরণ্যে বাস করা ঋষির জীবনাদর্শ ছিল না—পুত্র-পৌত্রের সহিত আনন্দে গৃহবাস করাকে[২] তিনি ধ্যেয় জ্ঞান করিতেন; দুগ্ধমধুসংপৃক্ত সোমপানের বেলায় তিনি বলিতেন, 'সোম পান করিলাম, আর অমর হইলাম।'[৩]

কিন্তু ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞে পূর্বে সর্বদাই হোতা দেখিতে পাই কেন? আমরা জানি, জনযুগে সমগ্র জনসংঘ একত্র হইয়া উৎসবাদিতে পান, আহার ও নৃত্য গীত করিত; দেবদেবীর উদ্ভবের পর দেবসমাজকেও মানুষ তাহার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া লয়—এইজন্য তাহাদের আমোদ-প্রমোদ ও মত্ততায় দেবতাকে অংশ দিয়া তাহার তুষ্টিবিধানের চেষ্টা চলিতে থাকে। তখন উৎসবাদিতে সোমপাত্র দেখাইয়া ইন্দ্রদেবতাকে[৪] আবাহন করিয়া বলা হইত—'ইন্দ্র, তুমি আগমন কর, সোম প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা পান করিতে করিতে আপন স্তুতি শুনিয়া যাও[৫]।' এই মন্ত্রে দেবতাকে মানুষের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হইলেও তাহাকে মানবের গোষ্ঠীজীবন হইতে স্বতন্ত্র করা হয় নাই—যুদ্ধরত সংঘ এখানে তাহাদের বিজয়ী বীরকে পানচক্রে আহ্বান করিয়া তাহার উদ্দেশ্যে-রচিত স্তুতি গাহিতেছে। এই সব যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপ আর্যদের জীবনে এক সময় সত্যই সজীব সমারোহের ব্যাপার ছিল; আর্য স্ত্রী-পুরুষ তখন নিজহস্তে গো, ছাগ বা এইরূপ অন্যান্য পশু বধ করিয়া তাহাকে

১। ইহা একেবারে নিরপেক্ষ হইয়া নহে—তবে ইহার প্রাথমিক উদ্যোগ ক্ষত্রিয়দের। ২। 'ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানাঃ স্বে দমে'। ৩। 'অপাম সোমমমৃতা অভূম' ৪। তখন ইন্দ্রই বড় দেবতা। ৫। 'ইন্দ্র আয়াহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ' এবাং পাহি শ্রুধী হবম্।'

অগ্নিদগ্ধ করিত—পরে সোমরসের সহিত উহা ভোজন করিবার সময় দেবতা, প্রকৃতি ও পিতরদিগকে এই আনন্দমত্ততার অংশ দিত।* কিন্তু আর্যেরা আর্যভিন্ন প্রতিবেশীর সংস্পর্শে আসিলে তাহাদের প্রাচীন গোষ্ঠীবদ্ধতা ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে—তখন কৃষি, ব্যবসায় প্রভৃতি নূতন জীবনোপায় আবিষ্কৃত হইয়া প্রাচীন পশুচারণার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়--এই অবস্থায় পুরাতন সংঘোৎসব সেই একত্রিক পান, আহার, স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত নৃত্য—সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। পরবর্তী কালের মহাযাগ পুরাতন উৎসব-আনন্দের নির্জীব অনুকরণ এবং পুরোহিতের লাভের ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। এইজন্য বিকাশ-পথে আর একটু অগ্রসর হইয়া মানুষ যাগযজ্ঞ প্রভৃতিতে ক্রমেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে—আর ইহার ফলে উপনিষদেও কর্মকাণ্ড-বিরোধী ব্রহ্মবাদের উদ্ভব ঘটিয়া ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি স্থাপনা হয়।

পুনর্জন্মের সিদ্ধান্ত আমরা সর্বপ্রথম উপনিষদেই দেখিতে পাই—বেদে শুধুমাত্র পরলোকে অমরত্ব লাভ করিবার কল্পনা বা আকাঙ্ক্ষা আছে, উপনিষদে এই পারলৌকিক অমরতা জন্মের পৌনঃপুনিকতায় পর্যবসিত হয়। বর্গবিভক্ত সমাজের গঠন ঠিক রাখিতে ইহা যে কত অমোঘ অস্ত্র তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। পুরোহিতকে সুবর্ণা দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞের ফল পরলোকে বর্তাইলে মানুষের পক্ষে ইহা তৃপ্তিকর হয় না। তাই পূর্বের প্রচারোক্তিকে তখন বদলাইয়া আবার একটু নূতন ও সূক্ষ্ম করিয়া বলিতে হইল :—'পৃথিবীতে যে সব মহা ধনবান্ ও ভোগবান্ ব্যক্তি দেখিতেছ, তাহাদের সকলেই পূবজন্মের সুকৃতির ফলে এইরূপ হইয়াছে।' কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব ইহা এক ঢিলে দুই পাখী মারা—কারণ, এই যুক্তিতে পুরোহিতদের আমদানির উপায় দান যজ্ঞ প্রভৃতির ফল এই পৃথিবীতেই ফলান গেল ; আর ইহার সঙ্গে সমাজের আর্থিক অসমানতারও একটা পাকা রকমের ব্যাখ্যা হইয়া গেল। এইভাবে পূর্বজন্মের সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিয়া পীড়িত বর্গকে তখন বোঝান হইতে লাগিল :—'ইহজন্মকে তোমরা সর্বস্ব মনে করিও না—কারণ জন্মের পরও জন্ম আছে, জন্মান্তর আছে তাই এই জন্মের দরিদ্রতা বা সামাজিক বিষমতা,—এই সমস্ত দূর করিবার চেষ্টাও বৃথা।....আর তোমার দারিদ্র্য শুধু ভগবানের মর্জির উপর নির্ভর করে, এমনও ত নয় ; ইহার মূলে

* ইহার কারণ নিছক কৃতজ্ঞতা। † বিশেষত অপর জাতির মধ্যে আর্যের সংখ্যা যেখানে অল্প। ‡তাহাও অবিমিশ্র, কারণ 'বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্'—অর্থাৎ যজ্ঞে রূপা দিবে না।

তোমার পূর্বজন্মের সুকৃতি-দুষ্কৃতিও কারণরূপে বর্তমান আছে।...তাই অপরের সম্পত্তি দেখিয়া তোমার চোখ টাটানো খুব ভাল কথা নয়,—আর তুমি ত নিজেই বুঝিতে পারিতেছ, সংসারে ধনি-নির্ধনবর্গ শাশ্বত, ইহা ছাড়া উপায় নাই—ইহা না থাকিলে জন্মান্তরের শুভ অশুভ কাজের ফল প্রাপ্তি হয় না।... এইজন্য বৃথা পাষাণে মাথা কুটিয়া তুমিও বুদ্ধিমানের মত কাজ কর—ইহজন্মে ফল না পাইলেও সংসারে দানপুণ্য এবং যজ্ঞযাগের সমারোহ করিয়া যাও—তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জন্মে তুমিও রাজা কিংবা কোন ধনাঢ্যকুলে জন্ম লইয়া ভোগসুখের অধিকারী হইবে।'

পূর্বজন্মের সিদ্ধান্ত আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন স্বর্গলোক কিন্তু বিলীন হইয়া গেল না—বরং শাসকেরা আরও যত্নে এই পুরাতন তীরটিকে তাহাদের তূণীরে তুলিয়া রাখিল। পূর্বেই বলিয়াছি, উপনিষদ্‌কালে সমাজের নূতন জিজ্ঞাসার মুখে ব্রহ্মবাদের স্থাপনা হয়—তাহাতে মানববুদ্ধি অজ্ঞেয়তা ও নেতি নেতির চক্রে পড়িয়া আরবার বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে—এবং ইহার ফলে জাগতিক সমস্যাগুলিও মানুষের নিকট তুচ্ছ, নিঃসার বলিয়া মনে হয়। তবে সাধারণ জনতা এই সব অনধিগম্য তত্ত্বে প্রবেশ করিবার জন্য মাথা ঘামাইত না—তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার জন্য পুনর্জন্মসিদ্ধান্ত এবং প্রাচীন স্বর্গলোকই পর্যাপ্ত ছিল। তাহা হইলেও বহুধর্মের* বিরোধিতায় মানুষের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা থাকে—এইজন্য ধর্মধ্বজেরা প্রথম হইতেই 'নদী এক, ঘাট বহু'† এই রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করে—এবং ইহার সাহায্যে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষা দেয়, আর নানা যুক্তিতর্কে দেশকালভেদে উহাদের ঔচিত্য সিদ্ধ করিতেও যত্নবান হয়।

ভারতবর্ষের অতীত ধার্মিক বিকাশ লক্ষ্য করিলে আমরা আর একটি মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাইব—পূর্বে উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে যাহা বলা হইল, তাহা প্রকৃতপক্ষে আর্যমস্তিষ্কের কল্পনার ফল—তাহাতে আর্যঅনার্যের বর্ণভেদ এবং তাহাদের অধিকার ও আর্থিক স্বার্থসংক্রান্ত বিরোধের কোন মীমাংসা নাই; এইজন্য তখনকার সমাজে ইহার জন্যও একটি যে কোন রূপ উপায় আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়—পরে বাণিজ্যের উৎকর্ষের সঙ্গে এই আর্য ও আর্যভিন্ন জাতির বর্ণ ও বর্গবিরোধের কিছুটা সমাধান ঘটে। ইহার কারণ, ব্যাপারীদের নিজ বর্গের মধ্যে বহুসংখ্যক লোকই অনার্য কিংবা কোনরূপ সঙ্কর জাতীয় ছিল; বাণিজ্যযুগের পূর্বে তাহারা শিল্প অর্থাৎ তেল, শরাব, সোনাচাঁদি বা খাওয়াপরার উপযোগী দ্রব্যাদির ব্যাপার করিত—আর অন্যেরা

*বহুতর দেশী ও বিদেশী ধর্মের; † হিন্দী লোকোক্তি—'নদিয়া এক, ঘাট বহুতেরে'।

গোজামুজি আদিম ও গতানুগতিক কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকিয়া জীবন কাটাইয়া দিত। তবে ব্রাত্য প্রজাতন্ত্র বা ব্রাত্য 'গণের' নাগরিকেরা চিরকালই ভারতবর্ষের এই বর্ণ-ব্যবস্থার বিরোধী ছিল—তাই তাহাদের পক্ষে বণিকবর্গের সঙ্গে শুধুমাত্র মিলিত নয়, মিশ্রিত হইয়া যাওয়াই সহজ ও স্বাভাবিক হয়; বর্তমান অগ্রবাল, অগ্রহরী, রোহতগী কিংবা সরতোগী প্রভৃতি জাতিরা পূর্বেকার ব্রাত্য বণিকদেরই বংশধর। এই বণিক যে চিরদিনই শান্তির পূজারী ছিল সে কথা অবশ্য আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি—এবং প্রসঙ্গত বর্গ ও বর্ণ-বৈষম্যের মীমাংসা কি কারণে বণিকগণের এত কাম্য ছিল ইহাও সেখানেই আলোচিত হইয়াছে—তারপর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতি বণিকের প্রীতি, শ্রদ্ধা, পোষকতা ও আগ্রহ সম্পর্কে যুক্তিও ঐ স্থলেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দে ভারতবর্ষে বর্ণ-সমন্বয়ের আন্দোলন আরম্ভ করে। অল্পকালের মধ্যেই ইহা এত প্রবল রূপ নেয় যে, দেশের ব্রাহ্মণ্যস্বার্থ সত্যই বিপদে পড়িয়া যায়। এই আন্দোলনে আর্য আগমের কাল হইতে[১] উপনিষদ্‌ কাল পর্যন্ত চলিত বর্ণ-ব্যবস্থা শিথিল হইয়া পড়ে—এবং তাহাতে অনার্যদের দেবতা, তাহাদের ধার্মিক বিচার আর ঐতিহ্য সমস্তই গ্রহণীয়[২] বলিয়া গণ্য হয়। পরে গুপ্তদের সাম্রাজ্য স্থাপনার সময়[৩] এই সর্ববর্গসমন্বয়ের চেষ্টা আরও বাধাহীন হইতে পারে—পুনরুজ্জীবিত ব্রাহ্মণ্যধর্মও তখন এই এক বিশেষতা দ্বারাই তাহার পড়ন্ত ইমারতকে বাঁচাইয়া লয়; বর্গের অন্তস্থিত বর্ণবিভেদ শিথিল হইবার পর দুই-আড়াই হাজার বছর এখানে প্রচুর রক্তসংমিশ্রণ ঘটে। বুদ্ধের সময়[৪] সোণদণ্ড ব্রাহ্মণকে আমরা ব্রাহ্মণোচিত গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে[৫] গৌরবর্ণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে দেখি—কিন্তু বুদ্ধের পরবর্তী কালে এই বর্ণবিচারই শরীরের রঙ ছাড়িয়া 'গুণকর্মস্বভাব'কে স্বীকার করিয়া লয়। এই বর্ণসমন্বয়ে চতুর্বর্ণবিধির অস্তিত্ব লোপ না পাইলেও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে মিলনমিশ্রণে বাধা থাকে না—পুরোহিত ইচ্ছা করিলে আর্য, অনার্য, সঙ্কর, অথবা প্রাচীন নবাগত সকলকেই উচ্চবর্ণে স্থান দিতে পারিত। এই অবস্থায় যজ্ঞযাগ হইতে পূর্বে ব্রাহ্মণের যে আমদানি হইত তাহার পথ স্বভাবতঃই রুদ্ধ হইয়া আসে; কিন্তু অপর দিকে সমাজের বর্ণবিন্যাসে হাত থাকায় পুরোহিতেরা এই ক্ষতি সুদে-আসলে পূরণ করিয়া লয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির

১। বলিতে পারি বৈদিক কাল হইতে। ২। বর্ণসমন্বয় আরম্ভ ইহার পূর্বে আর্য জাতির নিকট ইহা অগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইত—এই নিষেধ আর্যভিন্ন জাতির সংস্কৃতির উপর একরূপ সামাজিক বয়কটের মত ছিল। ৩। চতুর্থ খ্রীষ্টশতাব্দ। ৪। ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ৫। সোণদণ্ড সুত্ত (দীর্ঘনিকায়, ১।৪)।

বর্ণগত বিবাদ যে তখন শুধু ভাবপ্রবণতার জন্য হইয়াছিল এইরূপ মনে করিবার হেতু নাই—কারণ বর্ণবিন্যাসের উপর তখনকার সমাজের আর্থিক সুবিধা অসুবিধা লাভের একটা বড় প্রশ্ন নির্ভর করিত। আর ইহারই অন্তিম নির্ণয় ব্রাহ্মণদের হাতে থাকায় তাহাদের শক্তি-সম্পত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করা চলে না।

এই মহাসমন্বয়ের যুগে শক, যবন প্রভৃতি নবাগত শাসক জাতির এক বিরাট অংশ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অন্তর্গত হয়—ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অহীর, জট্ট, গুর্জর প্রভৃতি জাতির প্রভুত্বশালী ব্যক্তিরাও ক্ষত্রিয়সমাজে স্থান লাভ করে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম পুরাতন বর্ণব্যবস্থার উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিরন্তর আঘাত হানিয়াছিল—এই মহাবর্ণসমন্বয় ইহারই ফল, অর্থাৎ প্রাচীন বর্ণসমন্বয় চেষ্টার ইহা সার্থক ক্রিয়াত্মক রূপ। ইহার প্রভাবে স্বদেশী ও বিদেশী অদ্বিজেরা সমাজে উচ্চবর্ণের সমান আসন লাভ করিতে সমর্থ হয়—আর ইহাতে ব্রাহ্মণের যে সমর্থন দেখি তাহার কারণও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।

এখন সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিব যে, ধর্ম সকল দেশেই সামন্ত ব্যবস্থার পোষক হইয়া শাসকের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখে। তাই বলিয়া সময় সময় ধর্মের সহায়তাও নূতন সমন্বয় বা নূতন বিন্যাস যে সম্ভবপর হয় না এমন নয়; কিন্তু তাহার মূলে কারণ এই যে, সমাজের আচ্ছন্ন আগুন যেন তাহার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শাসককেও পোড়াইয়া না দেয়। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে বিচার করিলেও আমরা ঠিক এই একই সত্যে উপনীত হইব: উপনিষদের অজ্ঞেয় রহস্যবাদ, বুদ্ধকালীন বিজ্ঞানবাদ, অথবা বহিরাগত য়ুনানী পরমাণুবাদ—সমস্তই সামন্ত যুগের বর্গহিত-প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে আমরা অন্যত্র* আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এই প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করিলাম।

(৩) **সদাচার**—সাধারণভাবে হত্যা, চৌর্য, মিথ্যাভাষণ ও যৌন-দুরাচার হইতে বিরত থাকার নামই সদাচার। আদিম মনুষ্য-সমাজে মিথ্যাভাষণের বিপক্ষে কোনরূপ সদাচার প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল না; কারণ তখন মিথ্যাচার মানুষের নিকট সত্য সত্যই এক অপরিচিত ও অস্বাভাবিক বস্তু ছিল—মনে এক জিনিস রাখিয়া বাহিরে তাহাকে অন্যভাবে প্রকাশ করা তখনও মানুষ শিখিতে পারে নাই। পরে অবশ্য অন্যান্য দুরাচারের মত মিথ্যাচারও একটি কলা হিসাবে বিকাশ লাভ করে। লোভ বা ভয়ের বশবর্তী হইয়া স্বতঃস্ফূর্ত-

* দর্শন দিগ্দর্শন।

ভাবে কোন মিথ্যা কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া আসা সম্ভব—কিন্তু ইহা মিথ্যাচারের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ নয়, অর্থাৎ মিথ্যাচারীর দায় সেখানেই শেষ হইয়া যায় না: একটি মিথ্যা কথা বলিলে ইহার বিরুদ্ধ-সত্যকে অপ্রকাশ রাখিবার জন্য মিথ্যাবাদীকে সদা সতর্ক থাকিতে হয়। আদিম মানবের পক্ষে এইরূপ চিরক্ষণিক সতর্কতা যে কোন মানসিক পীড়ার মতই অসহ্য মনে হইত; তাই সত্যভাষণের জন্য গুরুতর দুর্দৈব ভোগ করিতে হইলেও সত্য বলাই তাহার পক্ষে সহজ ছিল। বর্তমান আদিম অবস্থার জাতিগুলির মধ্যে মিথ্যাভাষণ এখনও খুব বেশি প্রচলিত হয় নাই—যে সামান্য কিছু মিথ্যাচার তাহাদের মধ্যে দেখা যায় তাহা সভ্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। মিথ্যাচার প্রকৃতপক্ষে বর্গবাদী সমাজেরই দান—বর্গসমাজ মিথ্যাচারের বিপক্ষে সদাচার প্রচার করিলেও মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত বর্গভিত্তিকে নষ্ট হইতে দিতে পারে না। সমাজে মিথ্যাবাদকে উচিত বলিয়া চালাইতে সর্বপ্রথম হয়ত ব্যাপারীরাই চেষ্টা করে; কারণ পণ্যের মূল্য, গুণ ও পরিমাণ সম্পর্কে মিথ্যাকে সত্য করিলে ব্যাপারীর লাভ বেশি হয়।

তারপর, অন্যান্য দুরাচারের মত চৌর্যের আধারও হইতেছে ব্যৈক্তিক সম্পত্তি—তাই ইহার ব্যাখ্যা সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত স্বামিত্বের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গেলে অবশ্য অপরের স্বত্ব অপহরণকেই সাধারণভাবে চৌর্য বলিতে হয়—কিন্তু সেই স্বত্বের অধিকারী কিরূপে তাহার মালিকানা পাইলেন ইহা না বলিলে চৌর্যের ব্যাখ্যা অসমাপ্ত থাকে। একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখিব, কোন বস্তুই এক ব্যক্তি, শুধু এক ব্যক্তির শ্রম বা চিন্তার ফলে সৃষ্ট হইতে পারে না। সমাজই মানুষকে তাহার ভোগবস্তু উৎপাদনের জন্য শ্রম ও চিন্তা নিয়োগ করিতে শিক্ষা দিয়াছে—এইজন্য ভোগবস্তুর উপর সমাজের যে স্বত্ব আছে তাহা অস্বীকার করা সাধুতার পরিচয় হইতে পারে না। এই ক্ষেত্রে যদি বলা হয়—সামাজিক স্বত্ব সকল বস্তুর উপরই সমান, কিন্তু এই স্বত্বের মধ্যে যে বিশেষতা তাহা সমাজের নহে, ব্যক্তির—তাহা হইলেও এক্ষেত্রে যুক্তিটা খুব সঙ্গত হইবে না—কারণ যাহাকে সামাজিক স্বত্ব বলা হইল তাহাতেই সমাজের অধিকার কই? তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে—কোন বিশেষ বস্তুর উপর বিশেষ ব্যক্তির স্বত্বই বা কিভাবে স্থাপিত হয়? বস্তুর নির্মাণ, বা অন্য যে কোন প্রকারের বিচারই হউক, স্বত্বস্বামীরা এখানে চোর সাব্যস্ত হইবেন। আচ্ছা, তবে সামন্তবাদী সমাজ সদাচার প্রচার করিতে গিয়া নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারিতে চাহিল কেন? ইহার উত্তর এই যে, সামন্ত যুগের সদাচার 'পরদ্রব্য অপহরণ'কেই চৌর্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিল—কিন্তু

বস্তুর উপর আত্মপর অধিকার কিরূপে প্রতিষ্ঠা হয় তাহার মূল তাহারা উদ্ঘাটন করে নাই—তাহাদের বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল যে, সামন্তবাদের প্রযত্নে জনতা ব্যৈক্তিক স্বত্বাধিকারীকে আর অস্বীকার করে না—সাধারণভাবে স্বত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা জনতার মনে ততদিন বেশ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে—আর এই ধারণা অনুযায়ী নিজেরা শ্রম করিয়া তাহার ফল অন্যের হাতে তুলিয়া দিতেও তাহাদের কোন আপত্তি নাই। এই অবস্থাই দরিদ্রকে সামন্তদের শ্রমহীন উপার্জনের প্রতি নির্লোভ রাখাই এই সদাচারের উদ্দেশ্য।

সামন্ত যুগে যৌন-দুরাচারকে পাতক, এমন কি মহাপাতক ও অতিপাতক বলিয়া ঘোষণা করা হয়—কিন্তু অন্যান্য সদাচারের মতন ইহার সীমা নির্ধারণের বেলায়ও পক্ষপাতিত্ব বড় কম হয় নাই। বরং এই ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বও হইয়াছিল দুই দিক হইতে—প্রথমত ধনি-নির্ধন বৈষম্যের দিক হইতে, এবং দ্বিতীয়ত স্ত্রী-পুরুষ অধিকারভেদের দিক হইতে। যাহাই হউক, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, যৌনাচার একটি সাপেক্ষ নিয়ম—বিভিন্ন দেশ, কাল ও সমাজে প্রতিনিয়ত ইহার মান পরিবর্তিত হইয়াছে। য়ুরোপে সপত্নী বিবাহ কিংবা বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত অপরের যৌনসম্পর্ক দুরাচার বলিয়া বিবেচিত হইত; কিন্তু ভারতবর্ষে কৃষ্ণ, দশরথ প্রভৃতি সৎপুরুষের দৃষ্টান্তে ইহা সদাচার হিসাবেই প্রচলিত থাকে। তবে স্ত্রীর পক্ষে য়ুরোপ এবং ভারতবর্ষে উভয় স্থলেই বহুচারিতা নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী বর্তমানে তাহাকে প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চকন্যার মধ্যে স্থান দেওয়ায় এই নিয়মের ব্যাতিক্রমও দেখা যায়। তিব্বত ও হিমালয়-প্রান্তের কয়েকটি জাতির মধ্যে একাধিক ভ্রাতার এক স্ত্রী গ্রহণের প্রথা এখনও বর্তমান আছে। এমন কি সেখানকার সমাজ ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না যে, এই রীতি দুরাচার কিংবা নিন্দনীয়। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের মত সেই অঞ্চলের শিক্ষিত ব্যক্তিরাও নিজের একাধিক পিতার নাম বলিতে কুণ্ঠিত হয় না।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যৌন-সদাচার একটি সাপেক্ষ নিয়ম, অর্থাৎ দেশকাল-ভেদে* সমাজ যে নিয়ম অনুমোদন করে তাহাই সদাচার। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে সামন্ত যুগের সদাচারের অর্থ বুঝিতে আমাদের বিলম্ব হইবে না। আমরা জানি পুরুষের বেশ্যাগমন সমাজ দ্বারা অনুমোদিত কর্ম, বেশ্যার পেশাকেও সমাজই নারীর জীবিকা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাই বেশ্যাগামী সমাজের চোখে নিন্দনীয় হইলেও তাহার উপর কোন রাজদণ্ড প্রদত্ত হইত না—সম্ভবত খুদা ও পরলোকের উপর বরাত দিয়াই সমাজ এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত

* এবং পাত্রভেদেও, যেমন নারীপুরুষে বা ধনিনির্ধনে।

হইয়া আছে। কিন্তু সম্পত্তিস্বার্থের বিঘ্নকর বলিয়া চৌর্যের দণ্ডবিধান সমাজ খুদার হাতে তুলিয়া দেয় নাই। এই সব দিক হইতে চিন্তা করিলে সম্পত্তি ও যৌনাচারের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সম্পত্তির স্বামী চরম যৌন-দুরাচারী হইলেও সমাজের তিনি চৌধুরী ব্যক্তি—সমাজ তাঁহার আচার-ভ্রষ্টতাকেও দুঃসহ নীরবতায় সহ্য করে, এই কারণে তাহার প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় না। তাই অন্যান্য সদাচারের মত সামন্ত যুগের যৌন-সদাচারও মিথ্যাচারেরই নামান্তর মাত্র। সামন্তবাদীরা সমাজে নারীকে পতিতা করিয়া বেশ্যাবৃত্তির জন্ম দিয়াছে, অর্থের বিনিময়ে তাহারাই প্রথম দেহবিক্রয়কে জীবিকা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে—তাই সমাজে অতি সাধারণ-ভাবেও সদাচার বলিতে যাহা বুঝি, এইখানে তাহার স্থান কোথায়? যৌন-সদাচারের আরও নমুনা পাইতে হইলে সামন্তদের* নর্মভবনের বিবরণ লইয়া দেখুন।

সামাজিক নিয়মে হত্যা প্রধান দুরাচারের মধ্যে একটি—তাই মনুষ্যহত্যা হইতে ক্রমে প্রাণিহত্যা, এবং পরে হিংসা পর্যন্ত অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু সামন্তবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের অন্য সেনাবাহিনী সৃষ্ট হয়, এবং তাহার সহায়তায় সামন্তেরা অপরের ধনসম্পত্তি অপহরণে লিপ্ত হয়,—তাই তাহাদের মুখ হইতে হত্যা দুরাচার বলিয়া ঘোষিত হওয়া সামাজিক প্রতারণারই অনুরূপ। এই ত্রুটি ঢাকিবার জন্য সামন্ত নীতিধর্মে হত্যাকে সার্থক ও নিরর্থক এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—কিন্তু ইহার মূল অর্থও এই যে, অধিকারারূঢ় বর্গের পক্ষে হত্যায় দোষ নাই—অর্থাৎ তাহাদের বাজ্যানুমোদিত হত্যামাত্রেই তখন সার্থক ও ন্যায়োচিত হত্যা। কিন্তু আমরা জানি, সামন্ত যুগে সামান্য চৌর্যের অপরাধেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত—এইজন্য নীচতম ব্যৈক্তিক স্বার্থ রক্ষার জন্য হত্যাও তখন সার্থক হত্যাই ছিল! সামন্ত যুগের ন্যায়ধর্মকে তখনকার লোকমত 'মৎস্য ন্যায়'† নামে অভিহিত করিত—সামন্ত সদাচারের আলোচনার পর ইহা যে কত সত্য তাহা আমরা বুঝিতে পারি। অন্যান্য সদাচারের মত তখনকার হত্যাবিরোধী সদাচারও প্রতারণারই নামান্তর—কিংবা এই ক্ষেত্রে তাহা পূর্ববর্তী সমাজের ন্যায়ধর্মের ক্ষীণ অবশেষও হইতে পারে।

* শুধু পুরাতনদের নহে, অধুনাতনদেরও।

† বড় মাছ ছোট মাছকে গিলিয়া খাইবার যে ন্যায়।

৬। স্ত্রী ও বিবাহ

(১) স্ত্রী—পিতৃসত্তা যুগে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য কমিয়া যাইবার কারণ আমরা পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি। সামন্ত যুগে তাহাদের অবস্থা যে আরও কত নীচে নামিয়া যায় তাহা নারীর দেহবিক্রয়ের ব্যবসায় হইতে বুঝিতে পারি। এই যুগে উচ্চবর্গের লোক স্ত্রীকে ভোগবস্তুর অধিক আর কিছুই মনে করিত না; এবং সমাজের সম্পত্তিতে তখন স্ত্রী-জাতির কোন স্বামীত্ব বা অধিকার থাকিত না—শুধু ভোগের বেলায় স্ত্রী পুরুষের ইচ্ছাক্রমে তাহার সহভাগিনী হইতে পারিত। বসন, ভূষণ, প্রসাধন সমস্তই তখন পুরুষের চিত্তপ্রসাদনের জন্য নারীকে দেওয়া হইত। মনু হয়ত ইহার ঔজ্জ্বল্যে হতচকিত হইয়াই সেই যুগে নারীপূজার[১] মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু সামন্ত সমাজের গ্লানির আচ্ছাদন হিসাবে এই পূজা যে কত বহুমুখী বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই জানা আছে। উপনিষদের ঋষি স্ত্রী সম্পর্কে মনু ও তাহার পোষক সামন্ত সমাজ হইতে বহু স্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন। ঋষির বক্তব্য ছিল 'স্ত্রীর নিজের রুচির জন্য স্ত্রী প্রিয় হয় না, পুরুষের রুচি-বিধানের জন্যই স্ত্রী প্রিয় হয়'।[২] সামন্ত যুগে স্ত্রীর অবস্থা বুঝিবার জন্য আর একটি প্রচলিত নীতিবাক্য স্মরণ করিতে পারি—'কুমারীকালে তাহার রক্ষক পিতা, যৌবনকালে পতি এবং বার্ধক্যের রক্ষক হইবে পুত্র; স্ত্রীর কখনও স্বতন্ত্রতা থাকা উচিত নয়।'[৩]

কিন্তু ভারতবর্ষে এই অ-স্বতন্ত্রতা যে কত উৎকট হইয়া উঠিয়াছিল, এখন সেই কথাই বলিতে হয়। গুপ্তযুগ শেষ হইবার পর ভারতীয় সমাজ তাহার স্ত্রী-জাতির জন্য সহমরণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল—এই প্রথা অনুসারে মৃত পতির শবের সঙ্গে প্রত্যেক স্ত্রীর পুড়িয়া মরা অনিবার্য কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। মাত্র একশত বৎসর আগে ইংরেজ সরকারের সহায়তায় এই ক্রূর প্রথা বন্ধ করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্বে পনরশত বৎসর ধরিয়া এই হত্যাযজ্ঞ ভারতবর্ষে বাধাহীনভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। আমার মনে আছে একদিন প্রসঙ্গ-ক্রমে একজন সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত বন্ধু[৪] আমার নিকট বলিয়াছিলেন, 'দেখুন, আপনাদের বিধবাবিবাহ যখন এখনও অপ্রচলিত, তখন সমাজশুদ্ধির দিক হইতে সতীপ্রথা ঠিকই ছিল....ইহা বন্ধ করিয়া সরকার খুব ভাল কাজ করেন নাই।'

১। মনুসংহিতার 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে' ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য—মনু সেখানে নারীপূজাকে দেবপূজার সামিল বলিয়াছেন।

২। 'নবৈ ভার্যায়াঃ কামায় ভার্যা প্রিয়া ভবতি; আত্মনস্তু কামায় ভার্যা প্রিয়া ভবতি।'

৩। 'পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। পুত্রো রক্ষতি বার্ধক্যে ন স্ত্রি স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥'

৪। ইনি আধুনিক জগতের প্রগতি সম্পর্কেও একেবারে জ্ঞানহীন নহেন।

যাহাই হউক, সামন্ত যুগে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবার ফলেই বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হয়। পরে হিন্দুরা ধর্মের সঙ্গে জড়াইয়া ইহাকে একটি প্রচণ্ড ধার্মিক নিষেধ হিসাবে খাড়া করে। অনেক অহিন্দু জাতির মধ্যে তখনও ধর্মের দিক হইতে স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহে আপত্তি ছিল না—কিন্তু সেখানে সম্ভ্রান্ত কুলের স্ত্রীরা সন্তানবতী হইবার পর আর পতিপরিগ্রহ করিত না। এখানে মনে রাখিতে হয় যে, এই আমৃত্যু বৈধব্য স্ত্রীর কোন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নিয়ম নহে; কারণ সামন্ত যুগের ধর্ম না হউক, সমাজ সর্বদাই বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিল। ভারতবর্ষের উচ্চকুলের মুসলমানদের মধ্যে বিধবাবিবাহ এখন পর্যন্ত বর্জিত আছে। মোগল আমলে কয়েক পুরুষ ধরিয়া রাজকুমারীদের অবিবাহিতা থাকার রীতিও চলিত ছিল; জানা যায় ঔরংজেব সম্রাট্ হইবার পর এই রূঢ় প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে সামন্ত যুগে স্ত্রী-জাতির অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় ছিল তাহা বুঝিতে পারি। এশিয়া খণ্ডের এক বৃহৎ অংশে তখন স্ত্রীর মুখ খুলিয়া বাহিরে যাওয়া ধর্ম-বিরুদ্ধ ছিল।

য়ুরোপে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য মুসলমানী দেশের তুলনায় স্ত্রী-জাতির অনেকটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। সেখানে ভারতীয় সামন্ত প্রথায় স্ত্রীকে অসূর্যম্পশ্যা বলিয়া গৌরব করিবার উপায় ছিল না; কিংবা শাহী হারেমের জনানাখানায় তাহাদিগকে অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখাও সম্ভব ছিল না। য়ুরোপীয় পুরুষের এক স্ত্রী বর্তমানে পুনর্বিবাহ করা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইত; এবং পুরুষের মত সেখানকার নারীও পূর্বের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারিত। খ্রীষ্ট ধর্ম ইহাকে না মানিলেও* পূর্বাগত অধিকার বলিয়া তাহাকে লুপ্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া য়ুরোপের নারীই যে পুরুষের সমানাধিকার পাইয়াছিল এইরূপ নয়। য়ুরোপে স্ত্রী-জাতির অবস্থা সামন্ত যুগে কি ছিল তাহা আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। এবং ইহা ছাড়া ভোট দেওয়া, পার্লামেণ্টের সদস্য হওয়া, কিংবা অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজে ছাত্রী হইয়া প্রবেশ করা, এই সব সাধারণ নাগরিক অধিকারের জন্য তাহাদিগকে আমাদের চোখের উপর সামাজিক বিগ্রহ করিতে হইয়াছে।

(২) **বিবাহ**—আদিম সাম্যবাদী সমাজে যুথবিবাহ এবং জনযুগে অনিশ্চিত মিথুনবিবাহ প্রচলিত ছিল। পুরুষসংসর্গের ব্যাপারে এই দুই অবস্থায়ই স্ত্রী-জাতির প্রচুর স্বতন্ত্রতা দেখা যায়। অবশ্য এখানে এই স্বতন্ত্রতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়—ইহার অর্থ শুধু এই যে, স্ত্রী তখনও পুরুষের জঙ্গম

* খ্রীষ্টবাদ চিরকালই বিবাহ-বিচ্ছেদের বিরোধী, রোমান ক্যাথলিকরা এখনও ইহাকে নিন্দা করে।

সম্পত্তি হইয়া উঠে নাই। তখন বিবাহ স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক প্রেম অর্থাৎ ভোগযানের প্রভাববিহীন প্রেরণায় সম্পন্ন হইত। এই প্রকার বিবাহসম্বন্ধকে হিন্দু পুরাণের দেবাঙ্গনাদের স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ প্রেমের সহিত তুলনা করা যায়। পিতৃসত্তা যুগে পুরুষ সমাজে প্রধান হইয়া উঠিবার পর স্ত্রী-জাতির এই স্বতন্ত্রতা অপহৃত হয়। অবশ্য পিতৃসত্তার প্রথম পাদে প্রভুতা বা ধনের জোরে পুরুষের দাসীসংসর্গের অধিকার ছিল না। পরে পিতৃসত্তার পরিণতির সঙ্গে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তাহারা বহুবিবাহের অধিকারী হয়। কিন্তু স্ত্রীর জন্য একবিবাহ একবার নির্ধারিত হইয়া গেলে সারা সামন্তকাল তাহা অপরিবর্তিত থাকে।

মিশরের সর্বপ্রাচীন সামন্ত সমাজের দিকে তাকাইলে সেখানে বহুবিবাহের প্রকাশ্য অনুমোদন দেখি। তবে এই ক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, বহুবিবাহ তখন সমাজে ধনাঢ্য ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও সামর্থ্যে কুলাইত না। সামন্ত যুগের ধনীরাই প্রথম বহুবিবাহের মধ্য দিয়া সমাজে এই অপরূপ ভোগপদ্ধতি সৃষ্টি করে।[১] কিন্তু মিশরীয় সামন্তবাদের একটি পরম গুণ এই যে, সেখানে স্ত্রী কখনও অবগুণ্ঠিতা হয় নাই। মিশরের অতি সম্ভ্রান্ত সামন্ত বংশের নারীও তাহার পতির সহিত জনতার সম্মুখে বাহির হইতে পারিত[২]। ইহা ছাড়া, মিশরীয় সামন্তবাদ স্ত্রীর অপর কয়েকটি মৌলিক অধিকারও স্বীকার করিয়া লইয়াছিল: মিশরে স্বামীর মত স্ত্রীও সম্পত্তির মালিক হইতে পারিত এবং এই সম্পত্তিতে তাহার দানবিক্রয়ের অধিকার থাকিত, স্ত্রী সেখানে স্বয়ং উত্তমর্ণ হইয়া স্বামীকে টাকা কর্জ দিত। কিন্তু ভারতবর্ষে বহুদিন পর্যন্ত নারী শুধু তাহার স্বামীর সম্পত্তির ভোগাধিকারিণী ছিলেন। এই অবস্থায় প্রাচীন মিশরের নারী যে সামন্ত যুগের অপর নারীর তুলনায় স্বাধীন ছিল তাহা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু এই সব প্রাচীন অধিকারের সঙ্গে পরবর্তী যুগের তুলনা করিলে দেখা যায়—স্ত্রীর অবস্থা সমাজে ক্রমেই খারাপ হইয়াছে, ক্রমেই তাহার মৌলিক অধিকারগুলি লুণ্ঠিত হইয়াছে, এবং শেষে স্ত্রী পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আজ হইতে চারি হাজার বৎসর পূর্বের বাবুল সামন্ত সমাজে[৩] স্ত্রীসংসর্গের জন্য বৈধ-বিবাহের প্রয়োজন হইত; এবং সেই সমাজে

১। মনে রাখিতে হইবে ব্যৈক্তিক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সামন্তের বিত্ত তখন ফাঁপিয়া উঠিয়াছে—তাই তাহার এক তুচ্ছ অংশের বিনিময়ে অজস্র স্ত্রীরূপী সম্পত্তি পাইলে তাহারা ছাড়িবে কেন?

২। ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হইবার পর মিশরীয় নারীর এই অধিকারও ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়, এবং ইহার পর প্রায় তের শতাব্দী পর্যন্ত তাহা অপরিবর্তিত থাকে।

৩। বাবুলের সামন্ত সমাজ সিন্ধু-উপত্যকার তৎকালীন আর্যভিন্ন সমাজের সহিত সম্পর্কিত ছিল—এই সূত্রে আদি ভারতীয় সমাজের বিবাহ-ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন অনুমান চলিবে কি?

স্ত্রী এবং পুরুষ এই উভয়েরই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিবার অধিকারও থাকিত—ইহা ছাড়া, বিবাহের সময় প্রত্যেক স্ত্রীই সেখানে তাহার পৈতৃক সম্পত্তির একাংশ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইত। বাবুল সমাজে স্ত্রীকে তিলাক দিতে হইলে তাহার পিতৃগৃহ হইতে আনীত সমস্ত সম্পত্তি তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হইত ; এবং সেই স্ত্রী সন্তানবতী হইলে পৈতৃক সম্পত্তির সহিত স্বামীর সম্পত্তিরও কিছু অংশ তাহার সন্তানের জন্য প্রাপ্ত হইত। সেই সমাজে স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী হইলে কিংবা পতির অপযশ গাহিলে তাহাকে জলে ফেলিয়া দিবার নিয়ম ছিল, পুরুষ স্বেচ্ছাচারী হইলে কিংবা স্ত্রীর অপমানকর কাজ করিলে স্ত্রী পিতৃধন লইয়া বাপের বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে পারিত।

আগে ভারতীয় সামন্ত যুগের একটি বিবাহের আমরা বিশদ্ বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। সেই সময়ের বিবাহকে সামাজিক প্রতিজ্ঞা না ধরিয়া ধার্মিক কৃত্য মনে করিলেই বেশি ঠিক হয়। কিন্তু ধার্মিক কৃত্যই হউক আর সামাজিক প্রতিজ্ঞাই হউক, বিবাহের বন্ধন তখন একতরফা ছিল ; যত নীতি-নিয়মের কড়াকড়ি তাহার সমস্তই ছিল স্ত্রী-জাতির সম্পর্কে, পুরুষ ছিল তখন স্বাধীন, স্বতন্ত্র, এমন কি স্বেচ্ছাতন্ত্র। তাই বিবাহে প্রেমের বন্ধন তখন তত বড় ছিল না, বিশেষত সামন্ত পরিবারে তাহা ভোগযানেরই আঙ্গিক ছিল। ইহা ছাড়া, তখনকার বিবাহ দুই পরিবারের বিত্ত ও প্রতিপত্তির উপর নির্ভর করিত—এই বিবাহে স্বামী পত্নীর রক্ষক হইত, এবং স্ত্রীকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিত—কিছুমাত্র সন্দেহ হইলে তাহাকে হত্যা করার অধিকারও স্বামীর ছিল। কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রী পতির স্বেচ্ছচারের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করিতে পারিত না—গোপনে জহরের গুটির মত এই নির্মমতাকে সে কণ্ঠহীন করিয়া লইত। ইহার কারণ স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারে সমাজের নাক কাটা যাইত, আর পুরুষের ভ্রষ্টাচারকে সমাজই ফুঁ মারিয়া উড়াইয়া দিত।

১। ইস্লাম ধর্ম প্রচারিত হইবার পর মিশরীর নারীর এই অধিকারও লুপ্ত হইয়া যায়, এবং ইহার পর প্রায় তের শতাব্দী পর্যন্ত তাহা অপরিবর্তিত থাকে।

২। বাবুলের সামন্ত সিন্ধু-উপত্যকার তৎকালীন আর্যভিন্ন সমাজের সহিত সম্পর্কিত ছিল—এই সূত্রে আদি ভারতীয় সমাজের বিবাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন অনুমান চলিবে কি ?

৩। Code of Humburabi Section 196.

ষষ্ঠ অধ্যায়

সভ্য মানব সমাজ (৩)

(গ) পুঁজিবাদী যুগ

এখন পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের আলোচনায় আমরা একটি মূল সাধারণ তথ্য বুঝিতে পারিলাম ; অর্থাৎ সমাজের সকল পরিবর্তন জীবনোপযোগী বস্তুসমূহের উৎপাদনশক্তির উপর নির্ভর করে। এই উৎপাদনশক্তি আদিম সাম্যবাদী সমাজে বিকাশের প্রথম স্তরে আবদ্ধ ছিল। সমাজে তখনও শ্রমবিভাগের সৃষ্টি হয় নাই, মানুষ ধাতবাস্ত্রের ব্যবহারও শিখিতে পারে নাই ; তাই স্বল্প-অভ্যস্ত হাত ও কাঠপাথরের আদিম হাতিয়ার—এই দুই প্রাথমিক শিল্পসাধন লইয়া মানুষ কাজ যাহা করিত—তাহাতে উৎপাদন হইত বড়ই কম, কিন্তু শ্রম লাগিত অনেক বেশি। তিব্বতের অনেক জায়গায় খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পৌছিয়াও যাঁতার চলন হয় নাই—যাঁতার বদলে সেখানে পাথরের বড় বড় হামানদিস্তায় গম ফেলিয়া ছাতু কোটার কাজ হইত ; কিন্তু হামানদিস্তায় কোটা ছাতু কি পরিমাণ মোটা, এবং কি পরিমাণ কম পেষা, আর কি পরিমাণ পরিশ্রমের পর যে কতটুকুই বা ছাতু তৈয়ার হইবে তাহার অনুমান খুবই সহজসাধ্য। আদিম সাম্যবাদী সমাজের শিল্পসাধন ত ইহার তুলনায়ও ঢের অকিঞ্চিৎকর ছিল, তাই তাহাদের কায়িক শ্রমের শক্তি অর্থাৎ উৎপাদনশক্তিও অকিঞ্চিৎকর ছিল নিঃসন্দেহ।

উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নূতন সাধন আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে—আর উৎপাদনের শক্তি বাড়ায় সমাজের পূর্বস্থিতি নড়চড় হইয়া গিয়া সেখানেও বিপর্যয় ঘটিয়াছে। আমার বাল্যাবস্থায় পাথরের ঘানিচাকে ফেলিয়া আখ মাড়াইতে দেখিয়াছি ; এই সব এক একটা ঘানিপাথরের ওজনই কম করিয়াও কয়েক শ’ মণ হইত ; অন্ততঃ পঞ্চাশ জন জোয়ান না হইলে এই ঘানিপাথর টানিয়া আনা চলিত না। চুণার * হইতে মাসাধিক কালের পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া পাথরদেবতা আমাদের গ্রামে ঢুকিতেন—পথে কত বিপত্তিকর নদীনালা তাঁহাকে ডিঙাইয়া আসিতে

* মির্জাপুর (যুক্তপ্রদেশ)।

হইত ইহার কোন ইয়ত্তা নাই। ঘানিপাথরের ক্রেতাকে এই জগন্নাথের রথ টানিবার জন্য সমুদয় লোক নিজ নিজ গ্রাম লইয়া যাইতে হইলে আর উপায় ছিল না—অন্ততঃ আমার ঠাকুরদাদার মত পুরুষের পক্ষে তাহা হইলে গৃহাঙ্গনে প্রস্তরপ্রতিষ্ঠা অসম্ভবই থাকিয়া যাইত—কারণ এতগুলি জোয়ান মরদের মাসাধিক কালের মাহিনা আর আটাছাতুর দাম পাথরের দামের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। তাই গ্রাম্য নিয়মে ইহার তখনকার মত একটা সমাধানও ছিল, ঘানির ক্রেতা মাত্র এক বা দুইজন লোক লইয়া চুণার যাত্রা করিতেন; ইঁহাদের একজনের পিঠে খোরাকীর উপযুক্ত আটাছাতুর গাঁঠরি থাকিত, অপর জন পাথর খুঁদিবার সাজসরঞ্জাম—অর্থাৎ বাটালি, হাতুড়ি প্রভৃতি বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। চুণার পৌছিবার পর তাঁহারা পাহাড়ের কঠিন শিলাচত্বর কাটিয়া ঘানির আকারে উহা পৃথক করিয়া লইতেন—সোয়া দুই হাজার বৎসর আগে নৃপতি অশোকও অনুরূপ শিলাখণ্ড দিয়াই তাঁহার স্তম্ভ নির্মাণ করান। পাহাড় কাটিয়া ঘানি তৈয়ারের পর ঘানিচাকের পেট খুঁদিয়া প্রথমেই দুই দিকে ফোঁড় করিয়া লওয়া হইত; তারপর সেই ফোঁড়ের মধ্যে কাঠ ঢুকাইয়া চরখির মত করিয়া কাঠের দুই প্রান্তে রশি বাঁধিয়া দেওয়া হইত।

কোন গ্রামে ঘানি আসিয়া পৌছিয়াছে খবর পাইলেই লোকজন সব কাজ ফেলিয়া প্রথম উহাকে গ্রামসীমার বাহিরে দিয়া আসিত। কারণ ঘানি তখন সামান্য ঘানি ছিল না, ঘানি গ্রামীণ মানুষের 'মহাদেব বাবা'—এই মহাদেব বাবা যতক্ষণ গ্রামে গাঁড়া পড়িয়া আছেন, ততক্ষণ অন্নকণা মুখে তুলিলে মহাপাপ হইত। এইভাবে মাসভর মহাদেব বাবাকে টানাইয়া আনিয়াও ঘানিওয়ালার এক পয়সা টানাখরচ পড়িত না, নিজ বাড়ীতে আসিয়া ঘানি পৌছা পর্যন্ত ঘানির ক্রেতা অনেক রকম ব্রতনিয়ম পালন করিতেন—কি জানি যদি বিগড়াইয়া গিয়া মহাদেব বাবা পথের কোন নদী নালায় গাড়িয়া বসেন। কিন্তু মহাদেব বাবাকে বাড়ী লইয়া আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে কাজ আদায় করাও খুব সহজসাধ্য ছিল না। প্রথমত মাটিতে গড় কাটিয়া এই বিরাট পাথরদেবতাকে তাহার মধ্যে প্রোথিত করিতে পড়শীর সাহায্য লাগিত; পরে নিত্য আখ পেষার সময় কোন একক পরিবারের আয়ত্তসাধীন ছিলনা বলিয়া পাড়ার সকলেই তাহাতে সহায়তা করিত—পাথরের আখমাড়া ঘানি, এইভাবে তখনকার গ্রাম্য জীবনে এক যৌথসংস্থা বা মিলিত উৎপাদন রীতির রূপ পরিগ্রহ করে।

চলিত শতাব্দীর প্রথম দিকেই লোহার কল আসিয়া গ্রামে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে গ্রামের কোথাও আর পাথরের ঘানির প্রচলন দেখা যায় না। মানুষ তাহার পুরাতন শিল্পসাধনকে এইভাবে ক্রমেই ভুলিয়া যাইতেছে। আখ মাড়াইবার সময় প্রাচীন যৌথ কর্মপন্থার এখন কোন কদর নাই। মহাদেব বাবাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌঁছাইয়া দিবার সহস্রবর্ষাগত রীতি আজ বন্ধ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সমাজের যে সংগঠন ছিল তাহাও আজ বিপর্যস্ত। প্রথম প্রথম লোকে দুঃখ করিয়া বলিত, লোহার কলের সে মহিমা কই? পাথরের ঘানিতে লোক খাটিত কত বেশি, কত অভ্যাগত প্রতিপালিত হইত, কত অসীম পুণ্য হইত তাহাতে? শেষে এইটুকুও তাহারা বলিত—না, কলের শরবত তেমন মিঠাও হয় না। অবশ্য শেষের সত্য খেদোক্তিটিতে সায় না দিয়া আমিও থাকিতে পারিতেছি না। কিন্তু যাহাকে লইয়া এত খেদ, এত সর্বজনীন যার প্রতিষ্ঠা, সামান্য লোহার কল তাহাকে হঠাইয়া দিল কিরূপে? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিব, লোহার কলে পাথরের ঘানি হইতে কম মানুষে বেশি কাজ করিতে পারে; ইহার চালনাও আবার তেমনি সোজা, সামান্য বালকও এই কলে আখ পুরিয়া কাজ আগাইয়া দিতে পারে, বলদ হাঁকাইয়া কল চালাইয়া নেওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব হয় না। তারপর এই কল অনায়াসে একেবারে ক্ষেতের পাশে নিয়া বসান চলে—তাহাতে আখের আঁটি বাড়ী বহিয়া আনিবার মেহনত বাঁচিয়া যায়। ইহা ছাড়া প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে পৃথক পৃথক আখমাড়াই কল রাখাও এখন সম্ভবপর হয়—কারণ আগের মত ধোয়ামোছা বা নাড়াচাড়া করিবার জন্য ইহাতে নিয়ত আধা ডজন বলিষ্ঠ হাতের প্রয়োজন পড়ে না। ইহার উপরও ইক্ষুর রস নিষ্কাসনের শক্তি আদিম পাথরদেবতা হইতে আধুনিক যন্ত্রটির অনেক গুণ বেশি—এইভাবে নূতন শিল্পসাধন আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের শক্তি বাড়িয়া যায়—এবং মানুষও এই নূতন-পাওয়া সাধন ও নূতন শিল্পপদ্ধতিকে আয়ত্ত করিয়া লয়। আর ইহার ফলে সমাজের পূর্বস্থিতি, তাহার পূর্বেকার বিন্যাস টলমল করিয়া উঠে।

এইরূপ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া সমাজের পুরাতন ব্যবস্থা বদলাইয়া যায়, এবং তাহার স্থলে নূতন অবস্থা বা নবস্থিতির সৃষ্টি হয়; আর অল্পকাল মধ্যে এই মধ্যবর্তী বিপর্যয়ের চিহ্নও লুপ্ত হইয়া যায়। পুকুরে ঢিল ছুড়িলে ঢেউ উঠিয়া সমগ্র পুকুরের সাম্য নষ্ট হয়; কিন্তু এই ঢেউ মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া

ক্রমে বিলীন হইয়া যায়; তখন জলের শান্তি বা পুরাতন সাম্যাবস্থা আবার ফিরিয়া আসে—কিন্তু আবার ঢিল ছুড়িলে পূর্বের মতই জলে অস্থির বলয় জাগিয়া উঠে, এবং এই জলবলয়ও ভাঙিয়া ভাঙিয়া জল আবার শান্ত হইয়া যায়। সমাজে উৎপাদনশক্তির বৃদ্ধির ফলে সেখানেও এইরূপ নব বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়—তবে পার্থক্য এই যে, সেখানকার ঢিল বাহির হইতে নিক্ষেপের প্রয়োজন হয় না, সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বা পুকুরের জলের মধ্যেই ঢেউ জাগাইবার শক্তি নিহিত থাকে।

উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পাইলে ব্যক্তির অবস্থিতি বা সমাজ-সম্পর্ককে অনেকটা পরিবর্তিত করিয়া লইতে হয়; নতুবা এই অবস্থান্তরের সঙ্গে তাহার নূতন সমন্বয় বা মূলগত সাম্যাবস্থা রক্ষিত হইতে পারে না—ইহাতে এক বিষম বিপর্যয়ের ফলে গোটা সমাজ-ব্যবস্থাই ভাঙিয়া পড়িবার ভয় থাকে। উৎপাদন-ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে বা সমাজে মানুষে এই নূতন সম্পর্ক সৃষ্টি হইলে পর, অপরাপর সামাজিক এবং রাজনীতিক ক্ষেত্রেও ব্যক্তির অবস্থান নূতন বিন্যাস লাভ করে, এবং ইহার প্রভাবে পূর্বেকার সামাজিক আচার-নিয়ম, আইন-কানুন, এবং অন্যান্য ভাবনা-ধারণা সমুদয়ই পরিবর্তিত হইয়া যায়। সমাজের অন্তর্লীন বিরোধ-বৈষম্য সত্ত্বেও তাহার টিকিয়া থাকিবার ইহাই মৌলিক রহস্য। অবশ্য উৎপাদনশক্তি শুধু সামাজিক বা রাজনীতিক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তোলেনা—অনুরূপ ভাবে সমগ্র মনোজগত অর্থাৎ সারা চিন্তাধারাকেই পালটাইয়া ফেলে।

বনচারী মানুষের সময় হইতে সামন্ত যুগ পর্যন্ত আমরা পূর্বাপর আলোচনা করিয়া আসিয়াছি—ইহাতে একটা জিনিস আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল—সমাজের অভ্যন্তরের সম্বন্ধ-সম্পর্ক বারবার নূতন অবস্থান্তরে পড়িয়া পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে—ইহাতে সমাজের রূপ যেমন পালটাইয়া যাইতেছে তাহার গুণেও তারতম্য ঘটিতেছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি সমাজের এই গুণে রূপে যে পরিবর্তন তাহার মূলে রহিয়াছে উৎপাদনশক্তির বিকাশ। যদি পুরুষ পশুপালনের কৌশল আয়ত্ত করিয়া উৎপাদনশক্তির বিকাশ না ঘটাইত, তাহা হইলে মাতৃসত্তার স্থানে পিতৃসত্তা, এবং পুরুষ প্রধান সমাজের আনুষঙ্গিক ব্যৈক্তিক সম্পত্তির স্থাপনা সম্ভবপর ছিল না; এইরূপ কৃষি ও গৃহশিল্পের জন্য মানবশ্রমের কদর না বাড়িলে শত্রুহনন বন্ধ হইয়া কখনও দাসত্বের উদ্ভব ঘটিত না—আর উৎপাদনশক্তির বৃদ্ধিতে ব্যৈক্তিক সম্পত্তি, ব্যৈক্তিক প্রভাব ও ব্যক্তিগত লোভ

না বাড়িয়া চলিলে সামন্তবাদের জন্মও অসম্ভব ছিল। ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যে সমাজের পরিবর্তনের মুখ্য কারণ উৎপাদনশক্তির বিকাশ ও তাহার বৃদ্ধি। এই বিষয়ে মার্ক্স বলিয়াছেন—

"বিকাশ হইতে হইতে সমাজে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হয় যে তখন উৎপাদনের আভ্যন্তরীণ বাস্তব শক্তিসমূহের সহিত উৎপাদনসম্বন্ধ ও সম্পত্তি-সম্বন্ধের বিরোধ আসিয়া যায়; ইহার ফলে এতদিন যাবৎ যে অবস্থা সর্বদা উৎপাদনশক্তির সহায়ক হইয়াছে তাহাই আবার নূতন অবস্থায় সেই শক্তির বিকাশপথে বাধা হিসাবে দেখা দেয়। এইভাবে সমাজে বিপ্লবের মুহূর্ত ঘনাইয়া আসে, তাহার পুরাতন আর্থিক ভিত্তি বদলাইয়া যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উচ্চাঙ্গের সমগ্র গঠনও পরিবর্তিত হইয়া পড়ে।" *

সমাজে এইরূপ বিরাট পরিবর্তনের নামই বিপ্লব; পূর্বতন সাংঘিক সম্পত্তির স্থানে ব্যৈক্তিক সম্পত্তি, এবং মাতৃসত্তার স্থানে পিতৃসত্তার উদ্ভব ও বিকাশ ও বিপ্লবের নিদর্শন। সমাজের প্রাথমিক অবস্থার জনসংগঠন † ও জনতান্ত্রিক উৎপাদন রীতি, তাহার অর্থনীতিক বনিয়াদ—এই সমস্ত পরিবর্তিত হইয়া সামন্তবাদের জন্ম ও নূতন আর্থিক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা, এইরূপ সামাজিক বিপ্লব। মার্ক্স সমাজবিপ্লবের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিতেছেন—

"উৎপাদন সম্বন্ধের সঙ্গে উৎপাদন শক্তির বিরোধই বিপ্লবের কারণ হয় না; বরং বিপ্লব এই দুই শক্তির বিরোধের পরিণাম বা ফল—অবশ্য উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্বন্ধ এই বিরোধ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়; তবুও এই বিরোধকেই বিপ্লবের কারণ বলিয়া নির্দেশ করায় পার্থক্য আছে।"

ইহা খুবই স্পষ্ট যে পশুপালন কালের উৎপাদনশক্তির সঙ্গে মাতৃকর্তৃক সমাজের উৎপাদন সম্বন্ধের মিল হয় না। সমাজের আর্থিক ব্যবস্থা তাহার উৎপাদন সম্পর্ককে বদলাইয়া প্রত্যেক স্তরেই নূতন সমন্বয়ের উপযোগী করিয়া লয়। মাতৃসত্তা, পিতৃসত্তা, সামন্তবাদ সামাজিক ক্রমবিকাশের সকল স্তরেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থনীতির প্রবর্তন হইয়াছে, এবং এই বিভিন্ন অর্থনীতির অনুযায়ী ভাবে প্রত্যেক যুগেই নূতন উৎপাদন-সম্বন্ধেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এইভাবে উৎপাদনশক্তি এবং উৎপাদন-সম্বন্ধের বিরোধ সমাজ বিপ্লবের বাহক

* A Contribution to the Critique of Political Economy, p. 12 (Calcutta Edition)

† জন=Gene (প্রথম খণ্ড পৃঃ ৪১—৪৩ দ্রষ্টব্য)

হয়; কিন্তু ইহাদের প্রতিটি বিরোধই পদে পদে সমাজে বিপ্লব ঘটাইয়া দেয় না—সমাজব্যবস্থার এই বিরোধগুলি পুঞ্জিত হইতে হইতে এক সময় সমাজে বিপ্লব আসিয়া পড়ে।

"সমাজ-কাঠামোর ভিতর এই আপাতঃ অদৃশ্য ভিত্তিটির পরিচয় পাইতে হইলে সমাজের উৎপাদনকারী* এবং উৎপাদন ব্যবস্থার তাদারককারী† —এই দুই-এর মধ্যেকার সাক্ষাৎ সম্পর্ক-সম্বন্ধকে বিশ্লেষণ করিতে হয়। এইভাবে এই ভিত্তির সহিত একবার পরিচয় হইয়া গেলে, স্বাধীনতা অধীনতা প্রভৃতি রাজনীতিক সম্বন্ধ, এবং তাহার আনুষঙ্গিক শাসনব্যবস্থা প্রভৃতির রূপ, এই সমুদয়ই সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে।" §

রাজনীতি প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি হইতে কোন পৃথক স্বতন্ত্র বস্তু নয়—অর্থনীতির বিক্ষিপ্ত ব্যবহারিক দিকগুলি একত্রিত হইয়াই রাজনীতির জন্ম; রাজনীতির দায়িত্ব প্রত্যেক শ্রেণী বা বর্গের আর্থিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করা—এইজন্য অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন নিছক রাজনীতিক বিপ্লব হইতে পারে না। প্রত্যেক বিপ্লবই সামাজিক বিপ্লব, এবং সামাজিক বিপ্লবই রাজনীতিক বিপ্লব। সামাজিক বিপ্লব এক বর্গের হাত হইতে মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলি ছিনাইয়া লইয়া অন্য শ্রেণীর হাতে তুলিয়া দেয়। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না, উৎপাদন সম্বন্ধ অর্থাৎ উৎপাদক ও উৎপাদন স্বামীর সম্বন্ধই ইহারও মূল; তাই মূলে বিপর্যয় ঘটিলে সমগ্র সমাজকাঠামোই বিপর্যস্ত হইয়া যায়। আবার মূল উৎপাদন সম্বন্ধের বেলায়ও এই অবিচ্ছেদ্যতাই তাহার নিয়ামক হয়—অপর ভাবে আমরা ইহাকে সমাজের উপর আর্থিক আধিপত্যও বলিতে পারি; এই আর্থিক আধিপত্যের ভিত্তি আবার বস্তুর সঙ্গে তাহার উৎপাদনযন্ত্রের সম্পর্ক, যন্ত্র ও বস্তুর সহিত সম্পত্তিগত মৌলিক ও মালিকানা অবিচ্ছেদ্যতা, এবং সমগ্রভাবে সকল যন্ত্র বা শিল্পসাধনের উপর একের বর্গাধিকার বা শ্রেণী আধিপত্য। এইবার পুঁজিবাদীযুগে কি কি ভাবে উৎপাদনশক্তির বিকাশ ঘটিয়াছে আমরা তাহারই আলোচনা করিব—এই যুগে যন্ত্রের বিকাশ, তাহার উপযোগ বা ব্যবহার, এবং তৎসহ মানবশ্রমের সংহতি, উৎপাদনশক্তির বৃদ্ধির কারণ; আর এই বর্ধিত উৎপাদনের উপর মুনাফা লুটিবার প্রবৃত্তিতে বেকার-সমস্যা, বাণিজ্য-মন্দা প্রভৃতি আর্থিক সঙ্কটের উদ্ভবও এই যুগেরই বৈশিষ্ট্য। তার উপর যন্ত্রের মালিকানা এবং উৎপাদন-ব্যবস্থার স্বামিত্বের মধ্য দিয়া উৎপাদন সম্বন্ধের সহিত উৎপাদন শক্তির বিরোধও এখনকারই যুগলক্ষণ।

* শ্রমিক; † মালিক; § ক্যাপিটেল, ৩য় খণ্ড

সামাজিক বিপ্লব কেন হয় এই সম্পর্কে বলিতে গিয়া জনৈক লেখক বলিয়াছেন—

"উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যেকার বিরোধকে শাসকের দল রাজনীতিক দাপটে দাবাইয়া রাখে, কিন্তু ইহা সকল সময় সম্ভব হয় না, উৎপাদন ক্ষেত্রের বিরোধ রাজনীতিক বাধা উৎখাত করিয়া সমাজে বিপ্লব আনে। উৎপাদনসম্বন্ধ সময় সময় উৎপাদনশক্তির মুখে এমন প্রচণ্ড বাধা হইয়া দাঁড়ায় যে তাহা চূর্ণ করার প্রয়োজন পড়ে; নতুবা বাধা-পাওয়া উৎপাদনশক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজের অগ্রাভিমুখিতাও রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং ইহার ফলে আবদ্ধ জলধারার মত সমাজ একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পঙ্কিলতার সৃষ্টি করে—ইহারই অর্থ হইল গোটা সমাজের পশ্চাদ্‌গমন অর্থাৎ অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হওয়া।"

১। পুঁজিবাদের প্রারম্ভ

পুঁজিবাদী যুগের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হইল পুঁজির সাহায্যে উৎপাদনের সমগ্র সাধন অর্থাৎ একযোগে যন্ত্র ও শ্রমিকের উপর অধিকার স্থাপন করা, বস্তুর উৎপাদনের উদ্দেশ্য বা মূল লক্ষ্য তখন একমাত্র মুনাফা এবং বস্তুর বা পণ্যের বিতরণের তাগিদও তখন মুনাফাই। পৃথিবীতে এইরূপ মুনাফার জন্য উৎপাদন এবং মুনাফার জন্য যন্ত্র ও শ্রমের উপর পুঁজির কর্তৃত্ব প্রথমত ইংলণ্ডেই আরম্ভ হয়—তাই পুঁজিবাদের আরম্ভিক দিনগুলির পরিচয়ের জন্য আমরা ইংলণ্ডীয় পুঁজির সঞ্চয়ন ও তাহার ক্রমাভিবিকাশের দিকেই লক্ষ্য করিব।

খ্রীষ্টীয় বারশ' অব্দে বিদেশী তুর্ক জাতি ভারতবর্ষে তাহাদের সামন্ত শাসনব্যবস্থা সুব্যবস্থিত করিতেছিল; কিন্তু ইংলণ্ডে ততদিনে সামন্ত ভূমিপতি ও ভূমিহীন দাস* এই দুই পৃথক শ্রেণীতে সমাজ-বিভাজন নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সেখানে সাধারণ সম্পত্তি অর্থাৎ মূলত ভূমি এবং ভূমির উপজ —এই দুই বস্তুই তখন সম্পূর্ণত ভূমিপতির অধিকারে। সামন্তাধিপতির বিলাস ও সৈন্যরক্ষার জন্য নির্মিত বিরাট গড়ের পাশে কমীনের কুটির তখন পরিহাসের মত মনে হইত। শান্তির সময় এইসব ভূমিহীন কমীনের শ্রম সামন্ত-প্রভুর বিলাসের উপকরণ যোগাইতে নিযুক্ত থাকিত; এবং কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্তের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলে এই হতভাগ্যেরাই আবার ফৌজী

* ভূমিদাস, কমীন, serf.

সিপাহী হইয়া প্রভুর জন্ত প্রাণপাত করিত। দেশের আইন তখন সমদৃষ্টিক ছিল না—যে অপরাধের জন্ত কমীনের মুণ্ড যাইত, তাহার জন্ত সামন্তের দণ্ডও হইত না—অনেক ক্ষেত্রেই নামেমাত্র সাবধান করিয়া দিয়া সামন্ত প্রভুকে রেহাই দেওয়া হইত, সামান্ত ক্ষেত্রেই তাহার সামান্ততর শাস্তির বিধান হইত। কমীনের ইজ্জৎ-আব্রু তখন একান্ত ভাবে সামন্ত প্রভুর মর্জি-মেজাজের উপর নির্ভর করিত—কমীন পরিবারের তরুণী কন্তারা তখন সামন্তের ইচ্ছাভোগ-যোগ্যা বিলাস সামগ্রী ছিল।

অবশ্ব ভারতীয় সমাজে সামন্তবিধানের এই সকল লক্ষণ বিংশ শতাব্দীতেও একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই; পাতিয়ালা, আলোয়ার প্রভৃতি রাজ্য ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থাকে চিরকালীন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে—এখনও যে এই প্রচেষ্টা কোথাও চলিতেছে না তাহা একেবারে জোর করিয়া বলা যায় না—তবে সমাজবিকাশের সঙ্গতিতে বিচার করিলে ইহারা বিচ্ছিন্ন, অনেকটা পুঁজিবাদী সমুদ্রে সামন্তবাদী দ্বীপের মত। এই বিচ্ছিন্ন, বিসদৃশ সামন্তবাদী দ্বীপগুলিতে প্রজার উপর কি অপরিসীম অত্যাচার হইত তাহা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। স্তায়ের নামে সেখানে কী অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচার চলিত তাহার বর্ণনাও এই প্রসঙ্গে নাই করিলাম—তবে ইহা সত্য, দেশীয় রাজ্য যত ছোটই হোক না কেন, সেখানকার ক্ষুদে রাজাটির খোদ্ মর্জিই ঐ স্থানের একমাত্র আইন ছিল। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়িল, ১৯১৬ সনে একবার অদৃষ্টদোষে, নেহাৎই বিচারবিবেচনাহীন ভাবে, আমি নিজাম রাজ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম। ব্যাপারটা সত্যসত্যই আকস্মিক—কোন গ্রামে অতিথি হইয়া কোনক্রমে মাথা গুঁজিয়া রাতটুকু কাটাইয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্ব ছিল। কিন্তু হইলে কি হইবে, সেখানকার গ্রাম্য চৌপালে* আমি এমন ভাবেই জেরার সম্মুখীন হইলাম যে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। এইরূপ ভয়াবহ জেরা, অনর্গল, অবিশ্রাম অফুরন্ত জেরা, তারপরও আবার জীবিত মৃত নির্বিশেষে, আমার সপ্ত পুরুষের নাম, ঠিকানা, তাহাদের সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ, খবর, তথ্য—আমি পাগল হইয়া উঠিলাম, তবে বুঝিলাম সামন্ত রাজ্যের ক্ষুদে বড় সকল কর্তাই মানুষকে একেবারে প্রথম দর্শনেই দাগী সাব্যস্ত করিয়া বসেন। এইরূপ আমার জীবনে ১৯২৯ সনের আর একটি রোমঞ্চকর ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমি এলোরা যাইতেছিলাম, ঔরঙ্গাবাদ স্টেশনে নামিবামাত্র—এইবার কিন্তু আর সওয়াল জবাবেই শেষ নয়—আমাকে গিরফ্‌তার করিয়া

* গ্রাম্য দরবার

টানিয়া নিয়া সোজা তহশীলদারের মুখামুখি হাজির করা হইল—শেষটায় অবশ্য বাঁচিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু বহু কষ্টে, তবে ইহাতেও লাভ বড় রকম হইল না, বুঝিলাম, এতবড় একটা মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও আমাদের সামন্তবাদী কুম্ভকর্ণ ঘুমাইয়াই ছিল।

ইউরোপে দেখি ত্রয়োদশ শতাব্দের মধ্যেই মোঙ্গোল অভিযানের আঘাতে আঘাতে তাহার তন্দ্রা টুটিয়া গিয়াছে; কম্পাস, বারুদ প্রভৃতি নূতন অস্ত্র, যন্ত্র,—শুধু তাহা কেন, নূতন সাধন,—শিল্পসাধনই তাহার করায়ত্ত হইয়াছে। ইহার পূর্বেকার চার শতাব্দী ধরিয়া আরবীয় সংস্পর্শে প্রাপ্ত গ্রীসীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তখন তাহার মজ্জাগত; দর্শন, ভূগোল, বাণিজ্যিক গবেষণা এবং অন্যান্য ব্যবহারিক বিদ্যায় ইউরোপে তখন পুনরুজ্জীবনের ঢেউ আসিয়া গিয়াছে। টমাস অক্কিনা* এরিস্টটলের যথার্থবাদী দর্শনের সমর্থক হওয়ায় ইয়োরোপের চিন্তাধারা তখন বুদ্ধিবাদী খাতে বহিতেছিল। এই সময় ইয়োরোপীয়দের চিন্তায় পূর্বতন গতানুগতিকতার কেনরূপ স্পর্শও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—সমাজের বিচার ধারায় তখন সর্বত্রই একটা বিশেষত্ব যেন ক্রমাভিব্যক্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। এই সময়ের শিল্পী ল্যুনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি† শুধু তাঁহার সমকালের নহে, সর্বকালের মহৎকলাকারদের মধ্যেই একজন। ল্যুনার্দো ইয়োরোপের পুনর্জাগরণ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক এবং তখনকার নবভাবধারার অসামান্য প্রতিনিধি। কলাক্ষেত্রে প্রচলিত রহস্যবাদকে বিসর্জন দিয়া তিনি অপূর্ব নিষ্ঠুরতা ও নির্লজ্জতার সঙ্গে প্রকৃতির পন্থানুসরণ করেন। তাঁহার চিত্রাবলী রেখা, ব্যঞ্জনা ও তুলনাত্মক আকার ও পরিমাণের দিক দিয়া প্রাচীনত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। প্রকৃতিবাদী ল্যুনার্দো জীবন্ত নগ্নদেহ ও মৃত শরীরকঙ্কালকে তাঁহার আপন চিত্রাদর্শ রূপে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার চিত্রকলায় পুনর্জাগরণ কালের বস্তুবাদ, বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তিবাদ—এই তিনটি লক্ষণই সুপরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়।

সামন্তবাদী যুগে বাণিজ্য বাড়িয়া চলিয়াছিল, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি—য়ুরোপখণ্ডেও এই সময় ব্যাপারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়; আরবীয়দের অন্তর্রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ও বিপুল সম্পত্তি দেখিয়া ভেনিস ও ফ্লোরেন্সের বণিকেরা তৎপর হইয়া উঠে; ইহাতে তখনকার মত আরবীয় বণিকের সমকক্ষ না হইলেও ক্রমে তাহারাও বিরাট ধনকুবেরে পরিণত হয়; ফলে সমগ্র ইয়োরোপের বণিক সমাজেই ফ্লোরেন্স ও ভিনিসীয়দের অনুকরণ করিবার

* ১২২৫-৭৪ খ্রীঃ। † ১৪৫২-১৫১৯ খ্রীঃ।

প্রবৃত্তি আসে—আর ইয়োরোপেই এক সামান্য সংলগ্ন ভূভাগ, ইংলণ্ডেও স্বাভাবিকভাবেই ইহার প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

আমরা বারশ' অব্দে সামন্তবাদী ইংলণ্ডের কি অবস্থা ছিল তাহা বর্ণনা করিয়াছি; কিন্তু ১৬০০ অব্দের সমসময়ে আসিয়া পৌছিতে পৌছিতে ইংলণ্ডের এই অবস্থা লুপ্ত হইয়া যায়, অবস্থান্তরিত ইংলণ্ডের সর্বত্রই তখন এক নূতন দৃশ্য জাগিয়া উঠে—শহর তখন দেশের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে; সারা শহর জুড়িয়া ধনাঢ্য বণিকের বহুমহলা বাড়ী উঠিয়াছে; বিদেশের পণ্যবোঝাই জাহাজ আসিয়া পোতাশ্রয়ে ভিড় জমাইতেছে—মাল খালাস করিয়া নূতন রপ্তানীর জিনিস লইয়া ব্যাপারীর বাণিজ্যপোত আবার সাগরে ভাসিতেছে। পণ্য-বিক্রয়ের জন্য ছোটবড় বিপণি ছাড়াও বড় বড় মেলা বসিতেছে—পুরাতন কমীনের সন্তানেরা এখানে বন্ধনমুক্ত হইয়া চলাফেরা করিতেছে, মেলায় সওদা করিতেছে। নগরে তখন তাহাদের নিজস্ব শ্রেণী, সংঘ বা শিল্পীসংঘ* গড়িয়া উঠিয়াছে, বহু ব্যবসায়ী মিলিয়া এই সুযোগে মিলিত কোম্পানী বা ব্যাপারীমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে—উহারা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাসংস্থায় অর্থ দিয়া দেশের শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করিতেছে। নগরে ধনিক ছাড়া অন্যান্য স্বাধীন স্বতন্ত্র মানুষেরও কমি নাই; দেশে সামন্ত মোহান্তের প্রতাপ গিয়াছে, তাহার স্থানে নূতন ধর্মসংগঠন, ইংলিশ চার্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহারা রোমের পোপকে আর ধর্মগুরু বলিয়া মানে না। বন্দরগুলিতে নাবিক, ব্যাপারী, শিল্পকার, কারিগর ও ফেরিওয়ালার ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে। ফ্ল্যাণ্ডর্সে'র† জোলারা চার্চের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ইংলণ্ডের পুর্বতটে আশ্রয় লইয়াছিল—গত এক শতাব্দীতে তাহাদের তাঁতশিল্প বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের ব্যাপারবাণিজ্য এখন সহস্রশীর্ষ পুরুষের মত—চতুর্দিকে তাহার প্রতিপত্তি, প্রসার, স্পেনের সমুদ্রদস্যুদের দেশান্তর হইতে আহৃত অর্থ এখন ইংলণ্ডের স্বার্থবহদের নিকট আসিয়া জমা হইতেছে—এই অর্থের সহায়তায় বণিককুল ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে—মৃতকল্প সামন্তবাদের গর্ভ হইতে নূতন চেতনা, নূতন সাধন ও নূতন জীবনলক্ষণ সমাবৃত হইয়া এক পরিণত নব সমাজশিশু জন্মলাভ করিয়া বসিয়াছে; এই সমাজশিশু তাহার নবলব্ধ প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সম্পত্তির রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য নির্বল সামন্তবাদী আমীরের হাত হইতে শাসনশক্তি কাড়িয়া লইতে উদ্যত।

---

*Trade guilds; † বেলজিয়াম।

১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে পৌঁছিতে পৌঁছিতে ব্যাপারী ও সামন্তের দ্বন্দ্ব উগ্ররূপ ধারণ করিয়া লয়; তখনকার সমাজবিদ্রোহের কারণগুলি আপাতদৃষ্টিতে বহুতর মনে হইলেও, তাহার মূলে এই দুই বর্গের স্বার্থসংঘাতই মুখ্যতঃ ক্রিয়াশীল ছিল। দেশের সামন্ত এবং সর্বাপেক্ষা বড় সামন্ত ইংলণ্ডের রাজার দৈব অধিকার চূর্ণ করিবার জন্য ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে* সমগ্র নাগরিক ও ব্যাপারীবর্গের যে অভিযান তাহাও এই সামন্ত-ব্যাপারী স্বার্থ সংঘাতেরই পরিণাম। প্রথম চার্লসের মুণ্ডচ্ছেদ† এবং তাহার সঙ্গে ক্রমওয়েলের বিজয়-লাভের পর সামন্তশক্তি ইংলণ্ডের তর্টভূমি হইতে বিতাড়িত হয়; এবং নূতন শক্তিসজ্জিত ব্যাপারীর দল দ্বিগুণ উৎসাহে পৃথিবীর দূরপ্রান্তে ভারত অবধি তাহার বাণিজ্য কুঠি পত্তন করে। এইবার ব্যাপারীর ক্রমবর্ধমান স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদিগকে এক নূতন সৈনিকশক্তিও সংগঠিত করিয়া লইতে হয়; এই অবস্থান্তরিত পর্যায়ে ইংলণ্ডের সরকারও বাধ্য হইয়া বণিকের ন্যায্য অন্যায্য সকল স্বার্থেই সমর্থন জানাইয়া যায়।

ক্রমওয়েলের সফলতাকে ব্যর্থ করিবার জন্য ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সামন্তেরা একবার বদ্ধপরিকর হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের এই প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ১৭৪৫ সনে সামন্তদের দিক হইতে আত্ম-প্রতিষ্ঠার একটি অন্তিম চেষ্টা হয়,—কিন্তু তাহাতে সামন্তবাদীর তরবারি চিরদিনের জন্য মুষ্টিচ্যুত হইয়া পড়ে। ইহার পর রাজশক্তি দখল করিতে ব্যাপারীদের আর এক শতাব্দী কাটিয়া যায়—তবে ইতিমধ্যে ব্যাপারীর স্বার্থ রাজ্যের স্বার্থ বলিয়া প্রতীত হয়, এবং এই স্বার্থের সুরক্ষা রাজ্য-শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। প্রথমে ব্যাপারী ও নাগরিকেরা সামন্ত-শক্তির পদানত ছিল—নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহারা কখনও অসি উচাইতে জানিত না; কিন্তু ক্রমওয়েলের অভিযানে যুক্ত হইয়া ইহারা অস্ত্র ধরিতে শিখে, এবং এই অস্ত্রের ক্ষমতাতেই দেশের সামন্তবল বিচূর্ণ করিয়া দিয়া নূতন শাসনশক্তির অভ্যুত্থান ঘোষণা করে।

ফ্রান্সে তখনও ব্যাপারীদের দৌলত বাড়িয়া চলিলেও এই বৃদ্ধির গতি ও মান ইংলণ্ডের তুলনায় কম ছিল। এইজন্য ফরাসী সামন্তবাদকে ধ্বংস করিতে সেখানকার বণিকদের ১৭৮৯ অব্দ অবধি অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। ইংলণ্ডে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধনী আইনের* সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রক্ষমতা বণিকদের হাতে চলিয়া আসিয়াছিল; ফ্রান্সে ১৮৭০ অব্দে প্রুসিয়ার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত

* ১৫৯৯-১৬৫৮ খ্রীঃ; † ৩০শে জানুয়ারী, ১৬৪৯ খ্রীঃ।

হইয়া সামন্তবাদ নিজেকে রাজ্যশাসনের অযোগ্য বলিয়া সিদ্ধ করে—ইহার প্রত্যক্ষ ফলে সেখানকার রাজতন্ত্র নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার স্থলে নূতন প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনা হয়। এই অবস্থায় ফ্রান্সের কৃষিপ্রধান অঞ্চলে শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে কারখানা প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ হয়।

ইংলণ্ডে পুঁজিপতিদের শৈশব কাটিতে প্রায় এক শতাব্দ লাগিয়া গিয়াছিল। ফরাসী দেশে এই বিকাশের বেগ ছিল কিছুটা ক্ষিপ্র—সেখানে ৯০ বৎসরের মধ্যেই পুঁজির প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রান্ত হয়। রুষ দেশে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিদাসপ্রথা লুপ্ত হইবার পর সামন্তবাদের উপর প্রথম আঘাত আসে; এই সুযোগে সেখানেও অন্যান্য দেশের মত পুঁজি-বাদের প্রাথমিক সূত্রস্থাপনার পর্যায় সমাপ্ত হয়—তবে বিশেষত্ব এই যে শাসনশক্তি আয়ত্ত করিতে সেখানে ১৮৬৭ হইতে ১৯১৭, এই আধা শতাব্দী সময়ই পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল।† ইহরে উপরও অপর বিশেষত্ব, সেখানে এই অন্তর্কালের মধ্যেই পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধসমূহ পরিণতি লাভ করে; শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হইয়া রুশীয় শ্রমিক নব ব্যবস্থার সূচনায়ই উহার বিধ্বংসী শক্তিকে সংহত করিয়া লয়। এই কারণে রুশদেশের পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা খুবই ক্ষণিকের, উহার জীবৎকাল মাত্র কয়েক মাসের অধিক নহে—১৯১৭ অব্দে নভেম্বরেই সেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে নূতন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতে হয়।

সামন্তবাদী একাধিপত্য তাই বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্রই ঠিক এক সময়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। আর্থিক বিকাশ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপে সংঘটিত হইয়াছে—এই বিকাশের বেগ, তীব্রতা ও প্রসার স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধারণ করিয়াছে। অতীত যুগগুলিতে সমাজে আর্থিক বিকাশের তারতম্যের বিষয়* আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। তবে, বিভিন্ন দেশের সাময়িক বিভিন্নতা বাদ দিয়া মোটের উপর পঞ্চদশ শতাব্দ হইতে সামন্তবাদের একাধিপত্য নষ্ট হইতে থাকে, ইহা আমরা বলিতে পারি। ইংলণ্ডে এই অবস্থা সর্বাপেক্ষা পূর্বে আসিয়াছিল—সেখানে ১৪৯৫ হইতে ১৬০০ অব্দের মধ্যে বণিকশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়; স্কটল্যাণ্ডে ১৭৪৭ সনে আসিয়া দেশীয় সামন্ত জমীদারদের শক্তিলোপ ঘটে; ফ্রান্সে ১৭৮৯ অব্দে এই অবস্থার সূত্রপাত সম্ভবপর হয়; আর জাপান ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে পৌছিয়া দেম্যোর* অধীনতা অস্বীকার করে।

---

* Reform Act. ৭ই জুন (১৮৩২); † ফেব্রুয়ারী (১৯১৭)।

পুঁজিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সামন্তশ্রেণী যে সব স্থানেই একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় তাহা নহে। সামন্তেরা এখন পুঁজিপতির সঙ্গে মিলিত হইয়া নূতন শিল্পোদ্যোগ হইতে অর্থাগমের পথ করিয়া লয়। কোন কোন স্থানে শাসনকার্যের সুউচ্চ পদ বা পরিষদ ভবনের † উচ্চ আসনগুলি নূতন সমাজব্যবস্থায়ও সামন্তশাবকের জন্যই পাকা হইয়া থাকে। জার্মানীর সেনা ও শাসন বিভাগ এবং বৈদেশিক দপ্তরের স্থায়ী পদগুলিতে ফান জুঙ্কারের ‡ সংখ্যা সর্বদাই অধিক ছিল। জাপানে সামন্তের বংশাধিকার জার্মানী হইতেও বহুগুণ বেশি; তবে ইংলণ্ডে সামন্ত ও পুঁজিপতি পরিবারে প্রচুর মিশ্রণ হইয়া গিয়াছে; ইহার ফলে সামন্ত ও পুঁজিপতির স্বার্থে সেখানে বড় পার্থক্য দেখা যায় না। তাহা হইলেও আচার, নিয়ম, ধর্ম, এমনকি শাসনতন্ত্রেও সামন্তবাদের স্মৃতিকে সেখানে জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। রাজ্যাভিষেক ও অন্যান্য রাজকীয় অনুষ্ঠানকে সেখানে সমস্বার্থসম্পন্ন বলিয়া পুঁজিবাদ সহজেই সহ্য করিয়া লইতে পারে। কিন্তু রাজন্য বংশের কোন আচার প্রজাসাধারণের সহধর্মী হইয়া গেলে ইংলণ্ডের পুঁজিবাদ নিজ স্বার্থহানির ভয়ে তাহা বরদাস্ত করে না। শ্রমিক বা সাধারণ প্রজার স্বার্থ বা স্বধর্মের সহিত রাজার স্বধর্মের ও স্বার্থের পার্থক্য না রাখায় রাজপুত্র সেখানে রাজভাগ্য বঞ্চিত হয়। ‡

২। পুঁজিবাদের বিকাশ

পুঁজিবাদের লক্ষণ কি এই সম্বন্ধে আমরা কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করিব না—কারণ ইহার পরিবর্তে তাহার রূপ চিত্রিত করিলেই আমাদের সুবিধা হইবে। আচ্ছা, পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় আমরা প্রকৃতপক্ষে কি দেখি? এক পক্ষ জিনিস তৈয়ার করে, আর এক পক্ষ তাহা খরিদ করে, আর এই খরিদ বিক্রীর মধ্যে ব্যাপারীরা আবার মধ্যস্থতা করে—তাহারা একজনের জিনিস অপরের নিকট বিক্রয় করিয়া শুধু যে কায়ক্লেশে জীবিকার সংস্থান করিয়া লয় তাহা নহে, পক্ষান্তরে সমস্ত পণ্যের হস্তান্তর কাজের মধ্যস্থ বলিয়া উহারা প্রচুর মুনাফা কামাইবারও সুযোগ পায়। বাণিজ্য কার্যে বিক্রীত হইবার পূর্ব পর্যন্ত উৎপাদকই পণ্যের মালিক থাকে, এবং ব্যাপারী বা ধনিক হয় পণ্যের সংগ্রাহক কিংবা থাতি রক্ষক; কিন্তু ছোট ছোট গৃহশিল্পের বেলায় উৎপাদকের নিকট হইতে মাল কিনিয়া ব্যাপারী নিজেই তাহার মালিকানা লাভ করে, এবং পরে সেই জিনিস যথাসম্ভব চড়া দরে বিক্রয় করিবার প্রয়াস পায়—এই ক্ষেত্রে

*জাপানী সামন্ত; † Parliament; ‡ Junker (Lords)
† অষ্টম এডওয়ার্ড।

বিক্রয় মূল্য নিঃসন্দেহে খরিদ দর অপেক্ষা অনেক বেশী হয়, তাহাতে ব্যাপারীর শ্রমের দাম ও রাহা খরচ উঠিয়াও বিপুল মুনাফা থাকে, ভারতবর্ষেও পুরাতন ফেরিকররা অনেকস্থলে ঠিক এই ভাবেই শেঠজী বনিয়া গিয়াছে।

এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত লইয়া বিষয়টা আমরা আরও স্পষ্টভাবে বুঝিয়া লইতে পারি :—

এক জায়গায় এক ছোট বাজারে দুইটি ভাই তেলের ব্যাপার করিত ; এই দুই ভাই-এর একজন আমার গ্রন্থরচনার কালেও জীবিত আছে। তাহারা একসময়ে মাথায় তেলের হাঁড়ি চাপাইয়া গ্রামে গ্রামে সরিষার বদলে তেল ফেরি করিয়া বেড়াইত। তেল দিয়া যে সরিষা মিলিত তাহা মাড়াইয়া তেল বাহির করিয়া আবার গ্রামে গিয়া এইভাবে ফেরি করিয়া আসিত। কিছু তেল তাহারা পয়সা লইয়াও বিক্রয় করিত—কিন্তু পয়সা বা সরিষা সব ক্ষেত্রেই তেলের তুলনায় তাহার বিনিময় দাম যথেষ্ট বেশি হইত। ইহাতে জিনিষের খরিদ ও বিক্রয় মূল্যের তারতম্যের জন্য কলু ভাইদের নিকট পরিবার পালনের অতিরিক্ত পয়সা জমিয়া যায়। এইবার তাহারা মাথায় বহিয়া তেল সওদা করা ছাড়িয়া দেয়, জমা পয়সা দিয়া দুই ভাই-এ একটা ঘোড়া কিনিয়া ফেলে এবং ঘোড়া কিনিয়া ঘোড়ার পিঠে তেলের লাদ চাপাইয়া নূতন কায়দায় ফেরি স্থরু করে, আর বাজারে তেলের সঙ্গে তামাক এবং তামাকের সঙ্গে নিমকের দোকান খুলিয়া বসে। কিছুদিনের মধ্যে নিমক আর তেল তামাকুর ব্যবসায়ের সঙ্গে তাহারা কাপড় চোপড়ও কেনাবেচা স্থরু করে। দুই এক বৎসর পরে একদিন তেলের ব্যাপারে গড়লাভ বুঝিয়া তাহারা ঘানি বন্ধ করিয়া দেয়, এবং তেলীর শিল্প ছাড়িয়া দিয়া শুধু কাপড় ও তাহার সঙ্গে বিবিধ শস্য, মসলা ও অন্যান্য পশারী জিনিসের কাজ করিতে থাকে। এইবার বৎসর না ঘুরিতেই তেলী ভাইদ্বয় পড়শী জমিদারদিগকে এক এক দফে কড়া স্থদে দশ বিশ হাজার করিয়া টাকা কর্জ দেয়। অনেকদিন হইল তাঁহাদের ভাগ্যের বড় একটা খোঁজ রাখি না—এই পংক্তিগুলি লিখিবার সময় তেলী ভ্রাতাদের কারবারের কি অবস্থা তাও বলিতে পারিব না। তবে আমার সহিত সর্বশেষ সাক্ষাতের সময় তাহাদের নাতিপুতিদিগকেও উদ্যোগী পিতামহদের কারবারে খাটিতে দেখিয়াছি—তখনই তাহারা রীতিমত লাখী, তেলের পুরাতন ফিরিকর লক্ষাধিপতি শ্রেষ্ঠী ; পূর্বের ঘানির স্থানে মুনাফার নূতন পুঁজিতে তখন তেল ও চাউলের বিরাট মিল চলিতেছে। যাহাই হউক, আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে; এই দুই কলুভ্রাতার নিকট এত

সম্পত্তি কোথা হইতে আসিল? স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, জিনিসের খরিদ ও বিক্রয় মূল্যের তারতম্যের ফলে যে অর্থলাভ হইত, তাহা এই দুই ভাইএর ব্যবসায়ে পুঁজি হিসাবে খাটিয়াছে; পরে এই বাড়তি পুঁজি দিয়া কলু ভাইরা আবার জিনিস কিনিয়াছে, আবার বেচিয়াছে, এবং বারবারই খরিদ ও বিক্রয় মূল্যে পার্থক্য রচনা করিয়া বিপুল মুনাফা লুটিয়াছে, ইহাতে তাহাদের পুঁজিও দিন দিনই বাড়িয়া গিয়াছে। কলু ভাইদের পুঁজিপতি হইবার মূলে ইহাই হইল রহস্য।

পুঁজিপতির পৃথিবী হইতেছে বাজার। এখানে জিনিসের মূল রূপের কোন মূল্য নাই। রূপয়ার রূপে যে মূল্য ঠিক হয় উহাই তাহার আসল মূল্য। এই কারণে পুঁজিপতির নজর ঠিক জিনিসের উপর থাকে না। জিনিসের খরিদ ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে যে ফাঁক থাকে সেই দিকেই পুঁজিপতির লক্ষ্য। পুঁজিপতির পৃথিবী বা বাজারও এই ফাঁক বা মূল্যের তেজীমন্দীর উপর নির্ভরশীল।

আমরা পুর্বেই বলিয়াছি. আরবদের দৃষ্টান্তে ভেনিস, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি ইতালীয় শহরে বণিকবৃত্তির সৃষ্টি হয়; এবং এই সব বণিকেরা আপন আপন সমৃদ্ধি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নগরগুলিকেও সুসমৃদ্ধ করিয়া তোলে। পরে ইংলণ্ডেও ইতালীয় বণিকদের অনুকরণে ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়; পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও স্পেনীয় বণিকেরাও ইতালীয় আদর্শ অনুসরণ করে— এক সময় ইহারা ইংরেজের তুলনায় ব্যবসায়বাণিজ্যে অনেক বেশি অগ্রসর ছিল।

ভারতবর্ষ ও অন্যান্য এশিয়াই দেশে বহু পুর্বেই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছিল। ভারতীয় বণিকেরা চীন, জাভা, আরব ও মিশর প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপনার কালে আধুনিক য়ুরোপীয় জাতির নামও শোনা যাইত না। তবে গ্রীক ও রোমক বণিকেরা তখনকার দিনেই ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করিয়া লইয়াছিল। ভারতবর্ষের তখনকার ব্যাপারীরাও বর্তমান কালের বণিকের মতন প্রচুর পুঁজির অধিপতি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিশাল ধনকুবেরেরও কোন অভাব ছিল না; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পরবর্তী পুঁজিপতিদের মত সমাজের রূপ পরিবর্তন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে নাই। এই সব প্রাচীন বণিকেরা সমাজের উৎপাদিত পণ্যের ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যেই তাহাদের ব্যবসায়কে সীমিত করিয়া রাখিয়াছিল। আধুনিক পুঁজিপতি যেমন কারখানা খুলিয়া নিজেই বিক্রেয়

পণ্য উৎপাদনের দায় গ্রহণ করে উহারা সেইরূপ ছিল না; অবশ্য সেইরূপ লক্ষ্য থাকিলেও একাধিক সামাজিক কারণে তাহা তখনকার মত সম্ভব হইবার কোন উপায় ছিল না। প্রথমত প্রাচীন যুগে ধনিকের পণ্য বিক্রয়ের বাজার সীমাবদ্ধ ছিল—বাজারের সম্প্রসারণের জ্ঞান বা সাধন তাহার করায়ত্ত ছিল না; দ্বিতীয়ত কারিগরদের সংগঠন তখন খুব দৃঢ় ছিল—ইহার মূলে তখন শুধু মাত্র আর্থিক সম্বন্ধই ছিল না, উপরন্তু আত্মীয়তা, বৈবাহিক সম্পর্ক প্রভৃতি এই সংগঠনের দৃঢ়তার সহায়ক ছিল—তাই এই সংগঠন ছাড়িয়া কারিগরেরা তখন ব্যাপারীর কারখানায় কাজ করিতে প্রস্তুত ছিল না; অন্যদিকে ব্যাপারী-বর্গ যে কোন প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিয়া কারিগরকে কাবু করিবে এমন পথও তখন বন্ধ ছিল, কারণ এইরূপ প্রচেষ্টায় তখনকার সমাজের ধার্মিক ও রাজনৈতিক গঠনে আঘাত লাগিত—তাই সামন্ত শাসকের দল এইরূপ প্রচেষ্টা বা কল্পনাকে স্বভাবতঃই সুনজরে দেখিত না; তৃতীয়ত উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শক্তির প্রয়োগ এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত অন্যান্য সকল রকম অন্বেষণে ভারতীয়েরা বিশেষ প্রযত্নশীল হয় নাই—ইহার অবশ্য সামাজিক কারণ আছে, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব—কিন্তু এই সব কারণ এবং আরও দুই একটি কারণের জন্য ভারতীয় সমাজ ব্যাপারবাদ পর্যন্ত গিয়াও থামিয়া থাকে, তাহার মধ্য হইতে অন্যান্য দেশের মত নূতন শিল্পোদ্যোগ-সমন্বিত পুঁজিবাদের আর জন্ম হয় না।

(ক) **ব্যাপারবাদ হইতে পুঁজিবাদ**—ইংলণ্ডের ব্যাপারীদিগকে আমরা কিভাবে পুঁজিবাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিলাম? প্রথমে দেখিলাম জিনিসপত্রের চাহিদা বা বিক্রয় বাড়িল, ইহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারী বা বিক্রেতার লাভও বাড়িল, আর এই লাভ বাড়ায় ব্যাপারীর পুঁজিও বাড়িয়া গেল। পুঁজির সহায়তায় পণ্য আরও অধিক সংখ্যক ক্রেতার নিকট অধিক পরিমাণে পৌছান গেল। পণ্যের ক্রয়বিক্রয়ের জন্য এখন বহু নূতন দেশ ও বহু নূতন পথঘাট আবিষ্কৃত হইল। ইহাতে সামাজিক প্রেরণা যোগাইবার জন্য দেশে অভিযাত্রীদের সম্মান বাড়িয়া গেল; তাহারা সাগর পাড়ি দিয়া পৃথিবীর বুক হইতে লুক্কায়িত নূতন নূতন ভূভাগ খুঁজিয়া বাহির করিল; নিজেদের অভিজ্ঞতা, পথের মানচিত্র ও যাত্রাবিবরণ দিয়া সাহসী ভ্রাম্যমানেরা তখনকার সমাজকে সাহায্য করিল। এই উদ্যোগে ইতালীর পরিব্রাজক মার্কো পোলো ত্রয়োদশ শতকে আসিয়া চীন ও ভারতবর্ষ ঘুরিয়া

গেলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে রুশ দেশের ত্বের অঞ্চল* হইতে আফনাশিয়া নিকিতিন ভারত-ভ্রমণে আসেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকেই ভাস্কোডাগামা সমুদ্র পথে আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের উপকূলভাগ আবিষ্কার করিয়া যান। ভাস্কোডাগামারও ছয় বৎসর পূর্বে ইতালীয় নাবিক কলম্বাস ভারতবর্ষের পথ খুঁজিতে গিয়া আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

এইভাবে নূতন দেশ ও বাজার আবিষ্কারের পর পণ্যবস্তুর চাহিদা বাড়িয়া যায়। বণিকেরা তখন কারিকরকে ক্রমেই বেশি মাল তৈয়ার করিবার জন্য চাপ দেয়; স্বল্পসাধন কারিকর অনেক ক্ষেত্রেই পণ্য উৎপাদনে ব্যাপারীর প্রার্থিত ক্ষিপ্রতা রক্ষা করিতে পারে না—নূতন দেশ, নূতন বাজার ও নূতন পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদনও সর্বদা সম্ভব হইয়া উঠেনা—তখন কারিকরকে ব্যাপারী তাহার নিজের শিল্পকেন্দ্রে কর্মচারী হিসাবে গ্রহণ করিয়া পণ্য প্রস্তুত করায়; এইভাবে ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র কারিকরেরা প্রায় সকলেই ব্যাপারীর কারখানার শ্রমিকে পরিণত হয়। এইসব কারখানার কাজে কারিকরেরা শ্রমিক হিসাবে নির্দিষ্ট বেতন পায়, আর হাতিয়ার, কাঁচামাল, কাজ করিবার জায়গা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সমুদয়ই ব্যাপারী অর্থাৎ কারখানার মালিক নিজে সংগ্রহ করিয়া দেয়।

ব্যাপারী এখন আর আগের সাধারণ বানিয়া নয়—কারিকরকে সে নিজের আয়ত্তে আনিয়া ফেলিয়াছে। প্রথম অবস্থায় শিল্পী বা কারিকর ব্যাপারীশ্রেণীর অধীন ছিল না—উৎপাদনের হাতিয়ার, কাঁচামাল, সমস্তই তাহার নিজের ছিল; ব্যাপারীই তখন পণ্যের জন্য কারিগরের নিকট হাত পাতিত—কিন্তু এখন অর্থনৈতিক হাওয়া উল্টা বহিতে শুরু করিয়াছে; ব্যাপারী তাহার কারখানা ও ঠিকাকর্মী কারিকরের প্রভু বনিয়া গিয়াছে। ব্যাপারীর আয়ত্তের বাহিরে স্বতন্ত্র কারিকরের সংখ্যা এখন খুব কম—আর যাহারা আছে, তাহারাও নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে না; কারণ ব্যাপারী কারখানার জিনিস সস্তা করিয়া যখন তখন বাজারদর নামাইয়া দিতেছে—ইহাতে স্বতন্ত্র কারিকরেরা নাকমলা খাইয়া ব্যাপারীর দ্বারস্থ হইয়া পড়িতেছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোড়াপত্তনের সময় ভারতবর্ষেও এই রকম বহু কারখানা খোলা হয়। এইসব কারখানায় মুখ্যতঃ মলমল প্রভৃতি কাপড় এবং গালিচা উৎপন্ন করা হইত। ক্রমে কোম্পানীর হাতে শাসনক্ষমতা আসিয়া পড়িলে স্বতন্ত্র তন্তুবায়দের দুর্দশার সীমা থাকেনা

* বর্তমান কালিনিন।

—এই সময় এদেশে বহু শিল্পকুশল জোলার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দিবার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়।*

আমরা যে অবস্থার বর্ণনা করিলাম তাহাতে ব্যাপারী কারখানার মালিক হইয়া গিয়াছে। তাহার লাভের উপায় এখন আর তৈয়ারী মালের খরিদ-বিক্রয়ের উপরই সীমাবদ্ধ নাই। ব্যাপারী এখন সস্তায় কাঁচামাল কিনিয়া লয়, সস্তায় হাতিয়ার বানাইয়া লয় এবং আরও সস্তায় মজুরের শ্রম ব্যবহার করে—কিন্তু জিনিষ বিক্রয়ের সময় সর্বোচ্চ দাম না পাইয়া তাহা বিক্রয় করে না। বাজারে কোন স্বতন্ত্র কারিকরের সহিত প্রতিযোগিতা হইলে নিজের পণ্যের দাম কমাইয়া দিয়া ব্যাপারী কারিকরের কোমর ভাঙ্গিয়া দেয়—তখন ব্যাপারীর কারখানায় মজুর হওয়া ছাড়া কারিকরের আর গত্যন্তর থাকে না। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের জোলাদিগের দিকে একবার দেখুন অথবা বুন্দেলখণ্ড বা মধ্যপ্রদেশের তাঁতিদের কথা স্মরণ করুন; কিংবা বাংলা, দক্ষিণ ভারত যে দিকেই তাকান না কেন, দেখিবেন, মিলের কাপড় সকল জায়গায়ই বয়নশিল্পীর ভাত মারিয়াছে; এই শিল্পীদের কেহ কেহ এখন বুভুক্ষু ক্ষেতমজুর, আর কেহ বোম্বাই, কানপুর কিংবা কোয়েম্বাটুরের কাপড়ের মিলে অথবা কলিকাতার চটকলে রুজি খাটিতেছে।

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উৎপাদনে হাতেচলা যন্ত্রেরই ব্যবহার হইত। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নূতন বাষ্পচালিত যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে কারখানাসমূহে ব্যাপকভাবে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়—এই ভাবে উৎপাদন ক্ষেত্রে হাতেচলা যন্ত্রের ব্যবহার ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসে। পরবর্তী অধ্যায়ে উৎপাদনে যন্ত্রের উৎকর্ষ সম্পর্কে আরও আলোচনা করিব। এখন পর্যন্ত ইহাই স্পষ্ট হইল যে, ব্যাপারীর কাজ শুধু ব্যাপার—ক্রয়বিক্রয়; এবং পুঁজিপতির কাজ প্রধানত তাহার নিজ কারখানায় পণ্যবস্তুর উৎপাদন করা।

(খ) **মজুর**—দাসযুগে শ্রমের চাহিদা বাড়ায় যুদ্ধবন্দীদিগকে হত্যা না করিয়া দাস করা হইত ইহা আমরা দেখিয়াছি। সামন্তযুগে পৌঁছিয়াও সমাজে এই প্রথা রহিত হয় নাই, এমনকি বহুদেশে দাসপ্রথা এখনও চলিত রহিয়া গিয়াছে। তবুও সামন্তাধীন সমাজে প্রভুদাস সম্পর্কে যে কিছু মূলগত পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই যুগে শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদিগকে সামন্ত প্রভুরা পূর্ববর্তী যুগের মত

---

* B. D. Basu—Ruin of Indian Trade and Industries.

হাটেবাজারে ক্রয়বিক্রয় করিতে পারিত না। তাহারা সামন্তের অধীন থাকিয়াও নিজের হাতিয়ার দিয়া নিজ নিজ ঘরে স্বতন্ত্র ভাবে জিনিসপত্র তৈয়ার করিত। শুধু বৎসরের কিছুকাল সামন্ত প্রভুর জন্য তাহাদিগকে বিনা বেতনে বা শুধু খোরাকীর বিনিময়ে কাজ করিয়া দিতে হইত।

আমার সর্বশেষ তিব্বত ভ্রমণের সময়ও সামন্তব্যবস্থা সেখানে পুরাপুরি বর্তমান ছিল। সেখানে দলাই লামার চিত্রকর নিজের ঘরে বসিয়া আপন চিত্র-শালায় স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিত। অপরের ফরমাইস জোগাইতে বা নিজ রুচিমত চিত্র আঁকিয়া বিক্রয় করিতে তাহার উপর কোন বাধানিষেধ ছিল না। তবে দরবারের ডাক আসিলে তাহাকে সব কাজ ফেলিয়া আগে দরবারের হুকুম তামিল করিতে হইত। ইহার বিনিময়ে চিত্রকর খাওয়াপরা পাইত আর লামা খুশী হইলে কিছু ইনাম-বকৃশিশও মিলিয়া যাইত। দরবারের ডাক না পড়িলে চিত্রকরকে বৎসারান্তে নিজের তুলিকায় ও শ্রমে তৈয়ারী নির্দিষ্ট সংখ্যক চিত্র দরবারে ভেট দিতে হইত। অবশ্য এইসব নিয়ম শুধু ওস্তাদ চিত্রকরের জন্যই—সাধারণ শিল্পীদের বেলায় ব্যবস্থা অন্য রকম ছিল। ছবির হাত পাকা না হওয়ায় তাহাদের চিত্র দরবারে উপযুক্ত বিবেচিত হইত না—এইজন্য তাহাদিগকে দরবারী ছবির কাঁচামাল: অর্থাৎ রঙ, তুলি ও পটের যোগান দিতে হইত। তিব্বতের এইসব চিত্রকরের দল লামার হুকুম ব্যতীত কখনও স্থান ত্যাগ করিতে পারিত না—মোটের উপর সেখানে চিত্রশিল্পীর উপর আরোপিত রীতি যে দাসযুগের অবশেষ ছিল তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। *

দাসযুগে মানবশ্রমের উৎপাদনক্ষমতা কম ছিল; ইহা শুধু মাত্রা বা পরিমাণের কথাই নহে—গুণের দিক দিয়াও দাসের শ্রম নিকৃষ্ট ছিল। দাসের শ্রম ছিল অনেকটা জেলের কয়েদীর মত; জেলে ওস্তাদ শিল্পীও ভাল করিয়া কাজ করে না—কারণ কয়েদী জানে হাজার মনোযোগ দিয়া কাজ করিলেও খোরপোষের অতিরিক্ত কপর্দকও সেখানে পাওয়া যাইবে না; তাই শ্রম ও চিন্তা খরচ না করিয়া শুধু চামড়া বাঁচাইবার মত কাজ করিয়া যাওয়াই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। অপর একদিক দিয়া দাসেরা সত্যসত্যই খুব বেশি নিশ্চিন্তও ছিল; মালিক তাহাকে একেবারে কতল করিয়া ফেলিবে না ইহা সে জানিত—কারণ তাহাকে কিনিয়া আনিতে

* বর্তমান তিব্বতে এইসব ব্যবস্থার অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং ক্রমেই সমাজতন্ত্রবাদী অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হইতেছে।

প্রভুর পয়সা খরচ হইয়াছে; বেকুব কৃষক ছাড়া কেনা বলদকে পিটিয়া মারিয়া ফেলিবে কে?

দাসের নিকট হইতে ভালভাবে কাজ আদায় করিতে হইলে তাহার কিছু স্বাতন্ত্র্যের দরকার। নিজের শ্রমের ফল ভোগ করিতে না পারিলে কাজে তাহার গা লাগিতে পারে না। সামন্তযুগে দাসদের এই আত্ম-স্বতন্ত্রতা কিছু পরিমাণে দেখা গিয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ। দাসের কেনাবেচা যুগের পরে সামন্তাধীন যে কমীনের দল সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারা প্রায়ই ক্ষেত্রকর্মী; সামন্তের বেগার খাটা ছাড়া ভূমির উপর তাহাদের নিজস্ব অধিকারও তখন কিছু কিছু ছিল—তবে কথা এই, সামন্ত জমিদারের মর্জিমত কমীনদের ভূমিজোতের অধিকার লোপ পাইত।

সামন্তযুগের অন্তকালে ইংলণ্ডে ব্যাপার বাণিজ্যের খুব প্রসার হয়। তখন তৈয়ারী মালের সঙ্গে সঙ্গে পশমের চাহিদাও বাড়িয়া যায়। সামন্ত জমিদারেরা এই সময় কৃষকদের নিকট হইতে জোত ছিনাইয়া লয়, এই নবলব্ধ ভূমিকে তাহারা মেষচারণার ক্ষেত্রে পরিণত করে।* এইভাবে জমি দখলের ফলে গামের পর গ্রাম উজাড় হইয়া যায়—নিরাশ্রিত কৃষক পুত্র-পরিবার লইয়া অন্ন অন্বেষণে দেশান্তরী হয়। এই সময় অনেক নূতন বাজার ব্যাপারীদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে—বাজারে পণ্যের চাহিদা হওয়ায় তাহারা হাতেচলা কারখানাও খুলিয়াছে। অসহায় কৃষানের দল এই সময় ব্যাপারীর কারখানায় মজুর হইয়া গেল। সারা এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা তখন ইংলণ্ডের পণ্য বিক্রয়ের বাজার; বাজারের চাহিদার সঙ্গে উৎপাদনের তাগিদও দিন দিনই বাড়িয়া চলিতেছে, কিন্তু কৃষককে যে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উচ্ছেদ করা গিয়াছিল সেই ক্ষিপ্রতায় তাহার কাজ জুটিল না—এই অবস্থায় লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষকের দুরবস্থা কি পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল তাহা সহজেই অনুভব করা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৌঁছিবার পর ব্যাপার-বাণিজ্য বাড়িয়া বাড়িয়া অবস্থা কিছুটা স্থির হইল। এই সময় বাষ্পযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়—ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহার প্রয়োগ আরম্ভ হইলে মজুরের জীবনে আর এক সঙ্কট ঘনাইয়া আসে। উৎপাদনের দিক দিয়া নূতন যন্ত্র হাতেচলা কলকে গুণে-পরিমাণে বহুব্যবধানে অতিক্রম করিয়া গেল। পূর্বে একশত গজ কাপড়ের জন্য দশজন শ্রমিকের প্রয়োজন হইত—এখন পাঁচ জনেই পর্যাপ্ত হয়। যে

* Capital, Vol. I.

কারখানায় নূতন ধরণের তাঁত বসিল, সেখানেই ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হইল; সামন্তযুগে ক্ষেতকর্মী যেমন একদিন জোতজমি হারাইয়া নিরাশ্রয় হইয়াছিল—পুঁজিবাদীযুগে যন্ত্রের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে অগণিত শ্রমিকও তেমনি পথে বসিল। কত পরিবার এই বিপর্যয়ের মুখে পড়িয়া অনাহারে মরিল তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অবস্থায় শ্রমিকেরা স্বতঃই ভাবিল যে যন্ত্রই শত্রু, যন্ত্রই তাহাদের বিপত্তির মূল- তাই তাহারা কারখানা চড়াও করিয়া অনেক জায়গায় যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়া দিল।*

উৎপাদন ক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রয়োগ আরম্ভ হইবার পর পণ্যের দাম অনেকটা কমিয়া যায়; কিন্তু হাতে তৈয়ারী জিনিসপত্রের দাম সেই অনুপাতে তেমন হ্রাস পায় না—ইহার কারণ হাতে তৈয়ারী জিনিস যে সর্বদাই কলের জিনিস হইতে উৎকৃষ্ট হইত তাহা নহে; জিনিসের মূল্য, আমরা জানি, বিশেষ করিয়া তাহার জন্য ব্যয়িত শ্রমের উপর নির্ভরশীল। যেমন, মাটি - মাটির কোনো মূল্য নাই, কিন্তু মাটির বাসনের একটি নির্দিষ্ট দাম আছে —সেই দাম কুমারের যন্ত্রপাতির ক্ষয়খরচা ও তাহার শ্রমের অনুপাত দিয়া নির্ধারিত হয়। অবশ্য পণ্যদ্রব্যের দুর্লভতার জন্যও সময় সময় তাহার দাম বাড়িতে পারে—কিন্তু সেই ভরসায় পুঁজিপতিকে তাহার কারবার খাড়া করিলে চলে না—পুঁজিপতির কাজ হইল পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে সুলভ করা। অনেক সময় পণ্যের উৎপাদন-সময়ে যে শ্রম বৃথা ব্যয়িত হয়, তাহা নিতান্ত আকস্মিক না হইলে, সেই অপব্যয়িত শ্রমও দ্রব্যমূল্যের সামিল হইয়া পণ্যের দাম চড়াইয়া দেয়। আমরা সকলেই জানি হীরা খুব মহার্ঘ জিনিস, ইহার কারণ হীরা আহরণে বিপুল শ্রম ব্যয়িত হয়। যদি কোদালের প্রতি কোপে একখণ্ড হীরা উঠিয়া আসিত, তাহা হইলে এই মহার্ঘতার কারণই থাকিত না; তখন বাজারে কাচে হীরায় সমান দর হইত, এমন কি হীরার দর আরও পড়িয়া যাইত।

(গ) **লাভ ও পুঁজি**—যন্ত্রের প্রয়োগে মানুষের শ্রমশক্তি বাড়িয়া যায় ইহা খুব সত্য কথা—কিন্তু সমাজের হিত যদি উৎপাদনের মূল প্রেরণা না হয়, তাহা হইলে মানবশ্রম সম্পর্কে এই সত্য অর্ধ বা খণ্ডিত সত্য; অর্থাৎ উৎপাদনে নিয়োজিত এই শ্রম তখন সমাজের তেমন উপকারে আসে না—

* **Luddite Movement. (The History of British Trade Unionism, W. & B. Webb. 1950). p. 87-89.**

Past & Present (Journal) Feb. 1952. p. 57-70.

সামাজিক-কল্যাণ-বিবর্জিত মুনাফার লুটেই তাহার শেষ পরিসমাপ্তি হয়। আমরা জানি, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যও হইল মুনাফা, এই মুনাফার সহায়তায় পুঁজিকে উত্তরোত্তর বর্ধিত করা তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য। এখানে পণ্যের উৎপত্তি হইতে তাহা গুদামজাত হইয়া পচিয়া নষ্ট হওয়া পর্যন্ত, শুধু মুনাফা, অধিকতর মুনাফা,—মুনাফার লালসা ছাড়া পুঁজির রাজ্যে আর কোনরূপ কথা নাই। মুনাফার অর্থ হইল, পণ্যের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে তাহা কম দরে খরিদ করা—এবং ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিবার সময় তাহার বাস্তবিক মূল্যের অধিক দাম লওয়া। মজুর খাটাইবার সময়ও পুঁজিপতির লক্ষ্য এই মুনাফার উপরই নিবদ্ধ থাকে—মজুরকে বেতন কম দিয়া তাহার নিকট হইতে বেশি কাজ আদায় করায়ই উহার লাভ। এই লাভের উপরও মজুরের বেতনের একটা অংশ পুঁজিপতির পকেটে ফিরিয়া যায়—ইহার রহস্য, মজুর পুঁজিপতির নিকট হইতে তাহার আবশ্যকীয় পণ্য ক্রয় করিতে বাধ্য, ইহাতে তাহার বেতন বা মজুরীতে পরিবর্তিত শ্রমের সঙ্গে কেনা পণ্যের বিনিময় হয়—এই বিনিময়ে পুঁজিপতি মজুরের নিকট হইতেও পণ্যের সেই স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে; তাই মজুর পুঁজিপতির নিকট হইতে শুধু তাহার শ্রমমূল্য বা মজুরীই যে কম পায় এমন নহে—মজুরীতে পরিবর্তিত নিজের শ্রমের অপর একটা অংশও তাহাকে পুঁজিপতির নিকট ছাড়িয়া দিতে হয়। †

এখন মুনাফার মূল সূত্রটি পুনরুক্তির সম্ভাবনা সত্বেও আমরা আবার বিশ্লেষণ করিয়া লইব; পূর্বেই বলিয়াছি ব্যবহার্য প্রত্যেক জিনিসের দামই তাহার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত শ্রমের অনুপাত দিয়া নির্ধারিত হয়। জল, বায়ু বা সূর্যালোকের কোন মূল্য নাই—কারণ, আমরা জানি, তাহাতে মানবশ্রম ব্যয়িত হয় না। কিন্তু শহরের পরিশ্রুত জল বা মরুভূমিতে আহৃত জলের দাম আছে—ইহাতে মানবশ্রমের প্রয়োজন পড়ে। এখন অপর দিক হইতে আমরা বলিতে পারি, বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত জিনিসেরই শুধু দাম নাই; কারণ এই যে, দ্রব্যের উৎপাদনে বা আহরণে নিয়োজিত শ্রমের অনুপাতেই দ্রব্যমূল্য

† এই পণ্য এই বিশেষ মজুরের শ্রমে নির্মিত নাও হইতে পারে; কিন্তু যাহার শ্রমেই নির্মিত হউক সেও মজুর—সেই মজুরকেও শ্রমমূল্যের বেলা ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে—এবং ক্রেতা-মজুরের নিকট হইতে আবার মুনাফা লুটা চলিতেছে; গড়পড়তা হিসাবে তাই বলা চলে যে মজুর দুই বার ঠকিতেছে—এবং সেই সঙ্গে পুঁজিপতিও এই দুই দফেই ঠকাইতেছে।

নির্ণীত হয়। এইভাবে মূল্য ও শ্রম পণ্য-উৎপাদনের বেলায় দুই পাল্লায়ই একসঙ্গে পা দিয়া রাখে।

এইবার উৎপাদন-ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি দিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে শ্রমের মালিক হইতেছে মজুর। পণ্য-উৎপাদনে একমাত্র মজুরই শ্রম করে এবং এই শ্রমের ফলেই দ্রব্যের মূল্য উপজাত হয়। তাই একান্ত সঙ্গতভাবেই পণ্যোৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমের সম্পূর্ণ মূল্যফল মজুরের প্রাপ্য। কিন্তু এই শ্রমমূল্য সবটাই যদি মজুরকে দিয়া দিতে হয়, তবে পুঁজিপতির মুনাফা আসিবে কোথা হইতে? আর পুঁজিপতি ত নিছক ধর্মার্জনের জন্য কারবার ফাঁদিয়া বসিয়াছে এমন নয়। এই কারবারের মুনাফা হইতেই পুঁজিপতির বাড়ী চাই, গাড়ী চাই—তাহার বিবির জন্য ঠাটঠমকের সাড়ী চাই, চিত্ত-প্রসাদনের প্রসাধন চাই; বাচ্চার নিরর্থক অপব্যয়ের যে বিপুল অর্থ তাহাও একমাত্র এই সূত্রেই আসে; নিজের দাক্ষিণ্য ও মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য খয়রাতী ধনের অমোঘ ভাণ্ডারও ইহাই—তাই শ্রমের মূল্য যদি শ্রমিককেই দিয়া দিতে হয় তাহা হইলে এত সব আসিবে কোথা হইতে? পুঁজিপতি মজুরের শ্রমমূল্য বা পারিশ্রমিক আত্মসাৎ করিয়াই এই বিপুল খরচ যোগাইয়া থাকে। পুঁজিপতির ছোট মিল বড় হয়, একটি মিলের জায়গায় দুইটি মিল জাঁকাইয়া উঠে—পুঁজির পরিমাণ দেখিতে দেখিতে দশলাখ হইতে দশকোটির সীমাঙ্ক ছাড়াইয়া যায়—কিন্তু মজুরকে তাহার ন্যায্য শ্রমমূল্য দিয়া দিলে তাহার এই বিপুল বৈভবের সৃষ্টি হইতে পারে না। মজুরের নিকট হইতে পুঁজিপতি তাহার কারখানায় দিনে আট ঘণ্টায় মত কাজ আদায় করে—এই সময়ের মধ্যে সে এক টাকার তুলাকে চার টাকার কাপড়ে রূপান্তরিত করিয়া দেয়। এই ক্ষেত্রে ঘর ও যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিয়া ন্যায়ত দুই টাকা মজুরের শ্রমমূল্য হয়—কিন্তু মজুরকে আট আনার মত পারিশ্রমিক দিয়া বাকী অংশ পুঁজিপতি চুরি করিয়া নেয়। ইহার অর্থ এই যে প্রতি ঘণ্টায় তুলার সঙ্গে চার আনার শ্রম মিশিয়া কাপড় তৈয়ারী হইয়াছে—কিন্তু মজুরের ভাগ্যে যে শ্রমফল মিলিয়াছে তাহা মাত্র তাহার দুই ঘণ্টার শ্রমের উপযোগী। বাকী ছয় ঘণ্টার শ্রমের দাম কোথায় গেল? নিশ্চয়ই পুঁজিপতির পকেটে চলিয়া গিয়াছে—এই ভাবে অপরের শ্রম চুরি করিয়াই আজ তাহার শানসৌকত ও ধনদৌলতের ছড়াছড়ি; তাহার বিলাস-বৈভবের দিকে লক্ষ্য করিলে সামন্ত যুগের শাহাজাদার ঠাটবাটও ঝুটা বনিয়া যায়। আমি একজন শেঠজীকে জানি, যিনি তাঁহার পুত্রকন্যার শিক্ষার জন্য বৎসরে লক্ষ টাকা ব্যয় করেন; তাহার উপর ইয়োরোপ বা আমেরিকায়

সপত্নীক দেশভ্রমণও প্রায় সালে করিয়া থাকেন—এই দেশপর্যটনে রেল, জাহাজ বা বিমানের সর্বোচ্চ শ্রেণীই যে ব্যবহৃত হয় তাহা আর বলিতে হইবে কেন? সঙ্গে সঙ্গে দেশে ও বহির্দেশে সর্বাধিক চালদুরন্ত মহার্ঘ হোটেল ছাড়া শেঠজীর মুখে দানা উঠে না—ইহা ছাড়াও, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাহা খুসী আপনারা বলিতে পারেন, কিন্তু শেঠজী হইতেছেন 'ঘাসাহারী'—তাঁহার উদরগত অহিংসার জন্যও আবার বিদেশী হোটেলে খাওয়া বাবদ খরচ অত্যন্ত বেশি পড়িয়া যায়। কিন্তু একবার ভাবুন ত, শেঠজীর এক এক সফরে এই যে জলের মত পঞ্চাশ যাট হাজার টাকা বহাইয়া দেওয়া হয়, তাহা আসে কোথা হইতে? ইহার উত্তরও আপনারা অতি সহজেই নিধারণ করিতে পারেন—শ্রমিকের সেই ছয় ঘণ্টার চুরিকরা শ্রম হইতে। অথচ টাকাকে যিনি খোলামকুচির মত মনে করেন, সেই পরম নিরাসক্ত শেঠজীই মজুরকে ঘণ্টাপ্রতি এক পয়সা বেশি মজুরী দিতে হইলে মিলের দরজায় পুলিস ডাকেন, শ্রমিকের উপর গ্যাস ছাড়েন, লাঠি ও ডাণ্ডা চালান, গুলি চালান, শ্রমিকের উপর দিয়া লরী চালাইয়া দিতেও পরোয়া করেন না।

শেঠজীর খরচের বহর এইখানেই শেষ হইল না—প্রতি বছর কারণে অকারণে তাঁহাকে বাড়ী মেরামত করাইতে হয়, পুরাতন গৃহসজ্জা অযথা পালটাইয়া নূতন আসবাব ও নূতন সজ্জায় বর্ষশেষে গৃহ সজ্জিত করা শেঠজীর অভ্যাস। নূতন কারবারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন শহরে শেঠজীর নূতন নূতন মহল খাড়া হয় অসংখ্য মালী, চৌকিদার মিলিয়া সারা বছর শেঠের নূতন বাড়ীর তদারক করে, শেঠজীর মর্জি হইলে বৎসরে সামান্য কিছুদিনের জন্য এই বাড়ী ব্যবহার করেন, প্রায়ই তাহা অব্যবহৃতই থাকে। এই সব বাড়ী ছাড়া সিমলা-দার্জিলিং-এও শেঠজীর বড় বড় রাজসিক বাংলা আছে—ভারতীয় গ্রীষ্মে অতিষ্ঠ শেঠজী বিদেশমুখী না হইলে এই সব শৈলাবাসে আশ্রয় লন। কিন্তু এই সমস্ত মাত্র শেঠজীর শারীরিক সুখের খরচ—মজুরের ছয় ঘণ্টার চুরিকরা শ্রম ইহাতেই ব্যয়িত হইয়া যায় না। শেঠজী প্রায়ই লাট-বেলাটকে ও রাষ্ট্রপতিকে ভোজ দেন, ইহার সঙ্গে প্রদেশের ও কেন্দ্রের মন্ত্রীবাহিনীও সময় সময় সামিল হন; এই ভোজন কখনও হয় তাঁহার নিজ আবাসে, কখনও বা সিমলা-দার্জিলিং-এর শৈলাবাসে। জিলার এবং শহরের বড়কর্তা কালেক্টর-কমিশনারের সঙ্গে শেঠজীর দহরম-মহরম সম্বন্ধ, তাঁহাদের নিত্য ভোজ আর চা-পার্টি সারা বছর ধরিয়া অফুরান ভাবে চলিতে থাকে। ইহাদের সেবাগৌরব লাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য শেঠের মোটর ও মোটরলঞ্চ

সর্বদা প্রস্তুত হইয়া আছে। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী কোন তহবিলের জন্য চাঁদা প্রার্থনা করিলে, শেঠজীর থলির মুখ খুলিয়া যায়। জিলার কর্তারা নিজ নিজ পরিকল্পনা লইয়া উপস্থিত হইলে শেঠের নিকট হইতে বিফল হইয়া যান না। কিন্তু এই অমিত অর্থের উৎস কি? তাহা আসে কোথা হইতে? নিশ্চয়ই সেই ছয় ঘণ্টার চুরিকরা শ্রম হইতে।

শেঠজী কাপড়, পাট, চিনি এই সমস্ত মিলিয়া এক ডজনের চেয়েও বেশি মিলের মালিক। তাঁহার কারখানাগুলিতে খুব কম করিয়াও পঞ্চাশ হাজারের অধিক মজুর কাজ করে—অর্থাৎ দৈনিক তিনলক্ষ ঘণ্টার শ্রম বা তাহার মূল্য পঁচাত্তর হাজার টাকা সেখানে চুরি হয়। শেঠজীর ঘরে লক্ষ্মী-প্রবেশের ছিদ্রপথটি যে কিরূপ তাহা নিশ্চয়ই আর অস্পষ্ট নাই। তবে একটি কথা পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি এই অর্থ নিঃসঙ্গে ভোগ করেন না। শেঠজী গান্ধীজীর ভক্ত; খাদি তহবিলে তিনি হাজার হাজার টাকা দান করিয়াছেন—তিনি নিজেও খাদি পরিধান করেন এবং এই খাদি-মহাত্ম্যে তিনি উচ্চনীচের ভেদ নিবারক বলিয়া কীর্তিত হন। কিন্তু শেঠজী, আমরা বিশেষভাবে জানি, একবার মাত্র পরিধান করিয়াই অস্পৃশ্যজ্ঞানে সেই বস্ত্র ত্যাগ করিয়া দেন; পরে ধোবীখানা হইতে বিশেষ ইস্ত্রি-কলপে মণ্ডিত হইয়া বকপক্ষ খাদি যখন আবার গৃহে প্রবেশ করে—তখন আর যাহাই হউক, অন্ধও এই কথা বলিবেনা যে, খাদি ভেদভাব মিটাইয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া শেঠজী ভুলেও কখনও ষাট টাকা জোড়ার কমে কাপড় পরেন না—কারণ তিনি 'আন্ধ্রখাদি'পরা সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি ইমানদার; ইহা না হইলে পাঁচ টাকা দামের মিলের খাদিই লোকের চোখে ধূলা দিবার পক্ষে যথেষ্ট হইত, আর শেঠজীর ষাট টাকা জোড়ার খাদির তুলনায় টেকসইও হইত। যাহা হউক, শেঠজী গান্ধীজীর বড় ভক্ত, তাঁহার দান না পৌছিলে গান্ধী তহবিলের অর্থসংগ্রহণ সম্পূর্ণ হয় না। গান্ধীজীর সাথীসমাজীবর্গের আব্দার-সুপারিশ পূরণ করিতে শেঠজী সর্বক্ষণ উদ্যত হইয়া আছেন; তাঁহার সমস্ত মহল, বাংলা, অট্টালিকা এবং শৈলাবাসের ফটক চিরসময় ইঁহাদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। হরিজন তহবিলে এই কিছুদিন আগেও তিনি বিশহাজার টাকা দান করিয়াছেন—একদিন শহরের নর্দমায় নামিয়া নিরভিমান শেঠজী নিজ হস্তে ঝাড়ুই দিয়াছেন। গান্ধীসম্প্রদায়ের ভক্তমালের মধ্যে তিনি অন্যতম মধ্যমণি, অহিংসাধর্মে শেঠজী সুমেরুর মতন অটল। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার সমস্ত অনুষ্ঠানের উৎস—সেই ছয় ঘণ্টার শ্রম চুরির কথা ভুলিলে চলিবে না।

শেঠজীর অপরাপর গুণের মধ্যে হইল, তিনি প্রচণ্ডতম আস্তিক এবং সাতিশয় ধর্মভীরু পুরুষ। ভগবদ্গীতার লক্ষ কপি ছাপাইয়া ইতিমধ্যেই তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার এক মিলের চত্বরে তিনি বহু অর্থব্যয়ে একটি পরম সুন্দর মন্দিরও তৈয়ারী করাইয়াছেন—শেঠজী মজুরের পাকস্থলীর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পারলৌকিক সদ্গতির জন্যও বিশেষ উদ্বিগ্ন। শেঠজীর মন্দিরে হরিজনদের অবাধ প্রবেশাধিকার আছে—তাহারা সেখানে নিষ্কণ্টকভাবে ভজন পূজন করিতে পারে। পরমপূজ্য পণ্ডিত মালবীয়জীর দ্বারা শেঠ এই মন্দিরের প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন করান; মালবীয়জী এই উপলক্ষে শেঠের ধর্মপ্রাণতা ও হিন্দুপনার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছিলেন —হিন্দী, ইংরেজী সমস্ত জাতীয়তাবাদী পত্রে এই প্রশংসাবাণী উজ্জ্বল শিরোনামায় ছাপা হয়, ইহা ছাড়া শেঠজীর এই সমারোহে স্বয়ং গান্ধীজীর হস্তলিখিত একটা আশীর্বাণীও আসিয়া গিয়াছিল। মালবীয়জীকে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদ রসায়নাগারের জন্যও শেঠজী পঁচিশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতায় সেই বৎসরের বৈদ্য মহাসম্মেলনে শেঠজীর প্রশংসাবাদ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শেঠজী ইংরেজীশিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি—এইজন্য ভারতের বাহিরে তাঁহাকে ইংরেজী পোষাকই পরিতে হয়; তাঁহার সুটকেসে তখন একপ্রস্ত খাদি সুট মজুত থাকিলেও উঁহার স্বাজাত্যাভিমান ঠিক অন্ধশ্রদ্ধা নয়। এই অন্ধশ্রদ্ধা হইতে মুক্ত বলিয়া ধার্মিক ব্যাপারেও তিনি আধুনিকতাকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের শেঠজীর অভ্যাস ছিল, তিনি পূর্বে যখন তখনই অরবিন্দ আশ্রমে যাইতেন; সেখানে বারবার যোগিরাজকে দর্শন করিয়া আসিয়া ভাবাপ্লুত চিত্তে বলিতেন, আহা হা, সেই দিব্য পুরুষের অবয়ব হইতে যেন দিব্য তেজ আর শান্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে। সাধুসন্দর্শনে শেঠজীর সত্যই অপার আগ্রহ, তিরুবন্নামলের ঋষিকে তিনি বহু বহুবার দর্শন করিয়া আসিয়াছেন—এই মহাপুরুষকে দেখিবার পূর্বে শেঠের অন্তর্যামিতা আর যোগশক্তির উপর নাকি বিশ্বাস ছিল না; কিন্তু থিওজফিতে শেঠজী চিরদিনেরই অনুরক্ত, ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি সোসাইটির সদস্য ছিলেন— মাতা বাসন্তীর কর্পূরগৌর মুখ হইতে জগৎগুরুর আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া শেঠজী ধন্য হইয়াছেন, জগৎগুরু সম্পর্কিত মামলায় মাতা বাসন্তীকে অর্থ সাহায্য করিয়া তিনি স্টার অর্ডারের সদস্য পদ লাভ করেন।

ধর্মানুরাগেই বলুন আর দীনতার অভিমানেই বলুন, শেঠানীজী কোন

দিক দিয়াই শেঠ হইতে কম যান না। আগে একবার পূজা দিবার জন্য তিনি হাওয়াই জাহাজে উড়িয়া হরিদ্বার হইতে বদ্রীনারায়ণ গিয়াছিলেন —সেখানকার বিগ্রহকে শেঠানী খুব দামী এক হার আর পাণ্ডাপূজারীকে প্রচুর দক্ষিণা দিয়াছিলেন—এই দক্ষিণার প্রচুরতা এতই অধিক ছিল যে, দানের কথা উঠিলে আজও সারা পাহাড় শেঠানীর নামে গুঞ্জরিয়া উঠে। শেঠানী কালীকমলীওয়ালা ক্ষেত্রে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, সেখানকার তপ্তকুণ্ড মর্মরে বাঁধাইয়া দিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল ;.কিন্তু একদিকে বদ্রীনারায়ণের বরফ আর অন্যদিকে কুণ্ডের উষ্ণতা, এই তাপবৈষম্যের জন্য মর্মরের স্থায়িত্বে অনেক সন্দেহ প্রকাশ করেন—পুণ্যাভিলাষিণী শেঠানী এই বিষয়ে নিশ্চিতা হইবার জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অবধি লইয়াছিলেন— অবশ্য শেষাশেষি তাঁহার স্বর্গগতা মায়ের নামে কুণ্ডে স্মৃতিমর্মর স্থাপনার কাজ তিনি স্থগিত রাখেন।

শেঠানীর কন্যকারা কিন্তু পরস্পর ইংরেজীতে কথাবার্তা বলেন, তাঁহাদের দুইজন এখন 'বিলায়তে' থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছেন—অবশ্য শেঠানী তাঁহার পিতৃগৃহে রামায়ণ শেষ করিবার পর আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তবে শেঠের সান্নিধ্য এবং বিদেশ-যাত্রার ফলে তাঁহার মুখেও আধ-আধ-ইংরেজি বুলি ফুটিয়াছে। শেঠজী পরিবারের কর্তা হইবার পর শেঠানীকে মেম রাখিয়া ইংরেজী ঘোল খাওয়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কথায় ঐ যে বলে, 'বুড়া তোতা রাম নাম শিখিবে কবে,' এই ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। প্রথম জীবনে শেঠানী বিষম ছুৎমার্গী ছিলেন, একবার শেঠজী বিলাত ঘুরিয়া আসিলে শেঠানী তাঁহাকে ধর্মভ্রষ্ট মনে করিয়া নিজের রান্নারসুই আলাদা করিয়া লন। এই অবস্থায় বিলাত হইতে শেঠজীর নামে এক চিঠি আসিলে শেঠানী কৌতূহলী হইয়া তাহা খুলিয়া ফেলেন—চিঠির খামের ভিতর, হায় হায়, একটি অনুপমা গৌরাঙ্গী সুন্দরীর সুগন্ধিত ফটো বিরাজ করিতেছিল! শেঠানীর সম্মুখে, কি বলিব, যেন ঝাঁকাচাপা সাপ বাহির হইয়া আসিল, তিনি আবার চিঠিখানা সাঁটিয়া চুপে চাপে যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন—কিন্তু এই সাপের চিন্তা হইতে শেঠানী এক মুহূর্ত রেহাই পাইলেন না। তাঁহার মনে থাকিয়া থাকিয়া সে সুগন্ধিত নারীচিত্র ঝলসিয়া উঠিতেছিল। শেঠানী ভাবিলেন, শেঠজীর আকাঙ্ক্ষা মত ইংরেজী না শিখিয়া তিনি জীবনে মস্ত ভুল করিয়াছেন ; ইংরেজী শিখিলে আজ বিলাতী নাগিনীর পাশে শেঠ হয়ত এমন করিয়া বদ্ধ হইতেন না। শেঠানী তাঁহার মনের কথা শেঠের নিকট

বিন্দুমাত্রও ব্যক্ত করিলেন না, কিন্তু সামনের বৎসর বিলাত যাইবার সময় বায়না ধরিলেন, 'মৈঁভী চলুংগী'। শেঠানীর এই পরিবর্তনে শেঠ আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু আসল রহস্যটি তাঁহার বোধগম্য হইল না; শেঠানী আবার বলিলেন, পতির ধর্মই সতীর ধর্ম, তুমি যাহা চাও তাহাই আমাকে করিতে হইবে। পত্নীর আধুনিকতায় শেঠ আরও সন্তুষ্ট হইলেন—কিন্তু পত্নী যে তাঁহার রাখালী করিবার জন্য বিলাত যাইতেছে, ইহা তাঁহার মনেও হইল না। সেই দিনই শেঠজী তিনশ টাকা বেতনে 'বিদ্যার্থীনী' শেঠানীর জন্য একটি মেম মাস্টার রাখিয়া দিলেন। সেইবার বিলাত যাত্রায় সেই মেম মাস্টারনী অবশ্য বরাবরই শেঠ-শেঠানীর সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। শেঠানী কিন্তু বিলাত গেলেও তাঁহার দানপুণ্যের শোহরৎ বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় নাই—সেইদিনও তিনি 'কল্যাণের' হাজার কপি ছাপাইয়া নিঃখরচায় ধর্মপ্রাণদের মধ্যে বিলি করাইয়াছেন।*

শেঠজীর পরিবারে তাঁহার বাপদাদার আমল হইতেই ব্যবসায়িক মুনাফার এক অংশ দান-খয়রাতের ব্যবস্থা আছে—আলোকপ্রাপ্ত শেঠ একবার ইহাকে বেঅকুফী মনে করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন—কিন্তু মা, স্ত্রী ও সমাজের ভয়ে তিনি নিজের এই চিন্তাকে কার্যে পরিণত করিতে সাহসী হন নাই; এখন অবশ্য পরিবারের খয়রাতী খাতকে শেঠজী পিতামহদের দূরদৃষ্টির নিদর্শন বলিয়াই মনে করেন। শেঠের বাপদাদার সময় দান-খয়রাতের টাকাও আধুনিক বিক্রয় করের মত গ্রাহকের নিকট হইতেই তুলিয়া লওয়া হইত—শেঠপিতামহগণ সেই টাকা সাধারণত ব্রতে-তীর্থে ও ব্রহ্মভোজে ব্যয় করিতেন, কিংবা তাহা দ্বারা ধর্মশালা দিতেন—অন্যান্য শ্রাদ্ধাপর্বের অনুষ্ঠান বা অন্য রকম সদাব্রতেও শেঠের পূর্বপুরুষদের 'ধর্মাদা খাতে'র টাকা ব্যয় হইত—কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা পুঁজিতে সংলগ্ন করিয়া সেই লাভের অর্থ দ্বারা উঁহারা পুনরায় দানধ্যান করিতেন। আমাদের শেঠজীর কারবার কিন্তু তাঁহার স্বর্গগত বাপঠাকুরদার মত কয়েক লাখের কারবার নয়। শেঠজী কোটিপতি, শুধু কোটিপতি কেন, কোটি-কোটি পতি, বহু কোটি তাঁহার মূলধন; পূর্বপুরুষের মত তিনি ব্যাপারী নন তিনি কারখানাদার, তাই তাঁহার মুনাফাও কারখানাদারের মত, অর্থাৎ পূর্বগামীর তুলনায় বহুগুণে অধিক। এই অবস্থায় শেঠজীর দানধর্ম শুধু নিয়মরক্ষাই নয়, বাপের আমল হইতে তাহা চারগুণ বাড়িয়া গিয়াছে—ধর্মখাতের টাকায় তিনি এখন মিল চত্বরে মন্দির

* গোরক্ষপুর হইতে প্রকাশিত ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল 'কল্যাণ' নামক ধর্মপত্রিকা।

তুলিয়াছেন, মালবীয়জীকে হেলায় পঁচিশ হাজার টাকার চেক কাটিয়া দিয়াছেন—গান্ধী, কস্তুরবা, খাদি, হরিজন ও অন্যান্য অর্থসংগ্রহণ তহবিলে দানের প্রবাহকে নির্বাধ রাখিয়াছেন। সাবেক দিনে ভাইসরয়-গভর্ণরের নিকট হইতে আবেদন আসিলে শেঠজী এই ধর্মখাত হইতেই তাঁহাদিগকে টাকা দিতেন; সেইবার সীমান্ত প্রদেশের চিফ জস্টিস দেশীয় খ্রীস্টানদের জন্য গীর্জা প্রতিষ্ঠাকল্পে শেঠের নিকট সাহায্য চান—শেঠজী ইহার উত্তরে চিফ জস্টিস মহোদয়কে দশহাজার টাকার চেক কাটিয়া দিয়াছিলেন। তারপর রেডক্রশ, যুদ্ধ-তহবিল, ওয়াই. এম. সি. এই সব নূতন প্রণালীর দানেও শেঠজী বরাবর মুক্তহস্ত ছিলেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে এমন নিরন্তর অঢেল অফুরন্ত দানেও শেঠের ধর্মখাতের টাকা নিঃশেষ হয় না—কিছুদিন আগে তিনি নাকি পাঁচ লাখ টাকা খরচ করিয়া লণ্ডনে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়াছেন।

কিন্তু দান, পুণ্য খয়রাতের এত অর্থ আসে কোথা হইতে? নিশ্চয়ই শ্রমিকের সেই ছয় ঘণ্টার চুরিকরা শ্রম হইতে। শ্রমিক-ফাঁকি-দেওয়া এই চুরিকরা শ্রমমূল্যই শেঠজীকে এমন 'পরমুণ্ডে ফলাহার' করিবার সুযোগ দিয়াছে। শ্রমিকের পারিশ্রমিকের টাকায় শুধু যে শেঠের দানপুণ্য আর পরিবারের আবশ্যকীয় খরচ মিটান হয় তাহা নয়—এই অপহৃত অর্থে শেঠজীর ব্যবসায়ও বাড়ে, শ্রমিকের শ্রমফল শেঠের পুঁজি হইয়া তাঁহার কারখানার সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া দেয়। বাপদাদার আমল হইতে আজ শেঠজী যে বিশগুণ অধিক পুঁজির মালিক হইয়াছেন তাহার মূলেও এই ছয় ঘণ্টার চুরিকরা শ্রমই কাজ করিয়াছে। আর শুধু শেঠজীই বা কেন, শেঠজীর কারখানার সমস্ত পণ্যবহ দালাল, এজেণ্ট, খুদে এজেণ্ট, সেখানকার বড়বাবু ও বড়সাহেব, সকলেই এই ছয় ঘণ্টার অপহৃত শ্রমের উপর রঙের টেক্কা মারিয়া চলিয়া যাইতেছে।

এই অবস্থায় আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, পুঁজিপতি শ্রমিকের মজুরী চুরি করিয়া তাহার অধিকাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পুনরায় পুঁজি হিসাবে নিয়োগ করে। পুঁজি বলিতে, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, তাহা পণ্যের বাস্তবিক মূল্য হইতে মজুরীর ব্যয় বাদ দিয়া উদ্বৃত্ত অংশের বড় ভাগকে বুঝাইয়া থাকে। এই পুঁজি বা উদ্বৃত্তমূল্য হইতেছে পুঁজিপতির বাণিজ্য ব্যবসায়ের একমাত্র লক্ষ্য, ইহারই এক অংশ দিয়া পুঁজিপতি কারখানা বাড়ায়, যন্ত্র খরিদ করে, কাঁচামাল আনাইয়া লয়, আবার সেই কাঁচামাল দিয়া নূত

মাল সৃষ্টি করিয়া তাহাকে পণ্যে পরিণত করে এবং পরে সেই পণ্য উর্ধ্বতম মূল্যে বিক্রয় করে আর বিক্রয়লব্ধ অর্থের তুচ্ছ অংশ মজুরকে দিয়া বাকীটুকুতে আবার কারখানা বানায়, নূতন যন্ত্র ক্রয় করে এবং পুনরায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্যোগী হয়। পুঁজিবাদী প্রথার নিয়মই হইল উৎপাদনের বেগ ক্রমবর্ধিত রাখিয়া তাহার বিস্তার সাধন করা এবং তাহা হইতে মুনাফা পেটা।

(ঘ) **ব্যবসাসঙ্কট**—হাতেচলা কলের জায়গায় বাষ্পযন্ত্রের প্রয়োগ হইবার কারণ হইল, বাষ্পযন্ত্রে শ্রম কম ব্যয়িত হয়, অথচ উহা দ্বারা উৎপাদনের বেগ পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া যায়। কোন মিউজিয়মে গিয়া একশ' বছর আগের তাঁত দেখিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত আধুনিক যন্ত্রের তুলনা করিলেই দেখিবেন, ইহাদের মধ্যে আকাশজমীন প্রভেদ আছে;—আর আমি একশ বৎসরই বা বলি কেন—বিশ বছর আগের বয়নযন্ত্রের সঙ্গেই আধুনিক যন্ত্রের তুলনা করিয়া দেখুন, উৎপাদনে মানবশ্রম এখন কত বাঁচিয়া গিয়াছে, কত অল্প আয়াসে এবং কী অপরিসীম তীব্রতার সঙ্গে এখনকার যন্ত্র পণ্য সৃষ্টি করে এবং এই সৃষ্টির পরিমাণ কিরূপ বিপুল, কেমন অবিশ্বাস্য রকমের অধিক। এইত মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে ভারতবর্ষে ভাল করিয়া চিনির কল বসিয়াছে, কিন্তু এই নূতন যন্ত্র পত্তনের পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যেই উৎপাদন এত বাড়িল যে, ব্যবসায়ীরা বহির্ভারতের বাজার না বাড়াইয়া আর পথ পাইল না। পনর বছরের মধ্যে উৎপাদনের তুলনায় এই বাজারও ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইতে হইতে এক অদ্ভুত অচল অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তুলিল; মিল-মালিকেরা অনন্যোপায় হইয়া চাষীদের লক্ষ লক্ষ মণ আখ পূর্বপ্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল; ফসলের এই ঘাটতিতে কৃষকেরা এত চটিয়া গেল যে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্টকে বহু টাকা কৃষকদিগকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

এইভাবে যন্ত্র দিন দিন উন্নত হইবার ফলে পুঁজিপতির বাজার এক এক বার মালে ভরিয়া আসে, জিনিসের দর নামিয়া যায় এবং খরিদ্দার পূর্বাপেক্ষাও কম হইয়া পড়ে; কারণ, কৃষিদ্রব্যের মন্দার ফলে তখন কৃষকের হাতেও টাকা থাকে না, মজুরী হ্রাস পাওয়ায় মজুরের হাতও প্রায় শূন্য হইয়া যায়। এই সময় জিনিসপত্র খুব সস্তা, কিন্তু কৃষক নিঃস্ব হইয়া বসিয়া আছে, মজুরেরও হাত খালি। ব্যবসাসঙ্কটে কৃষিদ্রব্যের দাম কমিবার কারণও ক্রেতার অভাব —কারখানায় এখন আর তেমন করিয়া কাঁচামাল সংগৃহীত হয় না; অন্য দিকে কাজ বন্ধে মজুরের রুজী বন্ধের উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে, তাই কৃষিদ্রব্যের

ক্রেতারও অভাব ঘটিয়াছে; এই দুই কারণে কৃষকের মাল আর তেমন কাটে না, সামান্য কিছু কাটিলেও দরে বড় সস্তা দিতে হয়—তাই কারখানার ব্যবসাসঙ্কট কৃষক পরিবারে অর্থসঙ্কট হইয়া দেখা দেয়; ফলে কৃষকের হাতও খালি হয়, তাহার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। অন্যদিকে কারখানার জিনিস এমন গুদামজাত হইয়া পচিতে থাকিলে মিলমালিক মজুরের অন্নচিন্তায় মিল চালাইতে পারে না—ক্রমে মিলও বন্ধ হয়, মজুর মাথায় হাত দিয়া পথে বসিয়া পড়ে; আর সমাজ ব্যবসাসঙ্কট ও অর্থসঙ্কটে সৃষ্ট গোলকধাঁধায় পড়িয়া ঘুরপাক খাইতে থাকে।

ব্যবসাসঙ্কটে মজুর এমন ভাবে বেকার হয় কেন? মিলের সওদা যদি বাজারে না বিকায় তাহা হইলেই মজুর বেকার হয়। কিন্তু মিলের সওদা বাজারে বিকায় না কেন? বিকায় না এই জন্য যে তখন মজুরের হাত খালি, কৃষকের হাতেও পয়সা নাই। মজুরের হাত এমন খালি হইল কেন? কৃষকের হাতেই বা পয়সা নাই কেন? ইহার কারণ ব্যবসাসঙ্কটের জন্য কৃষকের মাল আর মজুরের শ্রমকে কারখানা এখন কিনিতে পারে না। তাহা হইলে কারখানার মাল কি এতই বেশি হইয়া গিয়াছে যে ভোগ করিবার লোক মিলে না? লোক মিলিবে না কেন, লোক বহুতই মিলে; এখনকার দশগুণ বিশগুণ মালও মানুষের ভোগে লাগিতে পারে—পৃথিবীর বহুলোক এখনও নগ্ন, বহু লোক অভুক্ত—কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? আবার সেই প্রশ্নই আসিয়া যায়—মাল কিনিবার পয়সা কই? প্রয়োজন আমাদের কাহারও চেয়ে কম নয়, কিন্তু কিনিতে পারি না, কিনিবার ক্ষমতা নাই। পুঁজিপতি মজুরের দুই টাকার মধ্যে দেড় টাকাই নিজে মারিয়া দেয়, বাকী আট আনা মাত্র মজুরের হাতে আসে। এই দুই টাকার দুই টাকাই মজুর পাইলে সেও চারগুণ মাল খরিদ করিত, বেশি করিয়া ঘি-দুধ খাইত—তাহাতে মজুরের গোয়ালা লাল হইয়া যাইত, আর শেঠজীর মিলের স্তূপীকৃত কাপড় বা বস্তাবন্দী চিনি কিছু এমন অবিক্রীত পড়িয়া থাকিত না। মজুরকে ভরপেট খাইবার সংস্থান করিয়া দিলে কৃষকের আনাজ-তরকারীও বেশি বিকাইত, কসাই ভেড়া বকরি কাটিয়া কাটিয়া কুল পাইত না, মাছুয়াকে সাগরের নিকট নূতন নদীমুখের বন্দোবস্ত নিতে হইত, ফলওয়ালাকে আমরুদ, সপেদা, বাদাম, কমলালেবু প্রভৃতি নিত্য সরবরাহের জন্য পুরান বাগিচা সম্প্রসারিত না করিলে চলিত না। তখন মজুরের ঘরেও জুতামোজা ঢুকিত, নূতন রুইয়ের রাজাই-তোষক ব্যবহার হইত, কোট-কামিজ বা সাড়ী-জাম্পারের

ব্যবহারেও তাহারা পশ্চাৎপদ থাকিত না। এইভাবে কারখানার মালের চাহিদা চৌগুণা হইয়া যাইত, বর্তমানের বাড়তি মালও বিকাইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় না—হইবার নহে। তাই মজুরের ছয় ঘণ্টার শ্রম চুরির পরিণামে বাজারে মন্দা আসে, মজুর বেকার হয়, আর কৃষক অর্থসঙ্কটে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে।

১৯২৯ সন হইতে ৩৩ সন পর্যন্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া এই ভাবের এক মন্দা আসিয়াছিল। এই মন্দার কথা ভারতবর্ষের অক্ষরপরিচয়হীন গোঁয়ার কৃষকের কাছেও অজানা ছিল না, তবে তাহার দৃষ্টি এই বিষয়ে একান্ত ব্যক্তিগত ছিল, ব্যক্তিগত অসুবিধাবোধের বাহিরে সে ইহার আর কিছু জানিত না—মুদ্রার মূল্যমান কেন হ্রাস হইল বা রাষ্ট্র কেন কর্জ টাকার সুদ দিল না, এই সব বড় অর্থনৈতিক তত্ত্ব এই বাণিজ্যমন্দার সহিত সম্পর্কিত হইলেও বেচারা কৃষকের মাথায় এত সব ঢুকিত না। তাহার চিন্তাসম্পর্কের বাহিরেই বিশ্ব জুড়িয়া দুর্যোগের আকাশ কালো হইয়া উঠিল। আকস্মিক বাণিজ্যবিপর্যয়ের মুখে পুঁজিবাদী দেশগুলির পুঁজি তখন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তাই শিল্পোদ্যোগহীন দেশে টাকা খাটাইয়া বাজার তেজাইবার আর সম্ভাবনা রহিল না—এইভাবে মন্দা একেবারে দুর্নিবার দুর্নিরোধ্য হইয়া সমাজের বুকের উপর চাপিয়া বসিল, ইহার আচমকা আঘাতে সকল মানুষের আর্থিক সম্বন্ধ, আর্থিক জীবন আগাগোড়া বিপর্যস্ত হইয়া গেল। চা-বাগানের মালিকেরা বিক্রয়ের অভাবে তখন আর চায়ের পাতা তোলাইতেছে না। রবার বাগানের মাল না কাটায় রবারের ছেওয়া লাগান একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্য দিকে বুভুক্ষু মানুষের চোখের উপর দিয়া খাদ্যবস্তুর সাগর-নিমজ্জন শুরু হইয়াছে—পুঁজিপতিরা বার বার জাহাজ ভরিয়া ভরিয়া কমলালেবু আটলান্টিকের লোনাজলে ভাসাইয়া দিতেছে। ১৯৩১-এ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ৫০ লাখ শূকর কিনিয়া আনিয়া তাহা কতল করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু আশ্চর্য, দেশে এত লোক অভুক্ত থাকিতে এই মাংস কাহাকেও খাইতে দেওয়া হইল না। ডেনমার্কে তখন প্রতি সপ্তাহে ১৫০০ গরু মারিয়া স্তূপ স্তূপ মাংস মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা হইতেছে; আর্জেণ্টাইনে লক্ষ লক্ষ সুপুষ্ট ভেড়াকে নিরর্থক হত্যা করিয়া পচাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। মাংস বেচিয়া তখন আর পয়সা নাই, পশুকে কসাইখানায় আনিবার খরচও তাহাতে উঠে না—তাই পশুর জননাগার স্বাভাবিকভাবেই হননাগার হইয়া উঠে, তাহার চারণভূমি বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। এই সময় বাজার

ভেজাইয়া তোলা ছাড়া পুঁজিপতির মাথায় চিন্তা ছিল না; তাই এমন নির্মমভাবে সমাজের বিপুল শ্রমসৃষ্ট পণ্য তাহারা নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দিল—গুদামভর্তি গমে আগুন লাগান হইল, বাক্স বাক্স কফি সমুদ্রে তলাইয়া গেল—আর অনন্যোপায় মজুর উৎপাদন হ্রাসে বেকারীর চরম দুর্ভাগ্যকে বরণ না করিয়া পথ পাইল না; পৃথিবীর অপর মানুষও পুঁজিপতির লোভের কাছে তখন অবিক্রীত গরুভেড়ার মতই বলি হইল। পণ্যের এই বিপুল অপচয় যে শুধু বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যমন্দার সময়ই সম্ভব হয় তাহা নহে। কোন বিশেষ দেশের ধনিক গোষ্ঠীর লোভের ফলেও ইহা সংঘটিত হইতে পারে। আমেরিকায় দেখি সেদিনও কৃষি-বিভাগীয় কর্তা ব্রান্নান খাদ্যবস্তুর প্রাচুর্যে ভূত দেখার মত আঁৎকাইয়া উঠিয়াছেন।* মূল্য হ্রাসের আশঙ্কায় গম, ডিম, দুধ, মাখন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী গুদামে নিয়তই পচাইয়া ফেলা হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কৃষি-বিভাগ মনুষ্যখাদ্যের অনুপযোগী করিবার জন্য সেদিনও চার কোটি বুশেল আলুতে নীল রং মাখাইয়া দিয়াছে। † ইহার পর সোয়া ছয় কোটি ডলার দিয়া খরিদকরা পাঁচকোটি বুশেল আলু পচাইয়া দিবার জন্য আবার পরিকল্পনা হইয়াছে। ‡ মোটের উপর মূল্য হ্রাসের ভয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এখন চারশত কোটি টাকার খাদ্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দিবেন—অথচ পৃথিবীতে এখনও দেড়শত কোটি হতভাগ্য আছে যাহারা পেট পুরিয়া খাইতে পায় না।

(ঙ) **পুঁজিসঞ্চয়**—আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে বিক্ষিপ্ত বস্তুমাত্রেই কেন্দ্রিত ও সংগঠিত হইলে তাহার শক্তি বাড়িয়া যায়। এইরূপ আদিম সাম্যবাদী অবস্থা হইতে জনযুগীন সংগঠনগুলির মধ্যে শক্তির কেন্দ্রীকরণ অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়াছিল—তাই জনসংগঠনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আদিম সাম্যবাদী গোষ্ঠীগুলি তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে নাই।+ তাহার পর জনসংগঠন হইতে পিতৃসত্তার যুগে আসিয়া সমাজশক্তি আরও সংগঠিত, আরও অনেক বেশি কেন্দ্রিত ও দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়াছিল—সামন্ত যুগে সমাজ এই দিক্ দিয়া পূর্বেকার সকল সমাজ ব্যবস্থাকেই অতিক্রম করিয়া যায়, সামন্তবাদের সফলতার মূল কারণও ইহাই।

শক্তি বলিতে আমরা এতক্ষণ শুধুমাত্র সামরিক ও রাজনীতিক শক্তিকেই

* The Earth and Man, M. Ilyin, p. 8 (Indian Edition).

† The London Economist, Feb. 18.

‡ The New York Herald Tribune, February.

\+ মানবসমাজ (১ম খণ্ড)।

বুঝিয়াছি ; কিন্তু ইহা অতি সত্য কথা যে উৎপাদনযন্ত্র ও উৎপাদনশক্তিই সর্বাপেক্ষা বড় শক্তি—অর্থাৎ আর্থিক কারণই সামাজিক ব্যাপারে সকলের চেয়ে বলবান। কারণ, তাহাই সমাজের গতিপ্রগতি ও ঘটনাসমূহের মুখ্য ও প্রকৃত নির্ণায়ক। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ আর্থিক ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত কেন্দ্রীকরণ শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হয়। ব্যাপারবাদের প্রারম্ভ সময়ে আমরা দেখি সমস্ত বিক্রেয় পণ্যের একমাত্র উৎসস্থল ছিল বিচ্ছিন্ন গৃহশিল্প কিন্তু ব্যাপারবাদের অন্তিমপর্ব আসিবার পূর্বেই বাজারের চাহিদা মিটাইতে গিয়া ব্যাপারীকে কারখানা খুলিতে হয়—কারখানার মধ্য দিয়া কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, সাধারণ ও বিশেষ কারিগর সমস্তই এক জায়গায় জমা হইয়া যায়। এইভাবে উৎপাদনের কাজ কেন্দ্রিত হইবার পর তাহার বিতরণ বা বিক্রয়ব্যবস্থাও কিঞ্চিদধিক কেন্দ্রিত হইয়া পড়ে। ব্যাপারীরা তখন দূরদেশে কুটি স্থাপন করিয়া নিজ নিজ কর্মচারীর মারফৎ পণ্য বিক্রয়ে মনোযোগী হয়।*

এইভাবে উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদনযন্ত্রের কেন্দ্রীকরণের ফলে উৎপাদনের বেগ বৃদ্ধি পায় ; জিনিসপত্র তখন পূর্বাপেক্ষা সুলভ ও সস্তা হয় এবং গুণেও উৎকর্ষতা লাভ করে। কিন্তু এই কেন্দ্রিত উদ্যোগে যাহাদের কর্তৃত্ব ছিল না, তাহারা অর্থাৎ শিল্পীরা এইবার ব্যবসা গুটাইতে বাধ্য হইল—স্বতন্ত্র প্রতি-যোগিতায় হারিয়া প্রায় সকলেই তখন পুঁজিপতির কারখানায় গিয়া চাকরী লইল। এইভাবে সমাজের বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত উৎপাদনশক্তি কারখানার অভ্যন্তরে গিয়া কেন্দ্রিত হয়—ইহাতে পূর্বের ব্যৈক্তিক উৎপাদনপ্রথা নষ্ট হইয়া উৎপাদনের প্রকৃত সামাজিক রূপ বিকাশলাভ করে।

পুঁজিবাদী যুগে উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণ বা সমাজীকরণ আরম্ভ হইবার পর ইহার গতি আর প্রতিহত করা গেল না। কারখানাগুলির মধ্যে প্রথম হইতেই একটা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ছিল—এই দ্বন্দ্ব স্বল্পসাধন ও বহু সাধন অর্থাৎ ছোট ও বড় কারখানার দ্বন্দ্ব। ইহাদের মধ্যে নিজ নিজ পণ্য যে যত ত্বরায়, সস্তায় ও অধিকমাত্রায় বিক্রয় করিতে পারিবে বাজার তাহারই হাতের মুঠায় চলিয়া আসিবে। এই প্রতিযোগিতায় ছোট পুঁজিপতি বা পুঁজির রাজ্যের চুণোপুটিরা সহজেই কাবু হইয়া পড়িল আর পুঁজির রাজ্যের রাঘব বোয়ালগণ সেই ছোট মাছগুলিকে উদরস্থ না করিয়া স্বস্তি পাইল না।

* এখানে বিশেষ করিয়া ইংরেজ, ওলন্দাজ, দীনেমার, পর্তুগীজ ও ফরাসী বণিক এবং তাহাদের ভারত. চীন, আমেরিকা ও আফ্রিকা কুঠিগুলির কথা বলা হইয়াছে।

যন্ত্রের সঙ্গে বাষ্প ও বিদ্যুতের শক্তি যুক্ত হইবার পর উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণ আরও বেশি হইল—কারণ তখন হইতে প্রায় পাঁচ সাত বছর পর পরই যন্ত্রের নূতন সংশোধন হইতে লাগিল—এই সব উন্নততর যন্ত্র আদিম যুগের হাতেচলা যন্ত্রের মত আর স্বল্পসাধন রহিল না—আধুনিক যন্ত্রে অল্প পরিশ্রমে কাজ বেশি হইতে লাগিল, তাহাতে পণ্যও সস্তা হইয়া গেল। যে পুঁজিপতি উন্নত ধরণের যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিল না তাহার পণ্যের দাম অপেক্ষাকৃত বেশি হইল; এই অবস্থায় প্রতিযোগিতার বাজারে সে আর টিকিতে পারিল না, তাহার ব্যবসা মাটি হইয়া লাটে উঠিল। বড় পুঁজিপতি তখন খুদে পুঁজিপতির কারখানা ও উৎপাদনের মালমশলা সস্তা দরে কিনিয়া লইল—বরাত ভাল হইলে বড়র অধীনে এই সময় ছোট পুঁজিপতির এক আধটা চাকুরী জুটিয়া যায় ত ভালই—তাহা হউক, আর না হউক, বড় পুঁজিপতি ছোট পুঁজিপতির কারখানা কিনিয়া তাহার ভোল ফিরাইয়া দিল—কারখানায় নূতনতর যন্ত্রের আমদানী হইল, তাহার উৎপাদন বাড়িল, পণ্যও সস্তা হইল—এইভাবে ছোট মাছ বড় মাছের পেটে গিয়া ঢুকিল এবং উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণ বাড়িয়া গেল।

যন্ত্রের উন্নতি ছাড়াও ছোট পুঁজিপতির সম্মুখে আর এক আকস্মিক আপদ আসিয়া খাড়া হয়। এই আপদ অর্থসঙ্কট বা বাজারমন্দা—বাজারমন্দার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এই সময় বাজার মালে ভরিয়া যায়, মজুর বেকার হয় এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাহাতে ব্যাপারীর মুনাফা বন্ধ হইলেও তাহার যন্ত্রপাতি বা কারখানার মেরামত হেফাজত একেবারে বন্ধ হইয়া যায় না। ইহার উপর পারিবারিক খাওয়াপরার খরচ এবং ব্যাঙ্কের কর্জ টাকার ক্রমবর্ধমান সুদও আছে। এই অবস্থায় বেচারা ছোট পুঁজিপতির গণেশ উল্টাইয়া ব্যবসায়ে লালবাতি জ্বালান ছাড়া পথ থাকে না—অন্য পথ যাহা থাকে তাহা বড় পুঁজিপতির জঠরগত হইয়া আত্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেওয়া। এইভাবে আট দশ বছরব্যাপী বাণিজ্যমন্দার সময় বহু ছোট মাছ, বড় মাছের পেটে চলিয়া যায়—এবং সমাজের বিস্তৃত বিক্ষিপ্ত পুঁজি কেন্দ্রাভিগ হইয়া আরও ক্ষুদ্রতর বৃত্তে সংহত হয়।

কলু ভাইদের দৃষ্টান্ত হইতে পুঁজি জমাইবার একটি ভারতীয় উদাহরণ আমরা দেখিয়াছি। তাহাতে মিতব্যয়িতা ও ব্যাপারবুদ্ধিকে পুঁজিসঞ্চয়ের একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু য়ুরোপের পুঁজিবাদী দেশে, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডে পুঁজি সংগ্রহের অন্য উপায়ও দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অষ্টাদশ শতাব্দীর কীর্তিকলাপের দিকেও লক্ষ্য করা চলে। কোম্পানী তখন টাকা লইয়া সৈন্য ভাড়া দিত এবং ভাড়া বাবদ মোটা টাকা আদায় করিত। পরে নিজের সৈনিকশক্তি সম্পর্কে সচেতন হইয়া কোম্পানী স্বার্থের খাতিরে দাঙ্গালড়াইও আরম্ভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে ক্লাইভ, ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও কর্ণওয়ালিশের শাসনের কথা এখানে স্মরণ করুন। তখন কর্জ টাকা ও তাহার সুদ কিংবা ব্যবসায় ও কারখানা এই সব ছাড়াও পুঁজি সংগ্রহের অন্য সোজা পথ ছিল। ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন ভারতবর্ষে লুঠের বাজার তখন কী রকম গরম হইয়া উঠিয়াছিল।* অযোধ্যার বেগমের খাজনা লুট, চেৎ সিং-এর রাণীর সর্বস্বাপহরণ, এই সব কোম্পানীর নিত্যকার কাজ ছিল। তাহা ছাড়া বড় বড় নবাব রাজারাজড়ার নিকট হইতে ওগুলের অন্য পথও তখন বন্ধ ছিল না। এই সোনাচাঁদি কতটা কোম্পানীর নিকট গিয়াছে আর কতটা কর্মচারীরা মারিয়া দিয়াছে তাহা বলা কঠিন; কিন্তু এই ডাকাতির টাকা উভয় সূত্রেই যে ইংলণ্ডের খাস পুঁজিতে সংলগ্ন হইয়াছে তাহা সত্য।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধেও দেখি ধনদোহনের বেলায় এই পূর্ব-প্রচলিত রীতিরই অনুষ্ঠান চলিতেছে। কোম্পানীর সোনা লুঠ তখন কিছুটা যদি বন্ধ হইয়া থাকে তাহা এইজন্য যে ইংলণ্ডীয় পুঁজিপতি তখন শাসক হইয়াছে —তাই সোজাসুজি লুঠতরাজের জায়গায় লুঠের নানারকম কৌশলী পন্থা আবিষ্কার করিতে তাহার অসুবিধা হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সম্পত্তি বৃদ্ধির নিম্নোক্ত হার হইতে ধনদোহনের পরিমাণ বোঝা যাইবে :—

(খ্রীষ্টীয় সন)	(কোটি পাউণ্ড)
১৮১৪	১৩০
১৮৬৫	৬,১০০
১৮৭৫	৮,৪০০

পুঁজিবাদের সফলতার মূল কারণ হইল উৎপাদনের অর্থাৎ তাহার যন্ত্রের ও শক্তির বিরাট কেন্দ্রীকরণ। প্রথম দিকে সামাজিক উৎপাদন এতখানি কেন্দ্রিত বা সংগঠিত ছিল না, ব্যৈক্তিক উদ্যোগেই তখনকার সমস্ত উৎপাদন নিষ্পন্ন হইয়া যাইত; পণ্যবিক্রয়ের জন্য তখন শুধুমাত্র ছোট ছোট দোকানদার ছিল, এই সব দোকানী আর কারিগর ছাড়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে আর কেহই

* Karl Marx—The Genesis of an Industrial Capitalist in Capital Vol 1.

ছিল না। কিন্তু এই ছোট কোম্পানীর দোকানদারীই সংগঠিত হইতে হইতে 'জগৎশেঠের' সৃষ্টি হইল। পৃথিবী জুড়িয়া দেশে দেশে তাহার বাণিজ্য-কুঠি বসিল। পণ্য বোঝাই করিয়া ব্যাপারীর নিজস্ব জাহাজ এখন সমুদ্রের দূরকূলে পাড়ি দিতেছে, পুরাতন গৃহশিল্পের স্থানে ব্যাপারীর নিজের কারখানা বসিয়াছে। যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব কারখানা ক্রমেই বড় হইতেছে, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন উৎপাদন উদ্যোগও এক সংগঠন এক উদ্যোগে সংবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে; আবার যন্ত্রের নূতন সংশোধনের সঙ্গে মানবশ্রমের চাহিদা কমিতেছে, কারখানার বিভিন্ন বিভাগেও এই সময়ে লোক তাড়াইয়া খরচ কমান সম্ভব হয়। অন্যদিকে পণ্যবিক্রয়ের ক্ষেত্রে ছোট দোকানীর আর চিহ্ন নাই, তাহার স্থানে মালিক নিজেই স্টোর খুলিয়াছে, খুচরা বিক্রীরও দোকান বসাইয়াছে; সেই দোকান হইতে নূতন দোকানের শাখা-প্রশাখা বাহির হইতেছে, কারণ এইভাবে দোকানের জাল বিছাইতে পারিলেই বিক্রির বাজারে বাজীমাৎ। এইভাবে বড় বড় কোম্পানী ও তাহাদের অপার পুঁজি একত্রিত হইয়া ট্রাস্ট গঠিত হইতেছে, ইহারা উৎপাদন ও বিক্রয় উভয় দিকেই সমান উদ্যোগী। এই দ্বিমুখী উদ্যোগ যাহাতে চিরকার্যক্ষম থাকে এবং ট্রাস্ট যাহাতে প্রতিযোগিতায় ঘাতসহ হয়, এই জন্য বিপণিমণ্ডল ও ফ্যাক্টরীগুলিকে তাহারা ব্যাঙ্ক ও ট্রেজারীর ছত্রছায়ায় সংগঠিত করিতেছে। এইভাবে—

৩। উৎপাদনের সাধনসমূহ

যন্ত্রের বিকাশ—পণ্যপ্রস্তুতের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতিতে গত আড়াই হাজার বৎসরে যে বিকাশ ও পরিবর্তন হইয়াছে তাহার কোন তুলনা নাই। মানুষ হাতিয়ারধারী সৃষ্টিকারী জীব—কাঠপাথরের যন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার সমাজে প্রবেশ করিবার সময় তাহার লৌহাস্ত্র গুণে উন্নত এবং সংখ্যায় বহুল হইয়াছে—কিন্তু আধুনিক যুগের সঙ্গে তাহার তুলনা চলে না। বুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে বা এরিষ্টটলের সময় গ্রীসে কি সব হাতিয়ার ব্যবহৃত হইত এই ক্ষেত্রে আমরা তাহার সন্ধান লইতে পারি—

তীর	দাঁড়িপাল্লা	কোদাল
ধনুক	একপাল্লা দাঁড়ি	কুড়াল
শিক্ষা	সেঁউতি	করাত
ভারবাঁক	সাঁড়াশী	বাইস
চিমটা	খুঁটি বা খোঁটা	নৌকার হাল
বড় হাতুড়ি	গরুরগাড়ী	ধাতুর চাকা
নেহাই	দড়ির গুলতি	খুরপি
হাফর	কপিকল	কুমারের চাক

—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই পুরাতন যন্ত্রসূচীর সঙ্গে নূতন দিনের যন্ত্রপাতির তালিকা মিলাইয়া দেখিলে আমরা আশ্চর্য হইয়া যাইব। বিগত মহাযুদ্ধে নাকি ছোট বড় চল্লিশ হাজার অপেক্ষাও অধিক সরঞ্জামের প্রয়োজন হইয়াছিল—এই চল্লিশ হাজার হাতিয়ার ও যন্ত্রাংশের সহায়তায় হাজার রকমের যুদ্ধাস্ত্র ও যানবাহন নির্মিত হয়। আজ এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতিয়ারের গণনা করিতে গেলে তাহার কোন সীমা পরিসীমা পাওয়া যাইবে না।

যন্ত্রোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি কারখানায় এখন নূতন উন্নত যন্ত্র প্রবেশ লাভ করিতেছে এবং শিল্পীর কাজের বহুলাংশ শুধু যন্ত্রসহায়তায় নিষ্পন্ন হইতেছে। ফোর্ডের ডেট্রয়স্থিত কারখানায় মানবশ্রম বাদ দিয়া কেবল যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনকর্ম যথাসম্ভব চালাইয়া নিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

এই যন্ত্রোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কারখানাগুলিতে যে অভূতপূর্ব শ্রমবিভাগ সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। একটি অতি সাধারণ ধাতু কারখানার হিসাব লইলেও দেখিব যে সেখানে প্রায় কুড়িটি মূল বিভাগ আছে—ইহার উপবিভাগগুলির গণনা করিলে এই সংখ্যা সহজেই শতের

কাছাকাছি হইয়া পড়িবে। নিম্নে আমারা মূল বিভাগগুলিরই শুধুমাত্র উল্লেখ করিতেছি—

যন্ত্রবিভাগ	লৌহ ঢালাই বিভাগ
বিদ্যুৎ বিভাগ	চুল্লী বিভাগ
ইস্পাত ঢালাই বিভাগ	ধাতুবস্তু ঢালাইবার বিভাগ
লৌহকার বিভাগ	লৌহের গঠন বিভাগ
বয়লার বিভাগ	ধাতু তাতাইবার বিভাগ
অধাতু ঢালাই বিভাগ	মার্টিন হাপর চুল্লী বিভাগ
কাষ্ঠ বিভাগ	সহায়ক বিভাগ
কারখানা নির্মাণ	রেলওয়ে বিভাগ

—এবং এইরূপ অন্যান্য বিভাগ।

এই বিভিন্ন বিভাগে কত বিভিন্ন রকমের শিল্পী কাজ করিতে পারে আমরা তাহার সামান্য উল্লেখ করিতেছি।

তালামিস্ত্রী	ঢালাই চুল্লীর কর্মী
চাঁছাইকর	জোড়া দিবার কারিকর
চাপযন্ত্রের কারিকর	ছুতার মিস্ত্রী
রঁাদা বিভাগের কর্মী	নল মিস্ত্রী
ছেনির কাজ করিবার শিল্পী	চুল্লী ফোরম্যান
কুঁড়িবার কর্মী	রোলার বিভাগের কর্মী
সমন্বয়কারী	মিস্ত্রী
স্টাম্প কর্মী	ছেদন বিভাগের কর্মী
সংযোজনকারী	ভাণ্ড নির্মিতা
লৌহকর	ঢালাইকার
হাতুড়ী পিটাইবার কর্মী	কাগজ সাঁটা বিভাগের কর্মী
প্রেস কর্মী	রঙের কারিকর
রাজমিস্ত্রী	টিনমিস্ত্রী
চুল্লীর অগ্নি প্রজ্বালক	তারমিস্ত্রী

—এবং অন্যান্য সাধারণ কর্মী।

উপরের তালিকা ভুক্ত কর্মচারীদের উপর মধ্যম শ্রেণীর অন্যান্য যন্ত্রচতুর ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞেরা মাসিক বেতনে কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উপর আরও উচ্চ উচ্চ কর্মচারী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, ডাইরেক্টর প্রভৃতি

পরিদর্শকেরাও মাসিক বেতনভুক্ত ভাবেই কারখানার তদারক করেন। ইহারও উপর থাকেন খোদ পুঁজিপতি যা যিনি আসল মালিক, যাঁহাকে মিথ্যা করিয়া কারখানার মূল সঞ্চালক বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কারখানার নিয়োজিত পুঁজি আর তাহার মুনাফা এই দুইটি বিশেষ জিনিস ছাড়া উৎপাদনের আর কোন বস্তুর সঙ্গেই তাঁহার সম্পর্ক নাই। এই মুনাফা ও পুঁজির প্রভাব মজুর কিসানের উপর গিয়া কিভাবে প্রতিফলিত হয় তাহা আমরা পূর্বে কিছু কিছু অলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

পুঁজিপতি তাহার অধীন কর্মচারীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে; মজুরী প্রভৃতির তারতম্য সৃষ্টি করিয়া তাহাদের স্বার্থকে অভিন্ন হইতে দেয় নাই। কারখানার চাবিওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া মেসিনম্যান, খালাসী প্রভৃতি কর্মচারীরা একই শ্রেণীর লোক; সেখানকার ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি উচ্চ কর্মচারীগণ অপর স্বতন্ত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আর কারখানার বিধাতা পুঁজিপতি, তিনি সবাকার উর্ধ্বে, অর্থাৎ ইহাদের কোন শ্রেণীতেই পড়েন না। এই ভাবে কারখানার কর্মচারীরা ভিন্ন-স্বার্থ-সম্পন্ন বলিয়া এক শ্রেণীতে মিলিত হইতে পারে না। কারখানায় পুঁজিপতির যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ উৎপাদনের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে—এই যন্ত্রের সাদৃশ্যে মানুষও সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতায় ভিন্ন রূপ কাজ করিয়া যায়। পুঁজিপতি যেমন যন্ত্রের অনুকরণে কর্মচারীদিগকে দিয়া পৃথক পৃথক কাজ করায়; সেইরূপ কর্মচারীর কিন্তু পুঁজিপতিকে দিয়া কোন কাজ করাইবার অধিকার থাকে না —ইহার কারণ, কারখানার কর্মবণ্টনের কর্তা পুঁজিপতি, অর্থাৎ তিনি উৎপাদনের মালিক; আর কর্মচারী সেই মালিক বা পুঁজিস্বামীর অনুগত সেবক, অর্থাৎ তাহার উৎপাদনসাধনের অংশ বা যন্ত্রাংশ।

পুঁজিবাদীযুগে উৎপাদনসাধন বা উৎপাদনসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা পূর্বের বর্ণনা হইতে বোঝা গেল। মানবশ্রমকে অধিকতর কার্যকরী করিতে হইলে উৎপাদনের এই নূতন সাধন বা নূতন যন্ত্রপাতির উপযোগ করিতে হয়। এইভাবে উন্নততর যন্ত্রের সহায়তার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইতে হইলে উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগকেও সেই অনুপাতে বাড়াইয়া নিতে হয়। শুধু একজন কামার একটিমাত্র হাতিয়ার লইয়া একটি সামান্য সুঁচ তৈয়ার করিলেও তাহার এত শ্রম ব্যয়িত হইবে যে সুঁচের দাম বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু আজকাল সুঁচ বা আলপিন এত সস্তায় পাইবার কারণ এই যে লোহাপিতলের পাত কাটা হইতে

তাহা পাক খাইয়া সূঁচ বাহির হইয়া আসা পর্যন্ত শতাধিক যন্ত্রের সহায়তা পায়। এইভাবে উৎপাদনযন্ত্রের উন্নতি আজ এক অবিশ্রান্ত পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এমন কি প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রের ও যন্ত্রাংশের সংখ্যা বাড়িতেছে—দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, এক এরোপ্লেনের উদ্ভাবনের সঙ্গেই হাজারের অধিক ক্ষুদ্র যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে, রেডিয়োর সঙ্গেও শতাধিক নূতন যন্ত্র ও হাতিয়ার বাড়িয়া গিয়াছে, এই যন্ত্রসংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎপাদনও বাড়িয়াছে, কিন্তু পূর্বেকার মিস্ত্রী নিজ হাতে সূঁচ তৈয়ার করিবার সময় বস্তু বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিত আজিকার কারিগর তাহা করে না। ইহার কারণ এই যে সূঁচ তৈয়ারীর সময় সে এক সেকেণ্ডেও সূঁচের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারে না। যন্ত্র কিভাবে ধাতু কাটিয়া পাকাইয়া সূঁচ বানাইয়া দিল এই বিষয়ে সে অনভিজ্ঞই থাকে। এইভাবে পুঁজিপতি যন্ত্রচালক শ্রমিককে এক অদ্ভুত বুদ্ধিকৃতিহীন সৃষ্টির অধিকারী করিয়া জীবন্ত যন্ত্রে পরিণত করিয়া ফেলিতেছে।

৪। সাম্রাজ্যবাদ ও ইজারাদরী

পুঁজির রাজ্যে কি ভাবে দুর্দান্ত মৎস্যন্যায় চলিয়া আসিতেছে ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি; প্রতিযোগিতায় হারিয়া গিয়া ছোট পুঁজির মালিক সর্বদাই বড় মালিকের পেটে চলিয়া যাইতেছে—বিশেষ করিয়া মন্দার সময় বেচারা ক্ষুদে মালিকদের পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় থাকে না; কিন্তু পুঁজির রাজ্যের যাহারা হাঙ্গর-কুমীর, তাহাদের পঞ্চ-অঙ্গুলি তখন ঘিয়ে ভরিয়া উঠে। এই ভাবে ছোট মালিককে গিলিয়া গিলিয়া বড় মালিক তখন পুঁজির বাজারে একাধিপতি হইয়া পড়ে—সারা দুনিয়ার কাঁচামাল এবং সমস্ত বাজার তখন বড় পুঁজিবাদীর হাতের মুঠায় চলিয়া আসে; পুঁজির রাজ্যে ইহাই হইল ইজারাদারী বা একচেটিয়া অধিকার—এই একাধিপত্যের আর এক নাম হইতেছে সাম্রাজ্যবাদ।

সাম্রাজ্যবাদের লক্ষণ নির্ণয় করার চেয়ে উহার উৎপত্তি ও বিকাশের দিকে লক্ষ্য করিলেই আমাদের বক্তব্য বেশি পরিষ্কার হইবে। পুঁজিবাদ আরম্ভ হইবার পর বাজার ও কাঁচামাল লইয়া যে প্রতিযোগিতা ছিল তাহার রূপ ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত এবং অনেকটা স্বাধীন। অর্থাৎ বাজার খোলা আছে, ইচ্ছা হয় তুমি বেচ; কাঁচা মাল মজুত আছে, ইচ্ছা হয় তুমি কেন—তোমার কেনা বেচায় কেহ আপত্তি করিবে না। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ ইংলণ্ড তখন এই মুক্ত

ব্যাপারনীতিই মানিয়া চলিত। তাই বলিয়া নিজেদের অধীন উপনিবেশগুলি হইতে ইংলণ্ড যে অধিকতর·সুবিধা লইত না তাহা নহে। (১) ইহা হইলেও ১৮৬০-৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত পুঁজিবাদী ব্যাপার বাণিজ্যে মুক্ত প্রতিযোগিতারই সময় ছিল; ১৮৭০এর সমসাময়িক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া খোলা বাজারের স্বাধীনতা ক্রমে ক্রমেই রুদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে—এই সময়টাকে আমরা ইজারাদারী বা পুঁজির বাজারে একচেটিয়া মালিকানার প্রথম পাদ বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। (২) ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আসিয়া পৌঁছিতে পৌঁছিতেই এক বিষম বাণিজ্যমন্দা শুরু হয়—ইহার কারণ, অধিক কারখানা, অধিক উৎপাদন, নূতন বাজারের অভাব ইত্যাদি—এই সকল কারণ সম্পর্কে আমরা পূর্বে বাণিজ্যমন্দার আলোচনার সময় আলোচনা করিয়াছি। এই বাণিজ্যমন্দার ছোট পুঁজিপতিরা স্বভাবতই দেউলিয়া হইয়া গেল এবং বড় পুঁজিপতি উহাদের সর্বস্ব গ্রাস করিয়া আরো বড় হইল—এই সুযোগে তাহার পুঁজি বাড়িল কারখানা বাড়িল এবং বাজারে অনেকটা একাধিপত্য আসিয়া গেল। এইভাবে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী স্তরটিকে আমরা ইজারাদারীর দ্বিতীয় পাদ বলিয়া বলিতে পারি। (৩) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আসিয়া বাজার খুব তেজাইয়া উঠিল, পুঁজিপতিরা দুই হাতে মুনাফা লুটিতে লাগিল; কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে পা দিতেই আবার অবস্থার মোড ঘুরিয়া গেল, ১৯০০-০৩ খ্রীষ্টাব্দে আর এক ভয়ঙ্কর বাণিজ্যমন্দা আসিয়া গেল; এইবারও ছোট পুঁজির মালিক, মাঝারি পুঁজির মালিক মরিল, তাহার কারখানার ঠাটপাট উল্টাইয়া গেল এবং ছোট মাছ বড় মাছের পেটে গেল—আর বড় মাছ রাঘব বোয়ালেরা ছোট মাছের সকল কলকারখানা বাজার গিলিয়া পুঁজিজগতের ছত্রপতি সাজিয়া বসিল। এইবার বাণিজ্যে ব্যবসায়ে মুক্ত প্রতিযোগিতা সত্যই বন্ধ হইয়া গেল, পৃথিবীর বেশির ভাগ বাজার ও কাঁচামাল ইজারাদারীর আওতায় আসিয়া গেল। এই তৃতীয় পাদে পৌঁছিয়াই পুঁজিবাদ তাহার বিকাশের সর্বোচ্চ বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের রূপ পরিগ্রহ করিল—অর্থাৎ বামনের ত্রিপাদ ভূমি গ্রাসের পর যেমন কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না, পুঁজিবাদেরও এই তিন পাদে বিকাশের পর নূতন বাজার বা নূতন ভূমি আর অবশিষ্ট রইল না।

(১) **মুক্ত প্রতিযোগিতা হইতে ইজারাদারী**—সাম্রাজ্যবাদের প্রধান বিশেষত্বই হইল ইজারাদারী অর্থাৎ ব্যাপার বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার। কোন অঞ্চলের সমস্ত কাঁচামাল ও সমগ্র বাজার একক ভাবে

নিজের দখলে রাখাই সাম্রাজ্যবাদের কাজ। সাম্রাজ্যবাদকে আমরা ইজারাদারীয় পুঁজিবাদ বা একচেটিয়া বাণিজ্যিক মালিকানা বলিয়া বলিতে পারি। এই একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার যে পুঁজিবাদীরা জানিয়া শুনিয়া মতলব করিয়া করিয়াছিল তাহা নহে—পুঁজিবাদ যেমন সমাজবিকাশের একটি বিশেষ স্তরে আপনিই আসিয়া গিয়াছিল ইহাও তেমনি। পুঁজি যতই একত্র হইয়াছে, যতই ইহা এক জায়গায় জমা হইয়াছে, ততই বাজারও কম লোকের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে এবং পুঁজির একত্রীকরণ ও বাজারের একচেটিয়া মালিকানা, এই সকল কারণ মিলিয়া স্বাভাবিক ভাবেই ইজারাদারীর সৃষ্টি হইয়াছে।

একটি উদাহরণ লইলে এই বিষয়টি আমরা আরও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিব—

১৮৮২ সনে জার্মানীতে প্রতি হাজারে তিনটি মাত্র বড় কোম্পানী ছিল, ১৮৯৫তে পৌঁছিয়া সেখানে বড় কোম্পানী প্রতি হাজারে ছয়টি হয়; এবং ১৯০৭তে বড় কোম্পানী হয় হাজার করা নয়টি, আর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আঠারটি। এই কারখানাগুলিতে মজুরের সংখ্যা ছিল—

সন	বড় কোম্পানী (প্রতি হাজারে)	মজুর সংখ্যা (দেশের মজুর সংখ্যার শতকরা অনুপাতে)
১৮৮২	৩	২২
১৮৯৫	৬	৩৪
১৯০৭	৯	৪৮
১৯২৫	১৮	৫৫

উপরে তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে ১৯২৫-এ জর্মনীতে সমুদয় মজুর সংখ্যার অর্দ্ধেক হইতেও বেশী অর্থাৎ শতকরা ৫৫ ভাগই হাজারকরা মাত্র ১৮টি বড় কারখানার কাজ করিতেছে। ১৯২৫-এর গণনা হইতে আরও দেখা যায় যন্ত্রের চালকশক্তির অর্থাৎ তেল, বাষ্প এবং বিদ্যুতের শতকরা ৮০ ভাগ শতকরা ২ ভাগ কারখানার ব্যবহারে লাগিতেছে এবং কারখানার বাকী শতকরা ৯৮ ভাগ কারখানা মাত্র শতকরা ২০ ভাগ চালকশক্তি নিয়োগ করিতে পারিতেছে।

ইংলণ্ডেও দেখি ১৮৮৪ হইতে ১৯১১ সনের মধ্যে কাপড়ের কারবার দ্বিগুণ

হইতেও বেশি হইয়া গিয়াছে ; মিলগুলিতে এই সময়ের মধ্যে তাঁতের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে ২৫ হাজার হইতে ৬০ হাজার হইয়া যায়।

আমেরিকায়ও ছোট পুঁজিপতির সংখ্যা হ্রাস পাইয়া বড় পুঁজিপতি কি হারে বাড়িয়াছে একটা হিসাব লইলেই বুঝিতে পারিব। ১৯১৪ সনের হিসাবে দেখা যায় আমেরিকায় মোট মজুর সংখ্যার শতকরা ৭০'৬ ভাগই বড় কারখানায় কাজ করে এবং শতকরা বাকী ২৯'৪ ভাগ মাত্র শ্রমিক হইতেছে ছোট কারখানার শ্রমিক। নিচে ১০ লক্ষ ডলারের অধিক অর্থাৎ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার অধিক পণ্য উৎপাদনকারী কারখানাগুলির পণ্য উৎপাদনের এবং শ্রমিক নিয়োগের হিসাব দিলাম—

সন	শ্রমিক নিয়োগ (শতকরা অনুপাতে)	পণ্য উৎপাদন (শতকরা অনুপাতে)
১৯০৪	২৫'৬	৩৮
১৯২১	৪৮'৪	৫৯

এক একবার বাণিজ্যমন্দার ধাক্কা আসিয়া ছোট পুঁজিপতিকে কাত করিয়া ফেলে আর বড় পুঁজিপতি এই সুযোগে আরও বড় হয়, আরও শক্তিশালী হয়, এই সব কথা আমরা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। বড় পুঁজিপতি যে ব্যবসায়িক দুর্দৈবগুলি সহজেই সামলাইয়া লইতে পারে ইহার অন্য কারণ হইল, বড় পুঁজিপতি তাহার সমগ্র কারবার একটা নির্দিষ্ট বাণিজ্যনীতি বা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কোন সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ক্রমের মধ্যে আনিয়া ফেলিতে পারে এবং নিজেদের বিভিন্ন প্রতিযোগীর মধ্যে কাঁচামাল ও বাজার সম্পর্কে আপদুদ্ধারের উপযোগী কোন একটা আপোষরফা করিয়া লওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব হয় না। অবশ্য বাজার ও কাঁচামালের ব্যাপারে এই যে রফা বা 'মিলিয়া খাওয়া' নীতি, ইহাতেও ইজারাদারীরাই পাকা হয়, আরো পাকা হয়।

এখানে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পুঁজিবাদের মূল হইল ব্যক্তিস্বার্থ, ইহা কাহারও অজানা নাই ; কিন্তু পুঁজিবাদের কাজকর্ম অর্থাৎ বাহ্যিক ঢঙটি এমনই যে, তাহাতে ব্যক্তি পিছে লুকাইয়া থাকে, সম্মুখে থাকে বহু ব্যক্তির মিলিত সংগঠন। এক সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সবই এক এক ঘরের পৃথক পৃথক ছিল, শুধু ভারতবর্ষেই যে এইরূপ তাহা নহে, ইয়োরোপেও ইহাই ছিল। পরে কিন্তু ব্যাপারীরা বুঝিল যে এইরূপ পৃথক পৃথক ব্যবসায় ছোটখাট উদ্যোগে করা গেলেও বড় উদ্যোগের সংগঠনেই

লাভও বড়, আর তাহাতে মারা পড়িবার সম্ভাবনাও কম। পুঁজিবাদীর হাতে শাসনক্ষমতা আসিবার পর তাহারা পারস্পরিক নিরাপত্তার আরও নিশ্চিততর উপায় বাহির করিল। জয়েণ্ট স্টক কোম্পানী বা 'মিলিত ব্যাপার মণ্ডল' এইরূপ পারস্পরিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়- ইহাতে সুবিধা এই যে কোম্পানী দেউলিয়া হইলে, শুধু কোম্পানীর মাল বেসাত দিয়াই পাওনা শোধ করিতে হইবে—কিন্তু একক ব্যবসায়ে মহাজনের দেনার দায়ে তখন ব্যবসায়ীর নিজের ঘটিবাটি লইয়াও টান পড়িতে পারে। ধরুন, আপনার দশ হাজার টাকা আছে, তাহা আপনি এক হাজার করিয়া দশটি কোম্পানীতে লগ্নি করিলেন—এখন যদি কোন কোম্পানী দেউলিয়া হয়, তবে সেই কোম্পানীতে লগ্ন এক হাজার টাকা আপনার মারা পড়িবে; কিন্তু বাকী নয় হাজার টাকা আপনার সুরক্ষিত রহিল—কোন একক ব্যবসায়ে ন্যস্ত করিলে এই নিরাপত্তাটুকু আপনার থাকিত না। পুঁজি খাটাইবার এই ব্যবস্থাটি প্রকৃতই এত আকর্ষক যে পুঁজিপতিরা এখন সর্বত্রই যৌথ ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে।

আচ্ছা মনে করুন, আপনাদের শেঠ রামকুমার একটি সিমেণ্টের কারখানা খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু শেঠজী একা সম্পূর্ণ খরচ দিতে পারিতেছেন না কিংবা সম্পূর্ণ খরচ নিজে দেওয়া পছন্দ করিতেছেন না। তিনি অন্যান্যকে কারখানার ভবিষ্যৎ এবং তাহার লাভ সম্পর্কে নিশ্চিত করিয়া তাহাদিগকেও অংশীদার করিতেছেন। শেঠ রামকুমার কারখানায় নিজে দিতে চাহিতেছেন পাঁচ লক্ষ টাকা আর পাঁচ লক্ষ দশ টাকা মূল্যের পঞ্চাশ হাজার শেয়ারে ভাগ করিয়া দিতেছেন। অবশ্য দশ টাকা শেয়ারের ক্রেতা যে শেয়ার কিনিবার সময় এক সঙ্গে সাকুল্য দশ টাকা দিয়া দিবেন এমন কোন কথা নাই। এই শেয়ার বাঁটাবাঁটির উদ্দেশ্যটুকু এই মাত্র, প্রত্যেক শেয়ারের ক্রেতাই কারখানার লক্ষ অংশের এক অংশের মালিক হইল। এই শেয়ারগুলির মধ্যে কিছু শেয়ার আবার বিশেষ শেয়ার আর কিছু সাধারণ শেয়ার—বিশেষ শেয়ারের মালিক ন্যস্ত টাকার অনুপাতে একটা শতকরা নির্দিষ্ট মুনাফা পান—আর সাধারণ শেয়ারের কর্তা কোম্পানীর মোট লাভের অনুযায়ী তাঁহার অংশমত মুনাফা পান। সাধারণ শেয়ারওয়ালার মুনাফার দিক হইতে ক্ষতির যেমন সম্ভাবনা আছে, তেমন লাভের সম্ভাবনাও তাহার অধিক। শেয়ারওয়ালারা কোম্পানীর নীতি নির্ধারণ করেন এবং প্রধান কর্মাধ্যক্ষ বা ডাইরেক্টর নির্বাচনও তাঁহারাই

করেন। কিন্তু এখানে মজা হইল, প্রত্যেক শেয়ারে এক এক ভোট, যাঁহার শেয়ার বেশি তাঁহার ভোটও বেশি ; শেঠ রামকুমার যদি কোম্পানীকে হাতের মুঠায় রাখিতে চান তবে শতকরা ৫২টি শেয়ার নিজেই রাখিবেন—অথবা অন্য বিশ্বাসী জনকে লইয়া অর্ধেকের বেশি শেয়ার রাখিলেই তিনি নিরাপদ হইলেন ; এই ব্যবস্থায় নিজেই ডাইরেক্টর হইয়া তিনি স্বয়ং কোম্পানীর পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং লভ্যাংশ ছাড়া ডাইরেক্টরের মোটা বেতন, নানারূপ ভাতা, সফর খরচ প্রভৃতি পাইবেন।

এই সব কোম্পানীর সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলির কিন্তু আবার খুব নিকট সম্বন্ধ—কোম্পানীর টাকা নিরাপদ রাখিবার জন্যই যে শুধু ব্যাঙ্কের প্রয়োজন তাহা নয়—ব্যাঙ্ক সময়ে অসময়ে কোম্পানীকে টাকা কর্জ দেয়, এমনকি কোম্পানী স্থাপনার সময়ও ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তা থাকে। কোম্পানী ব্যাঙ্ক ছাড়া নিজেদের শেয়ারওয়ালাদের নিকট হইতেও নির্ধারিত সুদে টাকা কর্জ নেয়—কোম্পানীর নিজের অংশীদারদের নিকট হইতে এইরূপ নিশ্চিত সুদে টাকা কর্জ নেওয়ার নাম ডিবেঞ্চার। কোম্পানীর বাড়ী ভাড়া, জমি ভাড়া, ডাইরেক্টরের ফিস এবং অন্যান্য রাহা খরচ বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহা হইল কোম্পানীর লাভ—এই লাভ হইতে প্রথমেই ব্যাঙ্কের পাওনা আদায় করিতে হয়, তারপর দিতে হয় অংশীদারদের ডিবেঞ্চারের টাকা,—ইহার পর বিশেষ শেয়ারে নির্দিষ্ট টাকা, তারপর হিসাব মত সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশ বা ডিভিডেণ্ড। ধরুন, আপনাদের রামকুমার শেঠের যৌথ সিমেণ্ট কোম্পানীতে এই বৎসর মোট লাভ হইল ৯০ হাজার টাকা ; ইহার মধ্য হইতে ব্যাঙ্ক, ডিবেঞ্চার, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতিতে যাইবে—

ব্যাঙ্কের পাওনা ১২,০০,০০০৲ টাকার
শতকরা ৩৲ হিসাবে সুদ—১৪,০০০৲

ডিবেঞ্চার ২,০০,০০০৲ টাকার
শতকরা ৫৲ হিসাবে সুদ—১০,০০০৲

বিশেষ শেয়ার ৩,০০,০০০৲ টাকার
শতকরা ৬৲ হিসাবে লভ্যাংশ—১৮,০০০৲

সাধারণ শেয়ার ২,০০,০০০৲ টাকার
শতকরা ২০৲ হিসাবে লভ্যাংশ—৪০,০০০৲

৮২,০০০৲

ইহার মধ্যে যদি কোম্পানীর পুঁজি বাড়াইতে হয় কিংবা কিছু টাকা আকস্মিক খরখরচার জন্য রাখিয়া দিতে হয়, তবে সাধারণ শেয়ারে লভ্যাংশে কিছু কমাইয়া দিলেই চলিবে।

জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর গঠন বুঝিবার জন্য আমরা একটি সত্য ভারতীয় উদাহরণ লইতেছি—

১৯৪২ ইংরেজীতে জুগ্‌গীলাল কমলাপত কটন ম্যানুফেকচারার্স লিমিটেড, কানপুর নামে একটি কোম্পানী খোলার প্রস্তাব হয়। এই কোম্পানীর সঙ্কল্পিত পুঁজি ছিল ২৫ লাখ, ইহার মধ্যে ১২½ লক্ষের শেয়ার ছাড়া হয়। এই ১২½ লক্ষ টাকার মধ্যে ১০০৲ টাকা করিয়া ২৩০০ বিশেষ শেয়ার এবং ৮২০০ সাধারণ শেয়ার ছিল। এইভাবে বিশেষ শেয়ার ও সাধারণ শেয়ার বেচিয়া কোম্পানী সহজেই ১০,৫০,০০০৲ টাকার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলে। অবশ্য বিশেষ শেয়ারের উপর শতকরা ৬৲ টাকা বার্ষিক সুদ বা লভ্যাংশ নির্ধারিত ছিল; কিন্তু এই লভ্যাংশ যাহাই হউক, কোম্পানীর কর্তাদের বাদ দিয়া সাধারণের জন্য মাত্র ১৩০০ শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল; আর ২৫ লক্ষ মূলধনের বাকী সমুদয় শেয়ারই কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হয়। এই কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের মধ্যে ছিলেন পদমপত, কৈলাসপত এবং লক্ষ্মীপত সিংহানিয়া—ইহারা সকলেই ব্যাঙ্ক-মালিক; আর অপর তিনজন ডাইরেক্টরের মধ্যে রায় রাম-নারায়ণ ছিলেন—ইনিও ব্যাঙ্ক- মালিক এবং অপর দুইজন কোকলস্‌ ও গর্গ কারখানাদার এবং বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রূপই এই যে ইহা ব্যক্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া সংগঠনকে সম্মুখে খাড়া করে—কিন্তু তাহা হইলেও সংগঠনের পিছনে ব্যক্তির অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিস্বার্থের প্রেরণা একেবারে বেমালুম হইতে পারে না।

ইজারাদারীয় পুঁজিবাদের পত্তন সময় হইতে জয়েন্ট স্টক কোম্পানী কিভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার একটা উদাহরণ লইতেছি।†

† ইংলণ্ডীয় ইজারাদারী পুঁজিবাদের উপনিবেশ ছিল বলিয়া ভারতবর্ষে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ইহার উদাহরণ মিলিবে না। তাই জয়েন্ট স্টক কোম্পানী বৃদ্ধির বেগ বুঝিবার জন্য আমরা পুনরায় ইংলণ্ডের সমাজ হইতেই উদাহরণ গ্রহণ করিতেছি। ইহাতে ইজারাদারীর পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী রূপ এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর সহায়তায় সাম্রাজ্যবাদী ইজারাদারীর প্রতিষ্ঠা সহজেই বুঝা যাইবে।

সন	কোম্পানীর সংখ্যা	আদায়ীকৃত মূলধন (লক্ষ পাউণ্ডে)
১৮৮৪	৮,৬৯২	৪,৭৫০
১৯০০	২৯,৭৩০	১৬,২৩০
১৯০৫	৩৯,৬১৬	১৯,৫৪০
১৯১৩	৬০,৭৫৪	২৪,২৬০
১৯১৯	৭৩,৩৪১	৩০,৮৩০
১৯২৪	৯০,৯১৮	৪৩,৫৩০
১৯২৯	১.০৮,৬৯৮	৫২.০০০
১৯৩১	১,১৪,২৯৫	৫৫,১৫০

উপরের উদাহরণ হইতে দেখা যায় ১৮৮৪ হইতে ১৯৩১ সনের মধ্যে ইংলণ্ডীয় পুঁজি বাড়িয়া বার গুণের মত হইয়া গিয়াছে। এই জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীগুলি সাম্রাজ্যবাদী ইজারাদারী কায়েম রাখিবার পক্ষে দুই ভাবে সহায়ক হইয়াছিল। প্রথমত ইহাদের রূপ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক না হওয়ায় এইরূপ কোম্পানীগুলিকে মিলিত করা বা এক পরিচালনার অধীনে আনা সহজ হইয়াছে। দ্বিতীয়ত স্লিপিং পার্টনার বা অকর্মা সরিক গ্রহণ করায় একদল ইহাতে টাকা দিয়া নিছক ফাটকাবাজীর সুযোগ পাইয়াছে।*

অবশ্য বলিবার সময় ইহাই বলা হয় যে কোম্পানী কোন এক দুই জনের সম্পত্তি নয়; ইহা হইল 'কোম্পানি' অর্থাৎ কিনা বহুজনের, ইহাতে হাজার হাজার সরিক আছে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা ঠিক এইরূপ নয়, কোম্পানীর মালিক দুই একজনই, এক বা দুইজন ডাইরেক্টরই কোম্পানীর সর্বেসর্বা হয়। আধুনিক কারবার চালাইবার জন্য একজন দুইজন ম্যানেজার থাকে—এই কর্তাব্যক্তিদের কেহ উৎপাদনের তদারক করেন আর কেহ বা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে লক্ষ্য রাখেন। কিন্তু ডাইরেক্টর মহোদয়রা গঠনের সময়ই কোম্পানীকে পারিবারিক ব্যাপার করিয়া তুলেন—তাই ইহাতে খবরদারী করিবার জন্য যে ম্যানেজার দরকার হয়, তাহা ডাইরেক্টরদের অধিকার পাকা রাখিবার জন্য এবং কিছুটা কারবারের স্বার্থরক্ষার জন্য, দেশের রাজনীতিক নেতা ও সরকারী অধিকারীদেরও হাতে

* ইহারা, কোম্পানীর কাজের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্কিত নয়, এমনকি কোম্পানীর কারখানা কোথায় ইহাও তাহারা জানেনা, জানিবার প্রয়োজনও বোধ করে না—শুধু লগ্নি করিয়া টাকা ধার দেওয়া। ইহাতে লাভের অংশ আসিয়া গেলেই হইল। এইজন্য ইহাকে টাকার ফাটকাবাজী বলা চলে।

রাখিতে হয়। তাই কোম্পানীর বড় পদগুলিতে এই কর্তাব্যক্তিদের শালা-সম্বন্ধীরাই বিরাজ করেন। ইহার ফলও সর্বদা শুভই হয়—কোম্পানীতে স্ট্রাইক হইলে, বা সরকারী কণ্ট্রাক্ট পাইতে হইলে, এই সব মিতালি কোম্পানীর কাজে লাগে। তাই প্রায়ই শোনা যায়, অমুক কোম্পানী অমুক নেতার অপোগণ্ড পুত্রকে ৫০০৲ টাকার চাকুরি দিয়াছে; অমুক কোম্পানী অমুক জজসাহেব বা কালেক্টর সাহেব বা মিনিষ্টারের জামাইকে ৭০০৲ টাকায় চাকর রাখিয়াছে—এই সবের অর্থ কি তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়া দিয়াছি।

কোম্পানীর ডাইরেক্টর স্লিপিং পার্টনার বা অকর্মা সরিক দেউলিয়া হইবার ক্ষয়ক্ষতি বরদাস্ত করিতে চায় না। তাই নিজের টাকা তাহারা এক কোম্পানীর শেয়ারে খরচ না করিয়া বহু কোম্পানীতে ছড়াইয়া দেয়। ইহাতে কোম্পানীর বার্ষিক বৈঠকে তাহাদের ডাক পড়ে না, নিজেদের খেয়াল খুসীমত ভোট দিবার অধিকার হইতেও তাহারা বঞ্চিত হয়, কিন্তু শেয়ার হইতে লাভ আসিতে থাকিলে, কারবারের কিছু না জানিয়াই ইহারা ডাইরেক্টরদের জয়জয়কার করে। ইহাতে ফল এই দাঁড়ায় যে, ব্যক্তিগতভাবে সামান্ত টাকা দিয়াও কোম্পানীতে কোন একটি বিশেষ পুঁজিপতি দল নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ভারতবর্ষে টাটা, ডালমিয়া, জুগ্‌গীলাল, বিড়লা, হুকুমচাঁদ—যে-কোন কোম্পানীর ভিতরের খবর লইলেই এই উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

দুই একজন ডাইরেক্টর সমগ্র কোম্পানীকে কিভাবে হাতের মুঠায় আনিয়া রাখে তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। ইহারা এইভাবে এক কোম্পানী হইতে বহু কোম্পানীর সর্বেসর্বা হইয়া ছোট পুঁজিপতিকে প্রতিযোগিতায় হারাইয়া দেয়; ইহার ফলে বাজারে প্রতিযোগিতার অভাব ঘটিয়া ব্যবসায়িক একাধিকার বা ইজারাদারী স্থাপিত হয়। পুঁজিবাদী কারবারের বিশেষত্বই এই ইজারাদারী—ইহা শুধু পুঁজিবাদী দেশের আভ্যন্তরীন কাজকারবারের বেলায়ই যে সত্য তাহা নহে, তাহার অধীন দেশগুলির বেলাতে ইহা একই রূপে সত্য। ইংলণ্ডে জাহাজ, রেল এবং বিমান যাতায়াত, তাহার লৌহ চালাইএর কারবার, সেখানকার দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির সরবরাহ সমস্তই একচেটিয়া মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সেইরূপ ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকার কোটি কোটি মজুরের উৎপন্ন পণ্য, সেইসব পণ্য উৎপাদনের কারখানা-কারবার, এই সমুদয়ও ইজারাদারীর অওতায় আসিয়া

গিয়াছে! ইংলণ্ডের পি. ও. কোম্পানী আজ পৃথিবীর সকল জায়গায়ই জাহাজ চালায়, ইহার অভ্যন্তরভাগের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখিব, তাহাতে বহু ছোট কোম্পানীর মরা লাশ পড়িয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের নদী ও উপকূলপথে জাহাজ চালাইবার জন্য এই কোম্পানীই তাহার নিজের অধীনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া নেভিগেশন নামে আর একটি কোম্পানী খুলিয়া রাখিয়াছে। এই ব্যাপারে বিলাতের অন্য জাহাজ কোম্পানীর সহিত, আপোষেই হউক বা ঝগড়া করিয়াই হউক, প্রত্যেকের ইজারাদারীর এক একটা ক্ষেত্র বা এলাকাও নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ভারতীয় পুঁজিপতিরাও নিজে কোম্পানী খুলিয়া কয়েকবার জাহাজ চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু বিলাতী পুঁজির প্রতাপের সম্মুখে ইহারা বেশি দিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। ভারতীয় কোম্পানী যতবারই জাহাজ জলে ভাসাইয়াছে বিলাতী কোম্পানী ততবারই তাহার ভাড়ার হার কমাইয়া দিয়াছে; এইভাবে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বারবার লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি দিয়া বিলাতী পুঁজির হাতে ব্যবসায় তুলিয়া দিয়া সরিয়া আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে এক টাকা ভাড়ায় রেঙ্গুন যাইবার কথা আজ খোসগল্প মনে হইলেও ইহা খুব বেশি দিনের ঘটনা নয়। চট্টগ্রাম হইতে আকিয়াব পর্যন্ত জাহাজ চালান লইয়া দুই কোম্পানীর মধ্যে একবার বড় চমৎকার একটি প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম কমভাড়া, তারপর বিনাভাড়া, তারপর বিনাভাড়া ত' বটেই, উপরন্তু রুমাল এবং সিগারেট ভেট দিয়া যাত্রী নেওয়া হইত। বিলাতের কোটি কোটি টাকার সম্মিলিত পুঁজি হইতে পাঁচ সাত লাখ টাকা ক্ষতি হওয়া বেশি কথা নয়; কিন্তু ছোট-খাট ভারতীয় কোম্পানীর পক্ষে এই ব্যাপারে মার খাইয়া সরিয়া আসা ছাড়া অন্য পথ কোথায়? তবে সিন্ধিয়া কোম্পানী যে টিকিয়া রহিল ইহারও কারণ আছে—সিন্ধিয়ার পিছনে পুঁজির জোর ছিল; তাহা ছাড়া বিলাতী কোম্পানীর সঙ্গে ভাড়ার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইলে কৌন্সিলের সদস্য এবং জাতীয় নেতারা এমন চীৎকার শুরু করিয়া দিতেন যে বিদেশী পুঁজির স্বার্থভাণ্ড ফুটা হইয়া যাইত। দেশের ক্রমবর্ধিত জাতীয় আন্দোলনের মুখে বিদেশী সরকারও কোম্পানীর পক্ষ হইয়া প্রকাশ্যে কিছু করিতে সাহস পাইত না।

দেশে বিদেশে খবর সরবরাহ করিবার জন্য সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য জুড়িয়া রয়টারের এজেন্সি রহিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরেও তাহার বিস্তর শাখা

প্রশাখা আছে—ভারতবর্ষেও এসোসিয়েটেড় প্রেস নামে তাহার একটি এজেন্সি ছিল। এই রয়টার কোটি কোটি টাকার কারবারী, তাহার সংগঠনও খুব বেশি শক্তিশালী—আর বিভিন্ন দেশের শাসকদের সঙ্গে অক্ষুণ্ণ সম্পর্কের কলকাঠিটিও তাহার করায়ত্ত। ভারতীয় পুঁজিতেও পূর্বে বহুবার এইরূপ এজেন্সি খোলার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু য়ুনাইটেড প্রেস ছাড়া আর কেহই ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। য়ুনাইটেড প্রেসের টিকিয়া উঠার মূলেও একাধিক কারণ ছিল—ইহার মধ্যে নানারূপ রাজনৈতিক হুমকির জোরও একেবারে কম ছিল না। তাহা হইলেও বৃটিশ আমলে এসোসিয়েটেড প্রেসের যে জোর ছিল, তাহার যে সংগঠন ও ক্ষমতা ছিল, য়ুনাইটেড প্রেসের তাহা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সরকার, সরকারের সমুদয় বিভাগ, তাহার সর্বময় ক্ষমতা লইয়া তখন এসোসিয়েটেড প্রেসের স্বপক্ষে কাজ করিত। খবরের উপর সর্বাপেক্ষা বড় জুলুম যে পুলিসী দৌরাত্ম্য, তাহা হইতে এসোসিয়েটেড প্রেস সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

ভারতীয় ব্যাপারীরা প্রথম প্রথম আড়তদারের কাজ করিত। বিদেশী কারখানার মালের এজেন্সি লইয়া তাহারা তাহা এদেশে বিক্রয় করিত। মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের, বিশেষ করিয়া মারবাড়ী বণিকদের, মুনাফার উপায় আড়তদারীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন অবশ্য চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে—ভারতীয় পুঁজিপতি কাপড়, লোহা, চিনি ও সিমেণ্টের হাজার কারখানা খুলিয়াছে—টাটা, বিড়লা প্রভৃতির নাম বহির্ভারতেও অপরিচিত নাই। এমন যে মারবাড়ী জাত—যে একদিন জানের ভয়ে লঙ্কা যাইবারও হিম্মত রাখিতনা—সেও এখন লণ্ডন, টোকিও, ন্যুয়র্কে ব্যাপারযাত্রা করিতেছে—বিশ্বের পুঁজিপতিদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নূতন নূতন বাজারে দখল বসাইতেছে।

খবরের ব্যবসায়ের মত এদেশে খবরের কাগজের অর্থাৎ ইংরেজী খবরের কাগজের ব্যবসায়ও এককালে ইংরেজ পুঁজিপতিদেরই হাতে ছিল। এই খবরের কাগজের কাজ শুধু তাজা খবর সরবরাহ করার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না; পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী শাসন সুদৃঢ় করা ইহার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; আর উদ্দেশ্য ছিল, সর্বপ্রকার জাতীয় চেতনা ও জাতীয় জাগরণকে অঙ্কুরে হত্যা করা। ভারতীয় হিতের সমর্থক হিসাবে ভারতীয় পুঁজিতে দুই একটি পত্রিকার অবশ্য জন্ম হইল, কিন্তু বিলাতী পুঁজির সংগঠনক্ষমতা তখনও প্রবল, তাহার পশ্চাতে বিদেশী শাসকের সমর্থনও অসামান্য।

অবশ্য দেশী পত্রিকাগুলিরও একদিন সত্যই কদর হইল—কিন্তু তাহা মহাযুদ্ধের পর, জাতির নবজাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে—এই ধাক্কায় কয়েকটি ইংরেজী সংবাদপত্র উঠিয়াই গেল। কিন্তু স্টেটস্‌ম্যানের শক্তি তাহাতে কমিল না, দিল্লী হইতে তাহার আর এক সংস্করণ বাহির হইল ; স্টেটস্‌ম্যান তখন বিলাতী পুঁজির একক প্রহরী, তাই তাহার কণ্ঠ আরও সোচ্চার হইল, আরও সরব হইল ; এইভাবে সরকারের একচেটিয়া মুখপত্র হইল স্টেটস্‌ম্যান—সরকারী মহলে তাহার একচ্ছত্র প্রসার, সরকারী বিজ্ঞাপনে তাহার অঙ্গশোভা—বিদেশী মালের বিজ্ঞাপনও তাহারই একচেটিয়া ; তার উপর নানা সূত্রে সংবাদ আমদানী করে সে বেশি, বেশি পুঁজির মালিক বলিয়া সম্পাদনা কার্যেও সে অগ্রণী, তাহার সম্পাদকীয় বিভাগ অন্যের তুলনায় যোগ্যতর ; এইসব কারণে বেসরকারী গ্রাহকও তাহার অধিক।

কিন্তু দেশী পত্রিকাও বেশি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল না। খবরের কাগজে পুঁজি ন্যস্ত করিয়া লাভ উঠাইবার কায়দা সেও আয়ত্ত করিয়া লইল। বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে তাহারও পাতা ভরিয়া উঠিল। দেশের জাগ্রত জনমতের সমর্থক বলিয়া প্রসারও হইল যথেষ্ট। ইহার মূলে কিন্তু দেশী ও বিদেশী পুঁজির বর্ণচোরা লড়াই। ভারতীয় পুঁজিপতি সহজেই বুঝিল খবরের কাগজ শুধু মুনাফার উপাদান নয়—ইহা তাহার মুনাফা সুরক্ষিত রাখিবার অন্যতম মহাস্ত্রও। তাই জাতীয় জাগরণকে সমর্থন করা তাহার নীতি হইল—কারণ বিদেশী পুঁজির সহিত সংঘর্ষে ইহা তাহার প্রয়োজন। কিন্তু এই জাগরণ যখনই দেশী পুঁজিকে আঘাত করিয়াছে, তখনই তাহাকে শুদ্ধ করা দেশী সংবাদ পত্রের কর্তব্য হইয়াছে। এইজন্যই দেশী সংবাদপত্র বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে যে উৎসাহে গর্জন করিয়াছে, সেই উৎসাহে দেশের স্বতন্ত্রচেতা বুদ্ধিজীবী বা মজুর-কৃষকের দাবীকে স্বীকার করে নাই।

ভারতীয় পুঁজির সংবাদপত্র-নির্ভরতার ব্যাপারে হয়ত হিন্দুস্থান টাইমসের নামই সর্বাগ্রে করিতে হয়। হিন্দুস্থান টাইমস্ ভারতীয় পুঁজির স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদা চীৎকার করে। ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় লিখিতে বা কার্টুন ছাপাইতে ইহার জুড়ি ছিল না। কিন্তু শ্রমিকের দাবী দাওয়া বা ধর্মঘটের বিপক্ষে কলম চালাইতেও তাহার সমপরিমাণ উৎসাহ। কোন সমাজতন্ত্রবাদী দেশ বা সংগঠনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিবার বেলায় ইহার শতজিহ্বা হয়। আমরা পুঁজির ইজারাদারীর আলোচনা প্রসঙ্গে খবরের কাগজের কথা আলোচনা করিতেছিলাম। খবরের কাগজে লাভ দেখিবার

পর ভারতীয় পুঁজিপতি এই ব্যবসায়কে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। ভারতের নূতন রাজধানী দিল্লী ইহতে পুরাতন রাজধানী পাটনা পর্যন্ত এইজন্যই ইহার শাখা বিস্তৃত হয়। এবং কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় পত্র হইয়া সার্চলাইট বড় আকারে নূতন সজ্জায় একই পুঁজিতে আত্মপ্রকাশ করে। এই নবপর্যায় সার্চলাইট সেই পুরাতন দিনের হাতে-কম্পোজ-ওয়ালা ছবি-কার্টুন-হীন মামুলি সার্চলাইট নয়। অবশ্য খবরকাগজী পুঁজির বিস্তার যে শুধুমাত্র হিন্দুস্থান টাইমস আর সার্চলাইটের বেলাতেই তাহাও নয়। ইংরেজী কাগজের সঙ্গে এখন বাংলা কাগজ, হিন্দী কাগজও একাধিক স্থানে আপনার পুঁজির বিস্তারের পথ খুঁজিতেছে। ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ভারতীয় সংবাদপত্রের বাজারেও পুঁজির বাজারের ইজারাদারী আসিয়া গেল ; ইহার স্বাভাবিক ফলও তাহাই হইবে অর্থাৎ ছোট মাছ বড় মাছের পেটে যাইবে ; এবং বড় পুঁজির মালিক বড় কাগজগুলি মজুর-কিসানের উদ্ধত কণ্ঠকে রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আসিয়া পুঁজির বাজারে ইজারাদারী আরম্ভ হয়। এই সময় পুঁজিপতিরা কয়েকটি পণ্যের নিম্নতম দর এবং তাহার বিক্রয় পরিমাণ সম্পর্কে আপোষরফা করিয়া লয়। কিছুদিন পর ইজারাদারীর পুঁজিবাদেরও আর একটি নূতন অধ্যায় সুরু হইল। তখন বিভিন্ন কোম্পানী সম্মিলিত চালনার অধীনে আসিয়া বড় বড় কোম্পানীর সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। বড় কোম্পানী সৃষ্টির উপায় আমরা পূর্বেও আলোচনা করিয়াছি। কোন ক্ষেত্রে পুঁজিপতি নিজেদের শেয়ারের রাশি একত্র করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ডাইরেক্টরের সম্মেলন সাধন করে—এই উপায়ে পুঁজির বাজারের বিক্ষিপ্ত পুঁজি পুঞ্জিত হয় এবং কোম্পানীও বড় হইয়া উঠে। কোম্পানী বড় করিবার অপর সাধন হইল মৎস্যন্যায়, অর্থাৎ ছোট কোম্পানী বড় কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় নিজের স্বাতন্ত্র্য বেশিদিন বজায় রাখিতে পারেনা ; পণ্যমূল্যের তেজীমন্দী, শেয়ার বাজারের অনিশ্চিততা, এই সব ব্যবসায়িক দুর্দৈব ছোট ব্যবসায়ীকে অল্প সময়ের মধ্যেই কাত করিয়া ফেলে। একটা উদাহরণ হিসাবে ভারতবর্ষের ছোট ছোট সিগারেট কোম্পানীগুলির কথা মনে করিতে পারেন ; ব্যবসায়িক আবর্তে চুবানি খাইতে খাইতে ইহারা কোন্ দিনই অতলে ডুবিয়া গিয়াছে ; আর তাহার স্থানে এক ইংরেজী কোম্পানী নিজের পুঞ্জিত পুঁজির গৌরবে সার্বভৌম একাধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে।

এই সব দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিলাম যে, কেন্দ্রীকরণের ফলে পুঁজিপতির লাভ ও শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাহার বাজার ব্যাপক হয় এবং কার্যক্ষেত্রেও বিস্তৃতি

ঘটে। পুঁজিবাদী জগতের ব্যবসায়িক সংগঠন আজ এমনই ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাই খবরের কাগজের যে ব্যবসায়, আজ সে তাহার সকল আনুষঙ্গিক অর্থাৎ কাগজ, কালি, টাইপ নিজের ফ্যাক্টরীতেই প্রস্তুত করায়। ইংলণ্ডে গেস্ট, কীন, নেটলফিল্ড প্রভৃতি শুধু আজ লোহার কারখানারই মালিক নয়। লৌহ ব্যবসায় সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তাহারা নিজের কারখানায়ই প্রস্তুত করায়, এবং লোহা ও কয়লার বহু খনিরও তাহারা মালিক।

(২) **ব্যাঙ্ক মালিকের জোর**—কারবারে জন্য সুদে টাকা ধার করার প্রথা আজ নূতন নয়। ব্যাপার যুগের মহাজনরাও ব্যাপারীকে সুদে টাকা কর্জ দিত। কিন্তু বর্তমান ব্যাঙ্কের মত এত ফন্দিফিকির তখন জানা ছিলনা। পুঁজিবাদী যুগের শেষাশেষি অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী যুগে আসিয়া ব্যাঙ্কের প্রবল প্রতিপত্তি হইয়াছে—এখন ইহার শক্তি এত বেশি যে সমাজের জীবনমরণ ব্যাঙ্কের হাতে বলিলে ভুল হয় না। ব্যাঙ্কের এই শক্তির কারণ হইল সমাজের শিল্পোদ্যোগের সহিত তাহার সম্পর্ক। যে কোন নূতন শিল্পোদ্যোগেই পুঁজির জন্য প্রচুর টাকা কর্জ করিতে হয়। এই সব কর্জ আবার যত দীর্ঘমেয়াদী হইবে ততই কারবারের সুবিধা। তাই ব্যাঙ্ক ছাড়া ব্যৈক্তিক ভাবে কোন মহাজনের দ্বারা ইহা হয় না। ব্যাঙ্ক সর্বদাই তাহার পুঁজি খাটাইয়া লাভ করিতে চায়—আমানতদারকে সে গচ্ছিত টাকার জন্য খুব সামান্য সুদ দেয়; এবং এই গচ্ছিত আমানতী টাকাই অন্যত্র বেশি সুদে কর্জ দেয়। ইহাই ব্যাঙ্কের ব্যবসায়। এই ব্যবসায়ে টাকার লেনদেন যত বেশি হইবে ব্যাঙ্কের মুনাফার হারও ততই বাড়িয়া যাইবে। ইহার জন্য ব্যাঙ্কের পুঁজি বেশি হওয়া দরকার। পুঁজি বেশি খাটিলে অন্যান্য ব্যবসায়ের মত ব্যাঙ্কের ব্যবসায়েও সুবিধা হইবে—মোটা পুঁজির ব্যাঙ্কের নিত্য নূতন শাখা গজাইবে, লোকের বিশ্বাসও তাহার উপর বাড়িয়া যাইবে—আর ইহার ফলে সেই ব্যাঙ্কে আমানত টাকার পরিমাণও বেশি হইবে। ইহা টাকায় টাকা আনিবার সেই সনাতন ব্যাপার।

গত পঞ্চাশ বৎসরে ব্যাঙ্কেরও খুব কেন্দ্রীকরণ হইয়াছে। ইংলণ্ডের সংযুক্ত পুঁজির ব্যাঙ্কগুলিতে যে পুঁজি ন্যস্ত আছে তাহার শতকরা নব্বই ভাগই 'পাঁচ বড়'র পুঁজি। ইংলণ্ডে এই 'পাঁচ বড়' বা 'বিগ ফাইভ' হইতেছে লয়েড্, ন্যাশনাল, ওয়েস্ট মিনিস্টার, বার্কলে এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের বেলায় পূর্বের মৎস্যন্যায় ব্যাপারটি আরও বেশি কার্যকরী হয়। ১৮৯০ সনে ইংলণ্ডে সংযুক্ত পুঁজির ব্যাঙ্ক ছিল ১০৪টি। ইহাদের শাখা প্রশাখা ছিল ২২০৩টি।

ইহাদের সংযুক্ত পুঁজির পরিমাণ তখন ৬৭৮ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩২ সনে ইংলণ্ডে সংযুক্ত পুঁজির ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬। ইহার মধ্যেও ছুইটি ব্যাঙ্ক আবার পুরাপুরি স্বতন্ত্র নয়। অথচ এই ৪২ বৎসরে ব্যাঙ্কের শাখা হয় ১০১৭৮টি—অর্থাৎ ১৮৯০ সনের চতুর্গুণ হইতেও অনেক বেশি। এই সময় ব্যাঙ্কের সংযুক্ত পুঁজি ছিল ১৬৪৫ লক্ষ পাউণ্ড—অর্থাৎ পূর্বের প্রায় আড়াই গুণের কাছাকাছি। নীচের হিসাব হইতে ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীকরণের বেগ বুঝা যাইবে †—

সন	ব্যাঙ্কসংখ্যা	শাখা	রক্ষিত সম্পত্তিত ও পুঁজি (লক্ষ পাউণ্ডে)	আমোনত পুঁজি (লক্ষ পাউণ্ডে)
১৮৯০	১০৪	২,২০৩	৬৭৮	৩,৬৮৭
১৯০০	৭৭	৩,৭৫৭	৭৩৮	৫,৮৬৭
১৯১০	৪৫	৫,২০২	৮০৯	৭,২০৭
১৯১৫	৩৭	৬,০২৭	৮১৭	৯,৯২৬
১৯২০	২০	৭,৬১২	১,২৮২	১৯,৬১৮
১৯২৫	১৮	৮,৮৩৭	১,৩৪৮	১৮,০৬৮
১৯৩০	১৬	১০,০৮২	১,৪৪৩	১৯,৭৮৮
১৯৩১	১৬	১০,১৭৮	১,৩৪৫	১৮,২১০
১৯৩২	১৬	১০,০৬৬	১,৩৫২	২০,৬৪৪

স্কটল্যাণ্ডে ১৮৩০ সনে ১০টি বড় ব্যাঙ্ক ছিল, ১৯৪১ সনে তাহার সংখ্যা হইল ৮টি—এই ৮টির মধ্যে ৪টিই আবার পুর্বের পাঁচ বড়র অন্তর্গত; এই সময়ের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডে বড় ব্যাঙ্কের শাখা ৯৭৫ হইতে ১৬৬৩ হয়, এবং মোট পুঁজি ও রক্ষিত সম্পত্তির পরিমাণ ১৪৭ লাখ পাউণ্ড হইতে ৩০৭ লাখ পাউণ্ডে পৌছে। সংযুক্ত পুঁজির ব্যাঙ্ক ছাড়া ইংলণ্ডে বড বড় প্রাইভেট ব্যাঙ্কও আছে—ইহার মধ্যে রথচাইল্ড, মোর্গান প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; অবশ্য এই প্রাইভেট ব্যাঙ্কেরও কতকগুলি 'পাঁচ বড়'র সঙ্গে সম্পর্কিত। নিম্নে ইংলণ্ডের প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলির কেন্দ্রীকরণের হিসাব দিলাম—

সন	ব্যাঙ্কসংখ্যা (পাঁচ বড়র বাহিরে)	রক্ষিত সম্পত্তি ও পুঁজি (লক্ষ পাউণ্ডে)
১৮৯৫	৩৮	১১৮
১৯১৩	৮	৩৯
১৯২০	৫	৩১
১৯৩১	৪	৩২
১৯৩২	৪	২৪

† The Economist (London), May 13, 1933

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে প্রাইভেট ব্যাঙ্কের সংখ্যাহ্রাসের মধ্য দিয়াও আবার সেই 'পাঁচ বড়'রই কেন্দ্রীকরণ হইয়াছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি প্রাইভেট ব্যাঙ্ক মোটা, আরও মোটা হইলেও ইহার বেশির ভাগই 'পাঁচ বড়'র উদরে গিয়া পড়িয়াছে। উপরের সূচী হইতে ব্যাঙ্কের রক্ষিত পুঁজি ও সম্পত্তির পরিমাণ লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্ট ধরা পড়িবে। এখানে আর একটা কথা স্পষ্ট ভাবে বলার দরকার। ব্যাঙ্ক যে শুধু সুদ আর টাকার লেনদেনই করে না, বহু কারখানা এবং শিল্পোদ্যোগের মালিকও হয় ব্যাঙ্ক;—ব্যাঙ্ক বড় বড় সহরের বড় ইমারতের ভিত্তিপ্রস্তর, তাহার বনিয়াদে সোনারূপার ইট; কিন্তু ইহা ব্যাঙ্কের মূল কাজের বাহ্যিক রূপমাত্র। এই বড় ইমারত বড় কারখানা, বড় সৌদাগরী অফিসগুলিতে যাহারা মালিকমুনিব, যাহারা ডাইরেক্টর, তাহাদের ব্যক্তিস্বার্থের ভাণ্ডারী হওয়াই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। ১৯৪২ সনে ইংলণ্ডের ৬টি বড় ব্যাঙ্কের ১৭৪টি ডাইরেক্টর অন্যান্য কোম্পানীর ১২৭৫টি ডাইরেক্টরের পদ অধিকার করিয়াছিলেন—

ব্যাঙ্ক	ডাইরেক্টর	অন্য কোম্পানীতে ডাইরেক্টরী পদ	কোম্পানীর বিবরণ
(১) বার্কলে	৩৮	২০২	২১ জাহাজী
			২০ মহাজনী
			২৪ বীমা
(২) ওয়েস্ট মিনিস্টার	২৫	২১১	৩৭ বিদেশী ব্যাঙ্ক
			২৯ বীমা
(৩) ন্যাশনাল প্রভিন্সিয়াল	২১	১৫২	১৭ বীমা
(৪) মিডল্যাণ্ড	৩২	২৯১	২১ কাপড়
			৬৫ মহাজনী
			২৪ দেশী ব্যাঙ্ক
			২৪ লোহা কয়লা
(৫) লয়েড	৩৩	২৪৫	১৯ বিদেশী ব্যাঙ্ক
			২৫ মহাজনী
			২২ বীমা
			১৪ লোহা কয়লা
			৯ বিদ্যুৎ
(৬) ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড	২৫	১৭৫	১২ লোহা কয়লা
			১২ জাহাজী
			২২ মহাজনী

লেনিন বলিয়াছিলেন, ব্যাঙ্কের শেষ পরিণতি সর্বত্রই ইজারাদারী বা একাধিকার ;—উপরের সূচী হইতে এই উক্তি যে কত সত্য তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। জর্মণীর দিকে তাকাইলেই আমরা সেখানে ইংলণ্ডের মতই ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীকরণ দেখিতে পাইব। ১৯০৭ ইংরেজীতে, জর্মণীর ৪০টি বড় ব্যাঙ্কে যে পুঁজি ছিল, তাহার অর্ধেকেরও বেশির মালিক ছিল মাত্র ৮টি ব্যাঙ্ক ; ১৯২৬ ইংরেজীতে বড় ব্যাঙ্কের সংখ্যা সেখানে ৪০ হইতে মাত্র ১৭তে আসিয়া পৌঁছে, আর এই ১৭টি ব্যাঙ্কেরও মাত্র ৬টি ব্যাঙ্কে জর্মণীর ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমস্ত পুঁজির ৭০% ভাগ গিয়া পুঞ্জিত হয়।

১৯৩৮ সনে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও ব্যৈক্তিক ধনের এই বিপুল কেন্দ্রীকরণের কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। সত্যই, আমেরিকার শতকরা ৫টি বড় কারবার তখন পুঁজির শতকরা ৮০ ভাগ গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিল। আর প্রতি শতে মাত্র ৪টি কারখানা সারা মুলুকের সমস্ত মুনাফার ৮৪ শতাংশের একচেটিয়া মালিক ছিল। হার্স্ট, রকফেলার মেলোন, ডুপোণ্ট, ফোর্ড, মোর্গন প্রভৃতি শুধু আমেরিকার নয়, পৃথিবীর মধ্যেই সর্বপেক্ষা অধিক ধনের অধিকারী। এই মোর্গনের ১৬৭ জন মানুষ তখন আমেরিকার বিভিন্ন কারখানা-কোম্পানীতে ২৫৫০টি ডাইরেক্টরের পদ অধিকার করিত। ১৯২৯ ইংরেজীতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ধনের হিসাবে দেখা যায় যে তখন তাহার পরিমাণ ৪২৫,০০,০০,০০০ লক্ষ ডলার ছিল। এই লক্ষ সোয়া বেয়াল্লিশ হাজার লক্ষ ডলার আমেরিকার স্ত্রী পুরুষ শিশুর মধ্যে ভাগ করিলে প্রত্যেকে ৩১০০ ডলার বা প্রায় সাড়ে দশ হাজার টাকা করিয়া পাইবার কথা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ধনাধিকার এইরূপ ছিল না, সেখনে শতকরা একজন ধনী রাষ্ট্রের সমস্ত চলতি ধনের ৮৩ শতাংশের মালিক ছিল, বাকী ১৭ অংশ জনসাধারণের অর্থাৎ শতকরা নিরানব্বই জনের সম্পত্তি ছিল। ১৯৪০-৪৭ এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ১৭ লক্ষ কৃষক অর্থাৎ রাষ্ট্রের সমগ্র কৃষক সংখ্যার এক চতুর্থাংশই তাহাদের জোতজমি বেচিয়া খোয়াইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলে।

ফ্রান্সে দেশের সমগ্র পুঁজির প্রায় সমস্তটুকুই মাত্র দুই শতটি পরিবারের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ডেও বার্ষিক দশ হাজার পাউণ্ডের অধিক আয়ওয়ালা মানুষ আট হাজার হইতেও কম হইবে। ইংলণ্ডের আয়কর-দাতাদের মধ্যে ইহারা শতকরা নয় ভাগের মত, এবং ইহাদের গড়পড়তা বার্ষিক আয় প্রায় ২২,০০০ পাউণ্ড বা প্রায় তিন লক্ষ টাকার কাছাকাছি।

ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কগুলির আলোচনা করিবার সময় প্রথমেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নাম করিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বড় নূতন ব্যাঙ্ক, ১৯৩৪ সনে ৫ কোটি টাকার পুঁজি লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা ;—বলিতে গেলে ইহাকে ভারতবর্ষের সরকারী ব্যাঙ্ক বলিয়াই ধরা হয়, ইহার সর্বোচ্চ পদাধিকারীকে ভারত সরকার স্বয়ং মনোনীত করেন ;—কিন্তু খোঁজ লইলে দেখা যায়, ইহাতেও বিলাতী পুঁজির বহরই বেশি, বিলাতী পুঁজি পাহারা দেওয়ায় বিলাতের সরকার যতটা উদ্যোগী, ভারত সরকার তাহা অপেক্ষা কিছু মাত্র কম উদ্যোগী নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পর ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে পাঁচ বড় হইল—

		স্থাপনা	প্রাপ্ত পুঁজি (টাকা)
(১)	ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক	১৯২১	৫৬২ লক্ষ (১৯২৭ এর হিসাব)
(২)	সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	১৯১১	১৬৮ লক্ষ
(৩)	এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক	১৮৬৫	(১৯৩১-৩৬এর হিসাব)
(৪)	ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	১৯০৬	
(৫)	ব্যাঙ্ক অব বরোদা		

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মত সরকারী ব্যাঙ্কই ছিল, অর্থাৎ উহার উপরও বিলাতী পুঁজির আধিপত্য ছিল অধিক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের পর বেসরকারী ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সর্বাপেক্ষা বড়-- স্যার সোরাবজী পোছনাবালা ইহার প্রতিষ্ঠাতা, বিদেশী পুঁজির ধাক্কার মুখে তিনিই ইহাকে বাঁচাইয়া রাখেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পর পাঁচ বড় ব্যাঙ্ক বাদ দিয়া ষষ্ঠ ব্যাঙ্ক হইল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা লালা লাজপৎ রায় ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অবশ্য বড় ব্যাঙ্ক ছাড়া বহু ছোট ব্যাঙ্ক এবং প্রাইভেট ব্যাঙ্কও ভারতবর্ষে আছে ; ইহাদের মধ্যে যেগুলি বেশী ছোট সেইগুলি যেমন আকস্মিক ভাবে গজায়, ঠিক তেমনি আকস্মিকতার সঙ্গেই মরিয়া যায়— কোন কোনটি বড় ব্যাঙ্কের উদরগত হইয়া কোনরূপে টিকিয়া থাকে। অন্য দেশের ব্যাঙ্কের কারবারে আমরা দেখিয়াছি, ব্যাঙ্কের মালিক খনিরও মালিক, কারখানারও মালিক—বিভিন্ন বীমা, জাহাজ, রেলওয়ে কোম্পানীতে ইহাদের পুঁজি ন্যস্ত আছে—কারণ, ইহা ছাড়া মুনাফার ব্যাপারে ইজারাদারী সম্ভব

হয়না, পুঁজির নিরাপত্তা এবং প্রতিযোগিতায় পুঁজিকে ঘাতসহ করাও নতুবা অসম্ভব হয়। তাই ভারতীয় পুঁজির বড় মাছ, শ্রীবিড়লা প্রভৃতিকেও আমরা একাধিক উদ্যোগে পুঁজি ন্যস্ত করিতে দেখিতেছি—পাটের সঙ্গে চিনি, চিনির সঙ্গে কাপড়, তার উপর বীমা, ব্যাঙ্ক, সকল দিকেই তাহাদের সমান উৎসাহ, সমান উদ্যোগ। শ্রীডালমিয়াজীকেও তাই সিমেণ্ট, চিনি ও কাগজের কারবারের উপরও আবার 'ভারত বীমা কোম্পানী' খুলিয়া বসিতে হয়। হুকুমচন্দ এবং অন্যান্য পুঁজিপতির বেলায়ও ব্যাপার অনুরূপ নয়—উঁহারাও একাধিক উদ্যোগে পুঁজি পরিবেশন করিয়া পিছন হইতে তাহার রাশ ধরিয়া বসিয়া আছে।

এখানে অবশ্য একটা কথা বলিতে হয়। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্য ভারতীয় পুঁজিপতি এতদিন তেমন হাত পা ছুঁড়িতে পারিত না। এখনও সরকার বিদেশী পুঁজির রক্ষক হওয়ায় তাহাদের তত সুবিধা হয় নাই। তবু ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক, বীমা ও অন্যান্য কোম্পানীর ডাইরেক্টরির সূচীটি খুলিয়া দেখুন উহাতে আমাদের পরিচিত রাষ্ট্রীয় নেতা, এসেম্ব্লি কৌন্সিলের সদস্যদের অভাব নাই—আর কোম্পানীর উচ্চ পদাধিকারীর মধ্যে ইঁহাদেরই শালাসম্বন্ধী আর জামাইবাবুরাও আছেন। য়ুরোপ আমেরিকায় রাজশক্তির সঙ্গে বণিক শক্তির বন্ধন অবশ্য আরও অনেক বেশি দৃঢ়। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের লর্ড সদস্যদের আপনি সদস্যদের আপনি সমস্ত বড় কারখানা, ব্যাঙ্ক ও রেলওয়ের অংশীদার দেখিতে পাইবেন। মিনিস্ট্রীতে ঢুকিবার সময় মিনিস্টার মহোদয়দিগকে সমস্ত ডাইরেক্টরী পদে ইস্তাফা দিয়া যাইবার নিয়ম আছে—কিন্তু তাহা হইলেও এই বিচ্ছেদ খুব বেশী দিনের নয় এবং খুব কার্যকরীও নয়। কোন কোম্পানী তাহার ডাইরেক্টরকে মিনিস্টার বানাইতে পারিলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়—কারণ কোম্পানী জানে, সোজা উপায়ে না হইলে বাঁকা উপায়ে, দেশে না হইলে বিদেশে, যেখানে যেভাবেই হউক না কেন ইনি, কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষা করিয়া আসিতে পারিবেন—তারপর দুই বছরের বিচ্ছেদ অবসানে ভূতপূর্ব মন্ত্রিত্বের খেতাব লইয়া ইনি আবার কোম্পানীর আসনই অলঙ্কৃত করিবেন। ইংলণ্ডে অর্থবিভাগের বড় কর্মচারীরা অবকাশ গ্রহণের পর প্রায়ই বড় বড় ব্যাঙ্কের উচ্চ পদাধিকারী বনিয়া যান। পেন্সনপ্রাপ্ত পুরাতন উচ্চপদস্থ সৈনিক বা সৈন্যাধ্যক্ষ এইভাবে গোলাবারুদ কারখানায় ডাইরেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। যুদ্ধের যুগে বাস করিয়া ইহার কারণ যে শুধু সরকারী কণ্ট্রাক্ট পাওয়া তাহা বুঝিতে আপনাদের বিলম্ব হইবে না।

বিলাতে গেস্ট, কীন ও নেটলফিল্ডের ১২০ লক্ষ পাউণ্ডের মিলিত পুঁজি কয়লা এবং লোহার ব্যবসায়ে খাটিতেছে। ইহার উপর আধিপত্য তখনকার মত চেম্বারলেন পরিবারের প্রায় একচেটিয়া ছিল বলা যায়। গেস্ট কীনের সঙ্গে আবার বলডুইনদের দক্ষিণ ওয়েলসের কারবারেরও তখন খুব নিকট সম্পর্ক ছিল। নেভিল চেম্বারলেনের বাপ জোসেফ চেম্বারলেন এই নেটলফিল্ড ও চেম্বারলেন যুগের কারবারের কর্তা ছিলেন। ইংলণ্ডে স্ক্রু-এর বাজারে ইঁহারা তখন রাজা ব্যক্তি, স্ক্রুর প্রায় সমগ্র উৎপাদনই তখন ইঁহাদের হাতে। ইহার পশ্চাতে সত্য কথাটি, অর্থাৎ জোসেফ চেম্বারলেন যে বুয়র যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের উপনিবেশমন্ত্রী ছিলেন, ইহা আপনাদের অবিদিত নাই। ১৯০০ ইংরেজীতে এই ব্যাপার লইয়া চেম্বারলেনদের বিরুদ্ধে একটা তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। চেম্বারলেনদের 'ইলিয়ট মেটাল এণ্ড টিউব লিমিটেড' সেকালে যুদ্ধের বড় ঠিকাদার। ইংলণ্ডে তখন একটা চল্‌তি কথা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল 'ব্রিটিশের রাজ্য বাড়ে চেম্বারলেনের ঠিকা বাড়ে'।

বলডুইনের মত নেভিল চেম্বারলেনও প্রথমত রাজনীতিক ছিলেন না, জীবনে তাঁহারা প্রথম ব্যাপারী হিসাবেই প্রবেশ লাভ করেন। ১৯২০ সন পর্যন্ত নেভিল চেম্বারলেন কীন্‌চ্‌ ওয়ার্কস অর্থাৎ পূর্বোক্ত ইলিয়ট মেটাল কোম্পানীর ডাইরেক্টর ছিলেন। ইম্পীরিয়াল কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রিস, বার্মিংহাম স্মল আর্মস্‌ লিমিটেড্‌, এবং নৌ-সৈন্য বিভাগীয় ঠিকাদার হোস্কিন এণ্ড সন্স প্রভৃতিতে তাঁহার ডাইরেক্টরের পদ ছিল। চেম্বারলেন ডাইরেক্টর থাকা কালে বার্মিংহাম স্মল আর্মস্‌ লিমিটেডের মুনাফা হইয়াছিল—

(সন)	(পাউণ্ড)
১৯১৩	১,৮৯,০০০
১৯১৫	৪,০৮,০০০
১৯১৮	৪,৩৫,০০০

১৯১৫ হইতে ১৯১৮ পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই কোম্পানী অংশীদারদের ২০% হারে মুনাফা দিয়াছিল। যুদ্ধোদ্যোগ থামিয়া যাইবার পর কোম্পানীর মুনাফার হারও কমিয়া যায়, ১৯৩৫এ স্মল আর্মস্‌ লিমিটেডের লাভ হয় শুধু ২,০০০ পাউণ্ড। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পুনরস্ত্রীকরণের ধাক্কায় চেম্বারলেনের স্মল আর্মস্‌ লিমিটেডের মুনাফা আবার ফাঁপিয়া উঠে; ১৯৩৯ সনে ইহার লাভ হইয়াছিল প্রথম মহাযুদ্ধ দিনের তুলনায়ও বেশি, প্রায়

সাড়ে চার লক্ষ পাউণ্ড। এই যুদ্ধসজ্জার যুগে ইংলণ্ডের আরও কয়েকটি অস্ত্র উৎপাদক কোম্পানীও মোটা লাভ করিয়াছিল। ১৯৩৫ সনে ইংলণ্ডের ১২টি বড় অস্ত্রনির্মাতা কোম্পানীর মোটা মুনাফা হইয়াছিল ১২,২০,০০০ পাউণ্ড; ১৯৩৮ সনে পৌছিয়া সেই মুনাফা হয় ৪১,৫০,০০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ পূর্বের মুনাফার সাড়ে তিনগুণ হইতেও বেশি। তাই চেম্বারলেন যখন রাষ্ট্রকল্যাণের ধূয়া তুলিয়া ইংলণ্ডের অস্ত্রীকরণের উপর জোর দিতেন তখন তাহা আত্মকল্যাণই বুঝাইত; এই কল্যাণ একান্তভাবে ইংলণ্ডের শতকরা ৯০ ভাগ ধনের অধিকারী শতকরা ৫ জন মাত্র ব্যক্তির কল্যাণ, ৯৫ জনের নহে। গত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরিয়া য়ুরোপের সরকারী লেনদেনের বহু বিষয় এখন সাধারণ লোকের গোচরে আসিয়াছে। রাজ্যের মন্ত্রী, অন্যান্য কর্তাব্যক্তি এবং পুঁজিপাতিদের এই সব যোগাযোগের কাহিনী বলিতে হইলে পৃথক গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া এ যাবত প্রকাশিত রহস্যও যে ইহার কত আছে তাহারও কোন সীমাসংখ্যা নাই। এখানে আরও মজার ব্যাপার এই যে, এই সব অপকর্মের অধিকাংশই কোন আইনের আওতায় পড়েনা—ইহার কারণ বৈক্তিক সম্পত্তির স্বামী শাসকের রাষ্ট্রের জন্য যে আইন গড়িয়াছে তাহা নিজের স্বার্থেই গড়িয়াছে।

(৫) **পুঁজির দেশান্তর**—বিক্ষিপ্ত পুঁজির কেন্দ্রীকরণ, ব্যাঙ্ক ও কারখানার মিলন, এই সব অবস্থার মধ্য দিয়া ইজারদারীর স্থাপনা হয়। ইজারাদরীর প্রাথমিক অবস্থায় পুঁজিপতি পশ্চাৎপদ দেশ হইতে কাঁচামাল লইয়া গিয়া সেখানে তৈয়ারী মাল পাঠাইত। এই সময় রেলওয়ে এবং অন্যান্য উদ্যোগের জন্য সেসব দেশে টাকা ঢালিতে পুঁজিপতিরা কসুর করিতনা—দেশের সমস্ত যানবাহন, উহার সকল নূতন শিল্পোদ্যোগ নিজের হাতে থাকিলে বাজারের মালিকানা আরও পাকা হয়। এইভাবে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর তাহারা নিজের দেশ হইতে পুঁজি আনিয়া বিদেশে কারখানা বসাইতে আরম্ভ করিল। ভারতবর্ষের কার্পাস দিয়া ভারতবর্ষেই কাপড় তৈয়ার হইলে বিলাত হইতে আনা-নেওয়ার খরচ বাঁচিয়া যায়। ইহা ছাড়া ইংলণ্ড শিল্পোন্নত দেশ, সেখানে মজুরকে রোজ তিন টাকা মজুরি দিতে হয়, এখানে আট আনাতেই চলে। এই জন্যই ইংরেজ পুঁজিপতিদিগকে আমরা কানপুর ও বোম্বাই-এ কাপড়ের কল খুলিতে এত তৎপর দেখিয়াছি। অবশ্য পরে বিশেষ করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে, ভারতীয় পুঁজিপতিও ইহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছে। পুঁজি বিদেশে চালান হইলে দেশী মজুর এবং শ্রমনির্ভর অন্যান্য

লোকের জীবিকা-নষ্ট হইয়া যায়—তাই বলিয়া পুঁজিপতি ইহার পরোয়া করেনা, পুঁজিপতির উদ্দেশ্যে মানুষের জীবিকা সংস্থান নয়—মজুরে শ্রমমূল্যের চুরি করা অংশ, মুনাফা বা অতিরিক্ত মূল্য—ইহাই পুঁজিপতির লক্ষ্য।

পুঁজিপতি কত বেগের সঙ্গে বিদেশে পুঁজি চালান দিতেছিল ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত লইলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারিব। ১৮০১ সনে ইংলণ্ডের বিদেশে ন্যস্ত পুঁজির পরিমাণ ছিল সোয়া শ' কোটি পাউণ্ড—ইহা হইতে বাৎসরিক মুনাফা হইয়াছিল ৫ কোটি পাউণ্ড; ১৯১৫ সনে উহাদের বহির্দেশে লগ্নি পুঁজির পরিমাণ হয় তিন শ' আশী কোটি পাউণ্ড, বার্ষিক মুনাফার হার তখন ২০ কোটি পাউণ্ডের মতন। ইংরেজী ১৯২৯ পৌঁছিয়া সমস্ত দেশান্তরী পুঁজি হইতে ইংলণ্ডের পুঁজিপতিদের মুনাফা হইয়াছিল মোট ৩০ কোটি পাউণ্ড। এই বিপুল বহির্গত পুঁজির অর্ধাংশই তখন ব্রিটিশের সাম্রাজ্য অন্তর্গত উপনিবেশগুলিতে ন্যস্ত হইয়াছিল। এই হিসাবে সাম্রাজ্যের অর্থ শুধু কাঁচামাল ও তৈয়ারী মালের কেনাবেচার জায়গা নয়—পুঁজিবাদী দেশের বিপুল দেশান্তরী পুঁজির অন্যতম নিয়োগক্ষেত্রেও সাম্রাজ্য। আমেরিকার অবশ্য ব্রিটিশের মত রাজনীতিক অর্থে সাম্রাজ্য বলিতে তেমন কিছু নাই—তাহা হইলেও আমেরিকার অর্থনীতিক সাম্রাজ্য, তার ডলারের সাম্রাজ্য, পৃথিবী বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে পাঁচ বৎসর মার্কিণী পুঁজির বহির্গমনের বেগ লক্ষ্য করিয়া দেখুন—

সন	কোটি ডলারের হিসাবে	কোটি টাকার হিসাবে
১৯২৩	২৬'৭	৭০'১
১৯২৪	৯৯'৭	২৯৯'১
১৯২৫	১০৮'৬	৩২৫'৮
১৯২৬	১১৪'৫	৩৪৩'৫
১৯২৭	১৫৬'৭	৪৭০'১

ভারতে পুঁজি চালান—ইংলণ্ড তাহার ব্যবসায়িক স্বার্থের জন্যই ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সওদাগরেরা এক জায়গার মাল অন্য জায়গায় লইয়া গিয়া লাভে বিক্রয় করিত। তারপর ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ দৌর্ব্বল্যের সুযোগ লইয়া ইহারা একদিন রাজশক্তি দখল করিয়া বসে। তখন ইহাকেও তাহারা ব্যাপারীর

দৃষ্টি লইয়াই দেখিয়াছিল—তখনকার বাংলার ইতিহাসে উহার প্রমাণ রহিয়াছে। কোম্পানীর শাসন সুরু হইবার পূর্ব বৎসর ১৮৬৪-৬৯ ইংরেজীতে বাংলার রাজস্ব ছিল ৮,১৮০০০ পাউণ্ড; কোম্পানীর শাসনের প্রথম বৎসরেই এই রাজস্ব ১৪,৭০,০০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ আগের পৌণে দুই গুণএর উপর হয়। ইহার পর হইতে কোম্পানীর শাসন সময় জুড়িয়া রাজস্বের হার শুধু ক্রমবৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে—

সন	পাউণ্ড
১৭৬৪-৬৫	৮,১৮,০০০
১৭৬৫-৬৬	১৪,৭০,০০০
১৭৯০-৯১	২৬,৮০,০০০
১৮২২-২৩	১,২৬,০০,০০০
১৮৫৭-৫৮	১,৭২,০০,০০০

ইহার অর্থ হইল কোম্পানীর শাসনের ৯৩ বৎসরের মধ্যে বাংলার রাজস্ব পূর্বাপেক্ষা বিশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা হইলে বিলাতী ব্যাপারীর সওদা, এই সময়টা অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে বলিতে পারি না। এই প্রচণ্ড ধনদোহনের ফলে কোম্পানীর রাজত্বের ছয় বৎসরের মধ্যেই দেশে এক ভীষণ আকাল আসিয়া গেল; ইহার ফলে বাংলার এক কোটি মানুষ লতাপাতা খাইয়া, না খাইয়া মরিয়া গেল। ১৭৭০ হইতে ১৯০০ সন পর্যন্ত এই ১৩০ বৎসরের মধ্যে, ভারতবর্ষে বাইশ বাইশটা প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ আসিয়াছে—ইহাতে গত তিন শতাব্দীতে পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধে যত লোক মরিয়াছে, তাহার চেয়ে অনেক বেশি লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহা হইল সামন্তবাদী ইংলণ্ডের ব্যাপারপ্রধান যুগের ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীতে সেখানে বাষ্পচালিত যন্ত্রের উপযোগ আরম্ভ হয়। কল কারখানা স্থাপনার ব্যাপারে ইংলণ্ড যে সকলের অগ্রণী ইহাতে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডের কারখানা বাড়াইবার এই বিপুল পুঁজি কোথা হইতে আসিয়াছিল? ইহার উত্তর পাইতে এখন আর আমাদের বেশি চিন্তা করিতে হইবে না—পূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মালগুজারী অর্থাৎ রাজস্ব সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিয়াছি—ইহার সঙ্গে ভেট ও লুঠ, এই দুইটি বিশেষ উপায়ের বর্ণনা হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসরে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ চার কোটি টাকা ইংলণ্ডে চালান দিত। ইহার সহিত ব্যক্তিগত দোহনের অঙ্ক যোগ করিলে তাহা

৫০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ কমপক্ষে সাত কোটি টাকা হইবার কথা। পুঁজি আহরণের এই সিংহদ্বারটি ক্রমে ক্রমে আরও প্রশস্তই হইয়াছে—এমন কি এখনও ইহাতে যে অর্গল পড়িয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পৌঁছিয়া কোম্পানীর পুঁজি প্রেরণের একটু হিসাব দেখুন—

সন	পাউণ্ড	টাকা
১৮৩৫—৩৯	৫৩,৪৭,০০০	৩,০০,০০,০০
১৮৫৫—৫৯	৭৭,৩০,০০০	১০,০০,০০,০০০

অবশ্য ইহা শুধু কোম্পানীর হিসাব, ব্যক্তিগত আদায় ওগুল ইহার বাহিরে।

এইভাবে পুঁজি চালানোর ফলে ব্যাপারবাদী ইংলণ্ড পুঁজিবাদী দেশে পরিণত হইয়া গেল। তাহার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া নূতন নূতন কারখানা বসিল, নূতন পুঁজিতে নূতন শিল্পোদ্যোগ আরম্ভ হইল; ইহাতে ভারতের কাঁচামাল নিবার প্রয়োজনীয়তা যে পরিমাণে বাড়িল, তৈয়ারী মাল নিবার প্রয়োজনীয়তা ঠিক সেই অনুপাতেই কমিয়া গেল—ইংলণ্ডের তৈয়ারী মালই তখন হইতে ভারতের বাজারে অধিক হইতে অধিকতর রপ্তানি হইতে লাগিল। নিম্নে কাপড়ের আমদানি রপ্তানির একটি হিসাব দেখুন—

সন	ভারত হইতে ব্রিটেনে (থান হিসাবে)	ব্রিটেন হইতে ভারতে (গজ হিসাবে)
১৮১৪	১২,৬৬,৬০৮	৮,১৮,২০৮
১৮২১	৫,৩৪,৪৯৫	১,৯১,৩৮,৭২৬
১৮২৮	৪,২২,৫০৪	৪,২৮,২২,০৭৭
১৮৩৫	৩,০৬,০৮৬	৫,১৭,৭৭,২৭৭

ইহার অর্থ এই যে, এই একুশ বৎসরে ভারত হইতে ব্রিটেনে কাপড় রপ্তানির পরিমাণ ¼ হইয়া যায়; এবং সেইস্থলে ব্রিটেন হইতে ভারতে আমদানির হার ৬০ গুণ হইতেও বেশি হয়।† উনিশ শতাব্দের মধ্যভাগে পৌঁছিয়া ভারতীয় তৈয়ারী মাল ইংলণ্ড যাওয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর হইতে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের পুঁজিপতিদের কাঁচামালের যোগানদার

† এই হিসাব রেশম-বস্ত্র ও পশম-বস্ত্র সম্পর্কে।

মাত্র হইয়া রহিয়াছে। নীচে ইংলণ্ডে প্রেরিত তুলা, পাট ও অন্যান্য কাঁচামালের কয়েক বৎসরের হিসাব দিলাম—

	তুলা	পাট	অন্যান্য
সন	(মূল্য পাউণ্ডে)	(মূল্য পাউণ্ডে)	(মূল্য পাউণ্ডে)
১৮৪৯	১৭,৭৫,৩০৯	৬৮,৭১৭	৮,৫৮,৬৯১
১৮৫৮	৪৩,০১,৭৬৮	৩,০৩,২৯২	৩৭,৯০,৩৭৪
১৯০১	১,০১,২৯,৭১৭	১,০৮,৭৭,৭৫৬	১,৪০,৬৯,৫০৯

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ পাদেও ইংলণ্ডীয় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের রূপ পরিগ্রহ করে নাই। তখন ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের জন্য কাঁচামাল উৎপন্ন করিত, আর তাহার তৈয়ারী মালের বাজার হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ইহার পর ইংলণ্ডের পুঁজিবাদ ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদের অভিমুখ হইয়া পড়ে; তখন তাহার ইজার দারীয় পুঁজির দৌলতে ভারতে নিত্যনূতন-কলকারখানার স্থাপনা হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতবর্ষে কাপড়ের কল কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল দেখুন—

সন	মিল	মিল ব্যবহৃত তাঁত	পুঁজি (কোটি টাকার অঙ্কে)
১৮৭৬		৯,১৩৯	
১৯১৩	১৭২	৯৪,১৩৬	
১৯৩২	৩৪০	১,৮৬,৪০৭	
১৯৩৪	৩৮০		৩৬.৩৬
১৯৩৮	৩৮৪		৩৭.৯০

ভারতবর্ষে কাপড়ের উৎপাদন ক্রমে ক্রমে কিরূপ বাড়িয়াছে তাহার নমুনা দেখুন—

সন	পরিমাণ (পাউণ্ডের ওজনে)
১৮৯৯	১০ কোটি ৪০ লক্ষ
১৯১৪	২৭ কোটি ৪০ লক্ষ
১৯৩১	৫৯ কোটি

সঙ্গে সঙ্গে জুট মিলগুলির এবং উহাদের উৎপাদনক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধির বেগও দেখুন—

সন	মিল	ব্যবহৃত তাঁত	ব্যবহৃত টাকু
১৮৭৬—৮০	২২	৪,৪৯৬	৭০,৮৪০
১৯১৩—১৪	৬৪	৩৬,০৫০	৭,৪৪,২৮৯

সন	মিল	ব্যবহৃত তাঁত	ব্যবহৃত টাকু
১৯৩০	১০০	৬১,৮৩৪	১২,২৪,৯৮২
১৯৩৫	১০০	৬৩,০০০	১২,৭৯,০০০
১৯৩৮	১০৫	৬৭,০০০	১৩,৩৮,০০০

এখন লোহার, কয়লার হিসাবটা একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লওয়া যায়। জামশেদপুরে টাটার কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল ইংরেজী ১৯০৭ সনে—১৯১৫ সনে 'স্টিল কর্পোরেশন অব্ বেঙ্গল' ইহার সঙ্গে মিলিত হয়—তদুপরি মহীশূরের ভদ্রাবতী লৌহ ইস্পাত কারখানাও ইহাদের সঙ্গে সংবদ্ধ ছিল। টাটার কারখানার উৎপাদন ছিল—

সন	কাঁচা লোহা (টনের ওজনে)	ইস্পাত (টনের ওজনে)
১৯১১	২,৪০,০০০	৭০,০০০
১৯৩০	১১,৪০,০০০	৬,১৬,০০০
১৯৩৯	১৮,৫৮,০০০	২৮,৭৮,০০০

আর কয়লার পরিমাণ ছিল—

সন	পরিমাণ (টনের ওজনে)
১৯১৩	১ কোটি ৬২ লক্ষ
১৯১৯	২ কোটি ২৬ লক্ষ
১৯২৯	২ কোটি ৩০ লক্ষ
১৯৩৯	২ কোটি ৭৭ লক্ষ

জুট মিলের মত কয়লার ব্যবসায়ও ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া ইংরেজ কোম্পানীগুলিরই একচেটিয়া। ১৯১৬ সনে ভারতবর্ষে বিলাতী পুঁজির পরিমাণ ছিল সাড়ে ছাব্বিশ কোটি পাউণ্ড—টাকার হিসাবে ইহার সংখ্যা পৌনে চারশত কোটি টাকার মত হয়; ১৯৩১-৩২ সনে ন্যস্ত বিলাতী পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় এগার শ' কোটি টাকা, অর্থাৎ পূর্ব সংখ্যার প্রায় তিনগুণ। ১৯৩৪ সনে ভারতবর্ষের কল-কারখানায় যে পুঁজি ন্যস্ত ছিল তাহার অর্ধেকই ইংরেজী পুঁজি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতবর্ষে ইংরেজী পুঁজি কি হারে বাড়িয়া গিয়াছে দেখুন—

সন	কোম্পানী	পুঁজি (কোটি পাউণ্ডে)
১৯২২-২৩	৭২০	৪৮'৭
১৯৩১-৩২	৯১১	৭৫'৬*

* ৭৫'৬ কোটি পাউণ্ড টাকার অঙ্কে এক হাজার কোটি টাকা হইতেও কিছু বেশি।

এই হাজার কোটি টাকার পুঁজি ১৯৩২ ৩৩ সনে যে সব কোম্পানীতে ন্যস্ত ছিল তাহার বিবরণ—

কোম্পানীর বিবরণ	কোম্পানীর সংখ্যা	ন্যস্ত পুঁজি (কোটি পাউণ্ডে)
ব্যাঙ্ক ও লগ্নি	২৯	৯ ৯৩
বীমা	১৪৩	৮'০৪
জাহাজ	১৮	৪'১৩
রেল	১৮	২'৪৮
ব্যাপার বাণিজ্য	৩৫৯	৩০'৯৮
চা	১৮০	২ ৮২
খনি	৩৪	১১'৩৪
জুট	৫	'২৮

একজন আমেরিকান অধ্যাপক ভারতবর্ষে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—*

"ভারতবর্ষের সার্বজনিক ঋণেরক অধিকাংশই ইংরেজ পুঁজিপতির হাতে; বর্তমানে ইহার পরিমাণ সাড়ে তিন শ' কোটি ডলারের× কম হইবে না। ভারতে যে ৫১৯৪টি বিদেশী কোম্পানী আছে, তাহারও অধিকাংশই হইতেছে ইংরেজ কোম্পানী—বিদেশী কোম্পানীর মোট পুঁজির পরিমাণ ভারতবর্ষে আড়াই শ' কোটি ডলারের মত; ইহা ছাড়া, ভারতবর্ষে সংগঠিত কোম্পানীর সংখ্যাও ৫১৬৪ হইবে, ইহাদের একত্রিত পুঁজির পরিমাণও একশত কোটি ডলার ছাড়াইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই বিরাট পুঁজির 'সিংহাংশ'ও ইংরেজ মালিকের করতলগত।

"ইহার সহিত ব্যাপার বাণিজ্যের মুনাফাটাও যোগ করা যাউক। ইংরেজ ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর এক শ' কোটি ডলারের মাল বিক্রয় করে। ইহা ইংলণ্ডের সারা নির্যাত ব্যাপারের এক-দশমাংশ হইবে। ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড মাল খরিদ করে বৎসরে প্রায় চল্লিশ কোটি ডলারের—কিন্তু ইহার দেখুন—াংশই কাঁচামাল, তবু ভারতের নির্যাত ব্যাপারের ইহা নয়-দশমাংশ।…"

সন mperialism and World Politics (Parker T. Moon—1933). p. 281.

১৮৭৮ই অর্থ এশিয়া ও আফ্রিকার যুদ্ধগুলিতে ইংরেজের স্বার্থরক্ষার জন্য খরচ করা গিয়াছে।

১৯. অর্থাৎ প্রায় সোয়া দুই হাজার কোটি টাকা।

"ইংলণ্ডের কাপড়ের মিলের মালিকরা ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে সাড়ে বাইশ কোটি ডলার মুনাফা করে। লোহা, ইস্পাত, মোটর, রেলওয়ে এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি হইতে বাৎসরিক মুনাফা হয় প্রায় দশ কোটি ডলার। ইহা ছাড়া, বারো কোটি ডলারের চা, কয়েক কোটি ডলারের জুট, কার্পাস, চামড়া বিলাতে পাঠাইবার ঠিকাদারও ইংরেজী কোম্পানী।..."

ব্যবসায় ও মুনাফার জন্য ইংরেজ কিভাবে রাজ্যবিস্তার করিয়াছে সেই সম্বন্ধে মুন বলিতেছেন—

"সিপাহী বিদ্রোহের* পর নিঃসন্তান রাজার রাজ্য দখলের রীতি বন্ধ হইয়া যায়। তাহা হইলেও সামন্ত রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া ভূমি দখল করা অব্যাহতই ছিল।

যেমন—

সন	ভূমি দখল (বর্গমাইল হিসাবে)
১৮৬১—৭১	৪,০০০
১৮৭১—৮১	১৫,০০০
১৮৮১—৯১	৯০,০০০
১৮৯১—১৯০১	১,৩৩,০০০

"১৯০২ সন হইতে ব্রিটিশের রাজ্যসীমা বৃদ্ধির চেষ্টা অনেকটা নূতনতর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।...মহারাজা, রাজা, নিজাম এবং অন্যান্য সামন্ত শাসক এতদিন ভগবানের প্রতিভূ হইয়া রাজ্য শাসন করিতেন। এখন ভগবানের দয়া বা তাঁহার প্রতিভূত্বের স্থলে ইংলণ্ডের দয়া ও ইংরেজের প্রতিভূত্বই বড় হইয়া উঠিল।"

"...প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ ইহাদিগকে তাহার রাজ্য শাসনের জন্য একটি পরম উপযোগী যন্ত্র হিসাবে পাইয়াছিল।...আজ এই কথা বলা চলে, ভারতবর্ষে সামন্ত শাসকদের নিরঙ্কুশ শাসন একান্তভাবে ইংরেজ-সহায়তার উপর নির্ভরশীল।"

"...১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদের নবোদিত যুগসূর্য ডিস্‌রেলি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 'ভারত সাম্রাজ্ঞী' উপাধি দিতে পার্লামেণ্টকে রাজী করান। ইহাতে ইংলণ্ডের রাণী যে প্রাচ্যখণ্ডের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দেশের স্বামিনী এই বিজ্ঞাপন প্রচার ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ১৯১১ সনে রাজা জর্জ

* ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ।

ও রাণী মেরীর ভারত আগমন এবং প্রাচ্য দেশীয় জবরজঙ্গিমার সহিত উঁহাদের অভিষেক একই উদ্দেশ্য বহন করে।—তবে ইহাকে সেই উদ্দেশ্যের আরও অগ্রবর্তী অবস্থা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। এই দরবার বা সিংহাসনারোহ উৎসবে যে চক্ষু ধাঁধানো ধূমধাম করা হইয়াছিল তাহার আরও একটি সুস্পষ্ট অর্থ আছে। ইহা দ্বারা ভারতীয়দিগকে দিল্লীশ্বর মুঘলের রাজ্যাধিকার যে তখন ইংলণ্ডের হাতে চলিয়া গিয়াছে তাহা বুঝান হইয়াছিল। কিন্তু পার্লামেণ্টারী শাসনের জন্মভূমি, রাজনীতিক স্বতন্ত্রতার কেন্দ্রস্থল, ইংলণ্ডের মত দেশও যে মৃতপ্রায় প্রাচ্য স্বেচ্ছাচারের বাহ্যরূপকে আবার পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবে, ইহা ১৯১১ সনের দিল্লীর দরবারের অনেক দর্শকের নিকটই যথোচিত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।"

ইংরেজ শাসকেরা নিজেদের ভারত হিতৈষণা সম্পর্কে নিত্য যে ঢেঁড়া পিটিয়া থাকেন সে সম্পর্কে মুন বলিতেছেন—

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বড় অভিমান যে গত মহাযুদ্ধে* ভারতবর্ষ ১৫ কোটি পাউণ্ড অর্থসাহায্য করিয়াছে, ৮ লক্ষ সিপাহী যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াছে, কাজ করিবার জন্য ৪ লক্ষের অধিক মজুর দিয়াছে—এই সবই সত্য কথা, এবং খুবই উল্লেখনীয় কথা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা হইলেও একেবারে দিশাহারা হইয়া ইহাকেই শেষ কথা মনে করিলে চলিবে না—কারণ, যুদ্ধের জন্য সকল লোকই ভারতের ফৌজী জাত ও ফৌজী শ্রেণী হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল, সহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইহার সহিত কোন যোগাযোগ ছিল না,—আর যে অর্থসাহায্য, তাহাও ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী-শাসন-কবলিত ভারতবর্ষ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল, ইহা ভুলিলেও চলিবে না।"...

"তবে কিছু কিছু দেশীয় রাজা মহারাজা যে যুদ্ধব্যয়ের জন্য মুক্তহাতে দান করিয়াছিলেন, ইহাও সত্য কথা। ইহার কারণ এ. জে. ম্যাকডোনাল্ডের ভাষায় বলা যাইতে পারে, 'ইহাদের স্বেচ্ছাচারী শাসনের অস্তিত্ব যে ব্রিটিশ আধিপত্যের উপর নির্ভরশীল তাহা ইহারা অনুভব করিতে পারিত'।"

পুঁজিবাদী ব্রিটেন ভারতবর্ষকে কিভাবে শোষণ করিত তাহার বর্ণনা শেষ করিবার সময় তাহার শাসন-ব্যয় সম্পর্কে একটু আলোচনা দরকার। কারণ, পূর্বে ভারতবর্ষের সঙ্গে যখনই কোন রূপ মীমাংসার প্রশ্ন উঠিয়াছে, তখনই ইংলণ্ডের আর্থিক স্বার্থ ও দেশীয় রাজরাজড়ার রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে ইংরেজ

* প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪—১৮)।

চাকর-নোকরের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারটাও সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। ১৮৭৬ হইতে ১৯২৯ পর্যন্ত ইংরেজের শাসন-ব্যয় এদেশে কিরূপ বাড়িয়াছে তাহার তালিকা দেখুন—

সন	ফৌজ জনসংখ্যার অনুপাতে মাথা-পিছু ব্যয় (টাকার হিসাবে)	সমজে-কল্যাণ জনসংখ্যার অনুপাতে মাথা-পিছু ব্যয় (টাকার হিসাবে)
১৮৭৬	১'৮	'২
১৮৮৬	২'১	'২
১৮৯৬	২'১	'২
১৯০৬	২'৫	'৩
১৯১২	২'৫	'৬
১৯২১	৪'৫	'৫
১৯২৯	৪'২	'৮

ভারতবর্ষের শাসন ও সৈন্যবিভাগের যত বড় বড় চাকর তাহার প্রায়ই ছিল ইংরেজ; ইহা ছাড়া সৈন্যবিভাগীয় জিনিসপত্রও প্রায় সমস্তই তখন ইংলণ্ড হইতে আসিত। এই অবস্থায় শাসন-ব্যয় ব্যাপারটি যে ব্যয় হইলেও পরোক্ষে আয়, এবং কাহার আয়, কাহাদের আয়, তাহা বোঝা কঠিন নয়।

(৪) **সাম্রাজ্যবাদের কারণ ও তাহার সহায়ক**—সাম্রাজ্যবাদ যে য়ুরোপে খুব তর্কবিতর্ক ও বিচারবিবেচনার পর গৃহীত হইয়াছিল এমন নহে। নানা আর্থিক কারণ এবং তাহার সহিত সম্পর্কিত রাজনৈতিক অবস্থাবলী মিলিয়া সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়।

(ক) **যন্ত্র**—যন্ত্রের আবিষ্কারে সমাজের উৎপাদন-উদ্যোগে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছিল, আর এই বিপ্লবকে প্রথম কাজে লাগাইয়াছিল ইংলণ্ড। অন্যান্য দেশের মানুষ তখনও হাতের শ্রমেই উৎপাদনের কাজ চালাইতেছিল, কিন্তু ইংলণ্ডে বাষ্প ও যন্ত্রের উপযোগ ততদিন পুরাপুরি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই কারণে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের যে সুবিধা ছিল, তাহা আর কাহারও ছিল না। অন্যান্য রাষ্ট্রে যন্ত্রের উপযোগ আরম্ভ হইতে বহু বিলম্ব হয়—ইহার কারণ অন্যদের ইংলণ্ডের মত পুঁজি ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংলণ্ডের শিল্পোদ্যোগ সারা পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ জুড়িয়া ছিল—এই বিপুল উৎপাদন-উদ্যোগের সম্মুখে অন্যদের ছোটখাট উদ্যোগ স্বভাবতঃই

খুব নগণ্য ও নিষ্প্রভ মনে হইত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড গোটা দুনিয়ার সমগ্র লৌহ-আহরণ-কাজের অর্ধেক একাই সম্পন্ন করিত। কার্পাস-জাত যে সব পণ্য তখন তৈয়ার হইত, তাহারও সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের অর্ধেক ইংলণ্ডেই উৎপন্ন হইত। ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্য তখনই পৃথিবীর যে-কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের দ্বিগুণ হইতে অধিক ছিল।—কিন্তু এই অবস্থা চিরদিন সমান রহিল না, উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বে অন্য রাষ্ট্রও মাথা তুলিল। জর্মনী, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র একে একে আসরে আসিল, য়ুরোপের অন্যান্য দেশও শিল্পোদ্যোগে মনোযোগী হইল। ইংলণ্ডের লোহার উৎপাদন তখন ধীরে ধীরে কমিয়া আসিল, শতাব্দী যাইতে না যাইতে লোহার বাজারের রাজা হইল যুক্তরাষ্ট্র। নিম্নের তালিকা হইতে ব্রিটেন, জর্মনী, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্যের কাঁচা লোহার উৎপাদন তুলনা করুন—

(লক্ষ টনের হিসাব)

সন	ব্রিটেন	যুক্তরাষ্ট্র	জর্মনী
১৮৭০	৫৯.৬০	১৬.৭০	১৩.৯০
১৮৯৬	৮৬.৬০	৮৬.২৩	৬২.৬০
১৮৯৭	৮৭.৯৬	৯৬.৫৩	৬৭.৬০
১৯০৩	৮৯.৩৫	১৮০.০৯	৯৮.৬০

অর্থাৎ, ১৮৭০ হইতে ১৯০৩ এই তেত্রিশ বৎসরে ইংলণ্ডের লৌহ উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র বাড়িয়াছে; কিন্তু জর্মনীর উৎপাদন বাড়িয়াছে শতকরা ৬০৯ ভাগ, এবং যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৯৬৬ ভাগ।

এইভাবে কাপড়ের বাজারেও আমেরিকা আর জাপান ব্রিটেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়ে। নিম্নের হিসাব হইতে কাপড়ের ব্যবসায়ের আনুপাতিক হ্রাস বুঝা যাইবে—

সন	ব্রিটেন	যুক্তরাষ্ট্র	য়ুরোপ
১৮৭০—৮০	১৯	৯০	৩৩
১৮৮০—৯০	১৮	৪২	৫৩
১৮৯০—১৯০০	৬	৫০	২৫

১৮৭০ হইতে ১৯০০ অব্দ পর্যন্ত এই ত্রিশ বৎসরে ইংলণ্ড তাহার রপ্তানি বাণিজ্যেও তেমন উন্নতি করিতে পারে না। আমেরিকার রপ্তানি এই সময়ে চতুর্গুণ হয়, জর্মনীর হয় দ্বিগুণ,—কিন্তু ব্রিটেনের মাত্র ৪৫%, অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম উন্নতি ঘটে।

এতক্ষণ আমরা ব্যাপারবাণিজ্যের যে সব লক্ষণ বর্ণনা করিলাম তাহার প্রত্যক্ষ ফল দাঁড়াইল পণ্যের বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক বড় বড় রাষ্ট্রই তখন উৎপাদন বাড়াইয়া নিজ নিজ ব্যবহারের অতিরিক্ত কাপড়, লোহা ও অন্যান্য পণ্য প্রস্তুত করিতেছে। ইহাতে প্রত্যেকের নিকট অতিরিক্ত মাল যেমন জমিয়া যাইতেছে, তাহাকে বহির্বাজারে বিক্রয় করিবার তাগিদও বাড়িতেছে। কিন্তু কোন শিল্পোদ্যোগী রাষ্ট্রই তখন অন্যের উপজাত পণ্য নিজ রাষ্ট্রসীমার মধ্যে বিক্রীত হইতে দিতে চাহিতেছে না। একমাত্র ইংলণ্ড ছাড়া অন্য সকল দেশই এই অবস্থায় নিজ নিজ রাষ্ট্রসীমা ঘিরিয়া শুল্কের প্রাচীর তুলিয়া দিল—প্রতিযোগিতায় বিদেশী পণ্যের দর চড়াইয়া দিয়া তাহার বাজার মাটি করিবার ইহাই কৌশল। গৃহযুদ্ধের পর দেশের সদ্যোজাত শিল্পোদ্যোগকে রক্ষা করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক প্রবর্তন করে; তারপর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ১৮৯০ সনে, ১৮৯৩ সনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার উপর্যুপরি দুইবার তাহার শুল্কের হার আরও বাড়াইয়া দেন।

রুশদেশ আরও পূর্বে, ১৮৭৭ হইতেই বিদেশাগত পণ্যের উপর শুল্কের হার বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল। জর্মনীতে শুল্কবৃদ্ধি শুরু হইয়াছিল ১৮৭৯ সন হইতে, এবং গ্রীসে ১৮৮১ হইতে। য়ুরোপখণ্ডের অন্যান্য দেশেও তখন পূর্বেকার শুল্ক প্রাচীর আরও উঁচু করিয়া দেওয়া হইতেছে।

ফরাসী মহামন্ত্রী ফেরী ১৮৮৫ সনে এই অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"আমাদের মহাশিল্পোদ্যোগচেষ্টা আজ এমন পর্যায়ে পৌছিয়াছে যে, পণ্যের আর কোন অভাব নাই—এখন আমাদের অভাব শুধু বাজারের, নিত্য নূতন ক্রমবিস্তারশীল বাজারের,·· কিন্তু ঐদিকে জর্মনী তাহার সীমা ঘিরিয়া শুল্কের দেওয়াল উঁচু করিয়া দিয়াছে—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ক্রমেই কঠিন হইতে কঠিনতর শুল্কাবরোধ সৃষ্টি করিতেছে।..."

এইরূপ ক্রমঘন অন্ধকারে পুঁজিবাদীর একমাত্র আলোকস্তম্ভ ছিল তাহার উপনিবেশ, তাহার অধিকৃত দেশসমূহ অর্থাৎ কলোনি। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ফ্রেডরিক লগার্ড ১৮৯৩ সনে তাঁহার 'পূর্ব আফ্রিকার সাম্রাজ্যের উত্থান' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন—

"আমাদের নীতি হইল মুক্ত ব্যাপারের নীতি—তাই বাজার খুঁজিয়া বাহির করা ছাড়া আমাদের উপায় নাই।...বাণিজ্য-প্রতিরোধী শুল্ক ক্রমেই

আমাদের পুরাতন বাজার বন্ধ করিয়া দিতেছে। আমাদের মালের ক্রেতা অধীন দেশগুলিও এখন আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছে।…”

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে য়ুরোপ যে সাম্রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছিল তাহার মূল কারণ অতিরিক্ত মাল বিক্রয়ের জন্য বাজার দখল করা। কিন্তু এই ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার ফলে পৃথিবীতে ছোট-বড় সাম্রাজ্যগুলি কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে নিম্নের সূচী হইতে তাহা বুঝা যাইবে *—

সাম্রাজ্য	উপনিবেশসমূহ (হাজার বর্গমাইলে)			
	আফ্রিকা	এশিয়া	প্রশান্ত সাগর	আমেরি
ব্রিটিশ	৪২০৩	২১৬	৩২৭৯	৪০০৮
ফরাসী	৩৭৭৩	৩১৭	১০	৩৬
পোর্তুগীজ	৯২৭	৭	২	
বেলজিয়ন	৯৩১	৭		
যুক্তরাষ্ট্র	৩৭		১২২	৭৫২
ডাচ (হল্যাণ্ড)			৭৩৪	৫৫
ইতালিয়ন	৭৮০			
স্পেনিশ	১৩২			
জাপানী		৮৩	২৮	

উপরের সূচী হইতে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের অধিকৃত উপনিবেশগুলির মোট বর্গফল যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা হইল—

সাম্রাজ্য	উপনিবেশ (বর্গফল মাইল হিসাবে)
ব্রিটিশ	১,৩৬,১৬,০০০
ফরাসী	৬৪,০০,০০০
পোর্তুগীজ	৯,৩৬,০০০
বেলজিয়ন	৯,৩৭,০০০
যুক্তরাষ্ট্র	৯,১১,০০০
ডাচ (হল্যাণ্ড)	৭,৮৯,০০০
ইতালিয়ন	৭,৮০,০০০
স্পেনিশ	১,৩২,০০০
জাপানী	১,১৪,০০০

* [illegible]

এইভাবে বাজারের খোঁজে পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় তিন কোটি বর্গ-মাইল* স্থান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপনিবেশে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন উপনিবেশের জনসংখ্যা অর্থাৎ কত মানুষ সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধার শিকার হইয়াছে তাহাও বিচার করিয়া দেখিবার মত—

সাম্রাজ্য	উপনিবেশ সমূহ			
	(জনসংখ্যা লক্ষের অঙ্কে)			
	আফ্রিকা	এশিয়া	প্রশান্ত সাগর	আমেরিকা
ব্রিটিশ	৬৫০	৩৩৩০	৮০	১১০
ফরাসী	৩৫০	১৩০	—১০	—১০
ডাচ (হল্যাণ্ড)			৫০০	—১০
জাপানী		১৯০	৪০	
যুক্তরাষ্ট্র	১৫		১১৪	৯০
বেলজিয়ন	১১৫			
পোর্তুগীজ	৮০		—১০	—১০
ইতালিয়ন	১৯			
স্পেনিশ	১০			

উপনিবেশগুলির জনসংখ্যা একদৃষ্টিতে বুঝিবার জন্য উপরের তালিকার যোগফলটুকুও একবার দেখিয়া লওয়া দরকার—

সাম্রাজ্য	উপনিবেশে মোট জনসংখ্যা
ব্রিটিশ	৪১,৭০,০০,০০০
ফরাসী	৫,৯৯,০০,০০০
ডাচ (হল্যাণ্ড)	৫,০০,০০,০০০
জাপানী	২,৩০,০০,০০০
যুক্তরাষ্ট্র	২,২০,০০,০০০
বেলজিয়ন	১,১৫,০০,০০০
পোর্তুগীজ	৯০,০০,০০০
ইতালিয়ান	২০,০০,০০০
স্পেনিশ	১০,০০,০০০

* ২,৮৭,৪২,০০০ বর্গমাইল।

সাম্রাজ্যবিস্তারের গতি কিরূপ ছিল তাহা বুঝিবার জন্য ইংলণ্ডের উদাহরণটিকে আমরা বিশ্লেষণ করিতে পারি। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অধিকৃত উপনিবেশের পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ বর্গমাইল এবং তাহার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ কোটি—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ মাত্র ৪০ বৎসরের মধ্যে তাহা ৯৩ লক্ষ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া বিস্তার লাভ করে এবং জনসংখ্যা তখন ৩১ কোটির মত হয়। আজ* এই অবস্থার আরও পরিবর্তন হইয়াছে, এখন ইংলণ্ডের অধিকৃত দেশের বিস্তার ১৩৬ লক্ষ বর্গমাইল, আর তাহার লোকসংখ্যা পৌনে বিয়াল্লিশ কোটিরও বেশি। এইরূপ ফ্রান্সের সাম্রাজ্য-বিস্তারের বিবরণীতেও দেখি—

সন	ক্ষেত্রফল (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা
১৮৬০	২,০০,০০০	৩৪,০০,০০০
১৮৮০	৭,০০,০০০	৭৫,০০,০০০
১৯০০	৩৭,০০,০০০	৫,৬৪,০০,০০০
১৯১৮-এর পর	৬৪,০০,০০০	৫,৯০,০০,০০০

মহাযুদ্ধের পরও† পরাজিত রাষ্ট্রের উপনিবেশগুলি লইয়া যে 'বাঁদর বাঁট' হইয়াছিল তাহারও বড় ভাগ পাইয়াছিল ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। ইহার কিছু পূর্বে তুর্কী-অধিকৃত দেশের মধ্যে প্যালেস্টাইন ও ইরাক ইংরেজের এবং সিরিয়া ফরাসীর অধিকারে চলিয়া গিয়াছিল। আর অন্য বাঁটোয়ার সূচী নিম্নরূপ—

আফ্রিকা

দেশ	কাহার ভাগে পড়িল	ক্ষেত্রফল (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা
তোগোল্যাণ্ড	ব্রিটিশ	১২,৬০০	১,৮৫,০০০
	ফরাসী	২২,০০০	৭,৪৭,৯০০
কেমেরন	ব্রিটিশ	৩১,০০০	৫,৫০,০০০
	ফরাসী	১,৬৬,০০০	২৭,৭১,০০০
জর্মন পূর্ব আফ্রিকা	ব্রিটিশ	৩,৬৫,০০০	৪১,২৫,০০০
	বেলজিয়ন	২১,২৩৫	৩০,০০,০০০
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা		৩,২২,০০০	২২,৮০,০০০

* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের কথা। † প্রথম মহাযুদ্ধ।

(দক্ষিণ সাগর)

অঞ্চল	কাহার ভাগে পড়িল	ক্ষেত্রফল (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা
দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপ	জাপান	৮০০	৪২,০০০
নিউ গিনি	অস্ট্রেলিয়া	৮৯,০০০	৪,০০,০০০
পশ্চিম সেমোয়া	নিউজিল্যাণ্ড	১,২৫০	৩৮,০০০
নেরু দ্বীপ	ব্রিটিশ	১০	২,২০০

(খ) **যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা**—য়ুরোপীয় পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরিগ্রহ করার মধ্যে যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা একটি অন্যতম সহায়ক কারণ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে যানবাহনের খুব উন্নতি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াতপথেরও অশেষ বিস্তার ঘটে। অধিকৃত দেশের উপজ দ্রব্য, তাহার কাঁচামাল হইতে লাভবান হইতে হইলে বাষ্পীয় পোতের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়; অপরদিকে এশিয়া আফ্রিকার দূরতম অঞ্চলগুলিতে মাল ও সেনা পৌছাইতে হইলে রেলপথ ছাড়াও চলে না; ইহার উপর অধিকৃত দেশের সঙ্গে অধিকারী দেশের সংবাদ আদান-প্রদানের শীঘ্রতার জন্য তারের দরকার পড়ে। এই রেলইঞ্জিন, তার, বাষ্পীয় পোত সবই অবশ্য বহু পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম পাদে ইহার যেরূপ বিস্তার ঘটে পূর্বে আর কখনও তেমন হয় নাই। নিম্নের সূচী হইতে আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিব—

সন	রেলপথ (বিস্তার হাজার মাইলে)	তার (বিস্তার হাজার মাইলে)	বাষ্পপোত (জাহাজের শতকরা হারে)
১৮৫০	২৪	৫	...
১৮৭৩	...	...	২৫
১৮৮০	২২৪	৪৪০	...
১৮৯০	...	...	৫৯
১৯০০	৫০০	১১৮০	৭৭

(গ) **কাঁচামালের চাহিদা**—পৃথিবীর গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলি হইতে কাঁচামাল সংগ্রহের তাগিদ সাম্রাজ্যবাদের আর একটি সহায়ক কারণ। ভারতবর্ষ হইতে কাঁচামাল রপ্তানির পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছিল তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এক সময় লম্বা আঁশের

কার্পাসের জন্য ইংলণ্ড সম্পূর্ণতঃ আমেরিকার উপরই নির্ভরশীল ছিল, কিন্ত আমেরিকা নিজ স্থতী কাপড় তৈয়ার আরম্ভ করিলে মিশরী কার্পাসের মান হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মিশরে কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছিল ৩৪৮ হাজার মণ— ইহার পঁচিশ বৎসর পরে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার পরিমাণ পূর্বেকার নয়গুণ হয়। কাঁচামালের মধ্যে রবার, কোকো, চা, চিনি, নারিকেল ইত্যাদিরও প্রচুর চাহিদা ছিল—কঙ্গো, মালয়, জাভা, সিংহল ও অন্যান্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপের পরাধীনতার ইহাই কারণ। প্রবাদ আছে, হরিণী তাহার নিজের মাংসের জন্য জগতের বৈরী হয়, সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশগুলির সম্পর্কে চিন্তা করিলে এই বৈরিতার স্বরূপ বুঝিতে পারি। ফ্রান্স যে উত্তর আফ্রিকার উপনিবেশগুলি আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে, তাহার কারণ সেখানকার খনিজাত ফসফেট; চীনের দক্ষিণ অঞ্চলের উপর অধিকার বিস্তার করিয়া রাখার কারণ সেখানকার টিন ছাড়া আর কিছু নয়; ট্রান্সভালের খনিগর্ভে যে সোনা আছে, তাহার লোভই ব্রিটিশকে সেই রাজ্যজয়ে উৎসাহী করিয়াছে। চীনের কার্পাস, লোহা ও কয়লা সাম্রাজ্যবাদী জাপানকে লুব্ধ ও হিংস্র করিয়া তুলিয়াছিল। আন্তর্জাতিক লুব্ধতার আর একটি অত্যাধুনিক বস্তু তেল। তেল কাঁচামালের বড় মাল; আধুনিক যুদ্ধে-বিগ্রহে-শিল্পে-যাতায়াতে সব কাজেই তেলের প্রয়োজন, তাই ইহা লইয়া অন্তর্রাষ্ট্রীয় ঝগড়ার অন্ত নাই; মোসেল, ইরাণ ও বর্মার তেলের খাত নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত এই লোভের নিবৃত্তি হইবে না; বিশেষত আত্মরক্ষায় অসমর্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ বলিয়া ইহারা আন্তর্জাতিক দলাদলির কেন্দ্রভূমি হইয়া থাকিবে।

(ঘ) **পুঁজির বহির্গমন**—পুঁজিবাদের একটি বিশেষ স্তরে পৌঁছিয়া পুঁজি কিভাবে বিদেশে চালান হয় তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। পুঁজির এই বহির্গমন, তাহার দেশান্তরী হওয়া, সাম্রাজ্যবাদের লক্ষণ, তাহার সহায়ক এবং অন্যতম কারণ। লেনিন সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশের পরস্পর-সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত প্রতিযোগিতায় কলোনি-ই ইজারাদারীর ভবিষ্যৎ সফলতার গ্যারান্টি।...পুঁজিবাদ যত বিকাশ লাভ করে ততই কাঁচামালের চাহিদা বাড়ে, প্রতিযোগিতা যত শক্ত হয় কাঁচামালের তালাশও তত ব্যাপক হয়, আর ততই কলোনি দখলের সংঘর্ষও প্রখর হইয়া উঠে।"

পুঁজিবাদীরা ইজারাদারী ও সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কারণ দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে, শুল্ক বাঁচান, বাজার দখল বা

কাঁচামালের উপর অধিকার, সবই কলোনি দখলের গৌণ কারণ; মুখ্য কারণ নিম্ন জাতির উপর উচ্চ জাতির যে অধিকার ও কর্তব্য, তাহা রক্ষা করা ও পালন করা। ফ্রান্সকে আফ্রিকা হইতে দাসপ্রথা দূর করিতে হইবে, ইংরেজকে ভারতে সতীদাহ নিরোধ করিতে হইবে। ভগবান যে স্বয়ং এই মহৎ কর্তব্য তাহাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী কবির অভিমত *—

"শ্বেত মানুষের দায়িত্ব লও তুলে
পাঠাও দূরে বীর ছেলেদের আজ;
নির্বাসনে সাত সাগরের কূলে—
সাধতে হবে বন্দীজনার কাজ।
থাকবে সেথা বর্ম সদাই পরা,
মানুষ হোথা অধীর ভয়ঙ্কর—
নূতন-বাঁধা ক্ষুব্ধ পশু ওরা,
আধা মানুষ আধেক বর্বর।"†

কিন্তু কিপলিঙ কবিতা লিখিয়া পুঁজিবাদী উচ্চ আদর্শের ঢেঁড়া পিটিলেও ব্যাপার অন্য রূপ। ১৯২০—২২-এর মধ্যে ইংলণ্ড ভারতের বাজারে কি পরিমাণ মাল বেচিয়াছে তাহা একবার দেখুন—

তৈয়ারী মাল	পাউণ্ডে মূল্য
সূতা, কাপড়	৫৩,৩৫,৭৭,০০০
লোহা, ইস্পাত, ইঞ্জিন, মেসিন	৩,৭৪,২৩,০০০
গাড়ী, লরী, মোটর	৪২,৭৪,০০০
কাগজ	১৮,৫৮,০০০
পিতল, কাঁসার দ্রব্য	১৮,১৩,০০০
পশমী কাপড়, পশম	১৬,০০,০০০
তামাক, সিগারেট ইত্যাদি	১০,৬০,০০০
অন্যান্য	১০,২৬,০০০
	৫৮,২৬,২৮,০০০

(অর্থাৎ প্রায় আট শত কোটি টাকা।)

---

* কিপলিঙ ১৮৯৯ সনে এই কবিতা লেখেন।

† "Take up the white man's burden
Send forth the best ye breed
Go bind your sons to exile
To serve your captive's need;
To wait in havy harness
On fluttered folk and wild
Your new caught, sullen peoples
Half devil and half child."

কাঁচা ও তৈয়ারী মালের ব্যাপারী, শস্ত্রব্যবসায়ী এবং ব্যাঙ্কওয়ালা প্রত্যেকেই সাম্রাজ্যবাদী মুনাফার সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কিন্তু লুটেরা জানে, সেই লুট-করা মাল দশে মিলিয়া বাঁটিয়া খাইলে উহাতে নিরাপত্তা বেশি, এবং লাভও বেশি। তাই দ্বিতীয় উইলিয়ম, দ্বিতীয় নিকোলাস বা লো বেঙ্গুলার মত রাজাদিগকে ব্যাপারীরা উহাদের কারবারে সামিল করিয়া লয়। রাজবংশীয় ডিউক এবং দেশের মন্ত্রী-মহামন্ত্রীর আত্মীয়কুটুম্বগণ সর্বদাই অধিকৃত কলোনির রেল, জাহাজ ও অন্য ব্যবসায়ে সরিক থাকে। কোন রাষ্ট্রপতির শালাসম্বন্ধী বা বন্ধুইকে মেক্সিকোর তেলের ব্যবসায়ে সামিল করিতে না পারিলে ব্যাপারীর মুনাফা সুরক্ষিত থাকে না। রাজা লো বেঙ্গুলার রাজ্যে* রোড্স কোম্পানীর অধিকার স্বীকার করিতে মহামন্ত্রী লর্ড সেলিসবেরী ঘোর আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু রোড্স যখন ফাইফ ও এবেরকোর্নের ডিউককে কোম্পানীর সভাপতি ও উপসভাপতি করিয়া দিলেন তখন সব চুকিয়া গেল। এই সেসিল রোড্স দক্ষিণ আফ্রিকার হীরার রাজা এবং ইংরেজ মহা-পুঁজিপতিদের প্রধান পাঁচজনের অন্যতম ছিলেন। এক সময় রোড্স পার্লামেণ্টের উদারনীতিক দলের অর্থকোষে যে অমিত অর্থ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, উহার কারণ মিশরে ব্যবসায়িক নিরাপত্তা। রোড্স পরে আমাদের হিন্দুস্থান টাইম্‌সের মালিকদের মত একটি প্রতিষ্ঠাশালী সংবাদপত্রও খরিদ করিয়াছিলেন। ইহাতে সাধারণভাবে পুঁজিবাদের জয়গান এবং বিশেষ ভাবে রোড্সের প্রভু, অর্থাৎ পার্লামেণ্টের ক্ষমতারূঢ় দলের স্তাবকতা চলিত। রোড্স হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, এবং বড় বড় গ্রন্থাগারে যে দান করেন তাহাও তাঁহার ব্যবসায়েরই অঙ্গ, উহারই বিজ্ঞাপনবাজী।

পুঁজিপতি তাহার শোষণের মহাযন্ত্রটি পরিচালনার জন্য সমাজের উচ্চস্তর হইতে বহু রকমের লোককে সামিল করিয়া লইয়াছে—

(১) সৈন্যদলের উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি, পেন্সনার প্রভৃতি পুঁজিবাদী শোষণ-ব্যবস্থায় কিভাবে সহায় হইয়াছে তাহা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। শস্ত্রব্যবসায়ীর মুনাফার জন্য সৈন্যবাহিনীর বিস্তার, সৈনিক খাতে মোটা ব্যয় এবং নিয়ত যুদ্ধাবস্থা জীয়াইয়া রাখা উহাদের সাহায্য ছাড়া হয় না।

(২) সেইরূপ বড় বড় রাজদূত, কলোনীর বড় চাকর, বড় বড় হোমরা চোমরা সকলেই নিজ স্বার্থে পুঁজিপতির অনুগত। কারণ কলোনিতে

* বর্তমানে রোডেশিয়া।

পুঁজিপতির কারবার ও তাহার মুনাফার উপরই ইঁহাদের জীবিকা, বেতন, পেন্সন, সমুদয় নির্ভর করে।

(৩) লর্ড বংশের মেজকুমার ছোটকুমাররা বিলাতে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন না, তাই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বা স্বয়ং পুঁজিপতিকে তাঁহাদের অন্নদাতা সাজিতে হয়। পার্লামেণ্ট ভবনের সুউচ্চ পদ, পাদরি-গিরি, জল-স্থল ও বায়ুসেবনের অধ্যক্ষতা, এইসব ছাড়াও পুঁজিপতির অধীনে কলোনিতে ইঁহাদিগকে কাজ করিতে হয়।

(৪) উচ্চ পদাধিকারী সৈনিক, রাজবংশীয় ডিউক এবং লর্ডদের মেজকুমার ছোটকুমার ছাড়া পাদরি-পোষণেও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের স্বার্থ আছে। উনিশ শতকে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, বিশেষত য়ুরোপ আমেরিকায়, ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। তখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সহায়তায় খ্রীষ্ট ধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং অসংখ্য খ্রীষ্টীয় মিশনের প্রতিষ্ঠা ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মিশনারিরা যখনই যেখানে গিয়াছে, তখনই প্রচার করা হইয়াছে যে, তাহারা সেখানে স্বর্গ-রাজ্য স্থাপন করিতেই উপস্থিত হইয়াছে—কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক স্থলেই স্বর্গ-সাম্রাজ্য স্থাপনার চেয়ে পার্থিব সাম্রাজ্য স্থাপনের দিকেই খ্রীষ্টীয় যাজককুলের মনোযোগ অধিক ছিল। ইঁহাদের মধ্যে যে কয়েকজন মহাপ্রাণ মানুষ ছিলেন, তাঁহারা জ্ঞাতসারে নহে কিন্তু অজ্ঞাতসারে সাম্রাজ্যবাদেরই সহায়তা করিয়াছেন। দুইজন মিশনারি নিহত হওয়ায় জর্মন সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের একটি বড় বন্দর ও একটি পোতাশ্রয় দখল করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছিল।

(৫) এইভাবে অভিযাত্রী এবং ভৌগোলিক বিজ্ঞানিক গবেষকের দলও, শুধুমাত্র মানুষের অভিজ্ঞতার সীমাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদীর সাম্রাজ্যসীমা বিস্তারেও পরম সহায়ক হইয়াছিল। পাদরিদের মত ইহারাও সর্বত্র জ্ঞাত-সারে জানিয়া শুনিয়া ও বুঝিয়া সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক হয় নাই, অনেক স্থলে তাহাদের স্বেচ্ছাকৃত আবিষ্কারে সাম্রাজ্যবাদ উপকৃত হইয়াছে, এবং কোন কোন স্থলে সাম্রাজ্যবাদের উপকার করিবার জন্যই ইহারা আবিষ্কারে উদ্যোগী হইয়াছে। কিন্তু যেভাবেই হউক, সকল ভাবেই সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক বলিয়া; পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং পুঁজিপতিরা ইহাদিগকে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করিয়াছে। ভৌগোলিক গবেষক হেনরি মোর্টন স্টেনলি ১৮৭৪—৭৭ অব্দে আফ্রিকার অজ্ঞাত দেশসমূহে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্টেনলির এই দেশযাত্রার ফলে শুধু ভূগোল-জ্ঞানের প্রসার হইয়াছিল ইহা মনে করিলে

ভুল হইবে। স্টেনলির সহায়তা না হইলে কাঁচামালবহুল কাঙ্গো কোন দিনই সাম্রাজ্যবাদী বেলজিয়মের পদানত হইতে পারিত না। অবশ্য, কাঙ্গো আবিষ্কার করিয়া স্টেনলি প্রথমত তাঁহার আপন জন্মভূমি ইংলণ্ডকেই উহা উপহার দিতে গিয়াছিলেন—কিন্তু ইংলণ্ড স্টেনলির কথায় কর্ণপাত না করায় শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে বেলজিয়মের রাজা লিউপোল্ডের দ্বারস্থ হইতে হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাঞ্চেস্টারের ব্যবসায়ীদের নিকট এক চমকপ্রদ বক্তৃতা দিয়া স্টেনলি তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—

"কাঙ্গোর মোহনার পারের চার কোটি দিগম্বর মানুষকে কাপড় পরাইবার জন্য ম্যাঞ্চেস্টারের তাঁতীরা আজ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। বার্মিংহামের ধাতুচুল্লীতে ফুটন্ত উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধাতু আজ ঐ মানুষদের জন্য লৌহকারখানা স্থাপনার আগ্রহ যোগাইতেছে। কাঙ্গোপারের কাঁচের মোতী, সেখানকার রক্তিম চুণী, আফ্রিকার কৃষ্ণকণ্ঠিদের অলঙ্কার হইবার জন্য আজ আমাদেরই অপেক্ষা করিতেছে। আর ঐ দুর্ভাগ্য নির্ধন কাফেরের দেশ খ্রীষ্টের মহান ধর্ম গ্রহণের ইচ্ছায় আমাদের মিশনারিদের দিকে পরমাগ্রহে তাকাইয়া রহিয়াছে।"…

(৫) **অন্তর্রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষ**—সাম্রাজ্যবাদের সূত্রপাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করিবার জন্য পৃথিবীর বিভাজন সুরু হইয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে কোন কোন অঞ্চল, যাহা এতদিন সাম্রাজ্যবাদীর অধিকারের বাহিরে ছিল, তাহাও প্রথম মহাযুদ্ধের পর কোন-না-কোন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। এইবার সাম্রাজ্যবাদীদের নূতন করিয়া লুণ্ঠন করিবার মত, অধিকার করিবার মত আর কোন ভূমি পৃথিবীর বুকে অবশিষ্ট রহিল না। কিন্তু পৃথিবীর বিভাজন একবার সমাপ্ত হইলেও ইজারাদারীয় পুঁজিবাদের বাজার ও কাঁচামালের প্রয়োজনে পৃথিবীর পুনর্বিভাজনের প্রয়োজন পড়িল।

"সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের প্রয়োজন মিটিয়া যাইতে পারে না, কারণ যুদ্ধের দ্বারাই পৃথিবীর নববিভাজন নিষ্পন্ন হয়—নূতন বাজার ও কাঁচামাল পাইবার একমাত্র উপায় যুদ্ধ, যুদ্ধই পৃথিবীতে পুঁজি নিয়োগের নূতন ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।"*

* ম্যাঞ্চেস্টার ব্যাপার মণ্ডল কর্তৃক ১৮৮৪ সনে প্রকাশিত পুস্তিকা।

৫। সাম্রাজ্যবাদী যুগ

(১) প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ (১৯১৪—১৮)

(ক) যুদ্ধের কারণ—১৯১৪—১৮ সনের মহাযুদ্ধ এইরূপ পুনর্বিভাজনের জন্যই বাধিয়াছিল। শুধু ফ্রান্স বা ব্রিটেনই কেন, ক্ষুদে রাজ্য হল্যাণ্ড, বেলজিয়মও যখন পৃথিবীর জলস্থলভাগের উপর বিস্তীর্ণ অধিকার স্থাপন করিয়া বসিতেছিল, তখনও জর্মনী ঘুমাইয়াই ছিল। ১৮৬৬—৭০ অব্দে জর্মনী এক রাষ্ট্রকর্তৃত্বাধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়; ইহাতে তাহার ব্যবসায় ও শিল্পোদ্যোগের উন্নতি ঘটে; সঙ্গে সঙ্গে বাজার এবং কাঁচামালের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু চারিদিকেই জর্মনী তখন সীমাবন্দী—শুল্কের প্রাচীরে তাহার বাণিজ্য প্রতিহত। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিল্পক্ষেত্রে তাহার যে শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল, বাজার আর কাঁচামালের অভাবে তাহা মাটি হইবার উপক্রম হইল। তাই যুদ্ধ ছাড়া জর্মনীর আর গতি ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়া জর্মনী এইজন্যই পৃথিবীকে পুনর্বিভাজিত করিতে চাহিয়াছিল—তাহার উপর সংগঠিত যে ইজারাদারীয় অন্যায়, উহা হইতে মুক্তিলাভই জর্মনীর দিক হইতে যুদ্ধের উদ্দেশ্য।

অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও সহায়ক শক্তিবর্গের সহিত জর্মনীর কখনও প্রীতির সম্পর্ক ছিল না; জর্মনীর ব্যাপারবাণিজ্যের উত্তরোত্তর স্ফীতিতে ইহারা ক্রমেই শঙ্কিত, আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু শুল্কের বাধা খাড়া করিয়া জর্মনীর বাণিজ্যকে তখন আর সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা চলিতেছে না; জর্মনীর পণ্য ক্রমেই দেশে দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে, আর পরিমাণে না হইলেও গুণে এবং মূল্যের ন্যূনতায় ইংরেজ পুঁজিপতির মুনাফাকে আঘাত করিতেছে; ইহা ছাড়া রঙ, ঔষধ ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যাপারে জর্মনী দেখিতে দেখিতে ইজারাদারী প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিল; এই অবস্থান্তর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার সহায়ক রাষ্ট্রগুলির কাছে স্বভাবতঃই ভাল ঠেকিল না; তাই তাহারাও ক্রমে ক্রমে একটা যুদ্ধ অর্থাৎ ভাবী মহাযুদ্ধের জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এইভাবে জর্মনী এবং ব্রিটেন-ফ্রান্সে নিজ নিজ ইজারাদারী বিস্তারের জন্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে জর্মনীর পরাজয় ঘটে, এবং তাহার পূর্বেকার সামান্য উপনিবেশ, তাহাও ব্রিটেন, গ্রীস ও জাপান ভাগাভাগি করিয়া লয়; এমনকি,

মূল য়ুরোপের প্রায় ছিয়াত্তর হাজার বর্গ-কিলোমিটার জমি হইতে জর্মনীকে হাত ধুইয়া আসিতে হয়।

(খ) **ধনজনের হানি**—পৃথিবীর যে পুনর্বিভাজনের জন্য মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা হইল না ; বরং পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী বিরোধ এখন আরও পাকিয়া উঠিল। গত মহাযুদ্ধে জাপানের যে লাভ হইয়াছিল তাহা খুবই সামান্য—প্রশান্ত মহাসাগরের দুই-একটা ছোট দ্বীপ দিয়া পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাকে হটাইয়া দিয়াছিল। তাই জাপানের পক্ষে ভবিষ্যতে ব্রিটিশের তাঁবেদার হইয়া থাকা আর সম্ভব হইল না—য়ুরোপে ইতালীর অবস্থাও ঐরূপ, নূতন বাঁটোয়ারাতে ইতালীরও কোন লাভ হয় নাই। অবস্থাটা অবশ্য সকল রাষ্ট্রই উপলব্ধি করিতে পারিল, সকলেই বুঝিল পৃথিবীর পুনর্বিভাজন-চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তাই ভিতরে ভিতরে আবার নূতন যুদ্ধের মহড়া পড়িয়া গেল। পূর্বেকার যুদ্ধও যে হঠাৎ একদিন দিনক্ষণ দেখিয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল তাহা নহে। নিম্নে ১৮৮০ সন হইতে ১৯১৩ সন পর্যন্ত ইহার এই প্রস্তুতির হিসাব দেওয়া হইল—

(যুদ্ধব্যয় লক্ষ পাউণ্ডে)

	১৮৮০—৮৩	১৮৯০—৯৩	১৯০৯—১৩
জর্মনী	২২৫	৩১৫	৬ ৭
ব্রিটেন	২৭৩	৩৭০	৫৩৪
ফ্রান্স	৩২৮	৩০৩	৪২০
ইতালী	১২০	১৩০	২০৯
জারীয় রাশিয়া	২৪৯	৩৪২	৫৩১

উপরের সূচী হইতে পুঁজিবাদ ইজারাদারী বা সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইবার পর যুদ্ধব্যয় কি হারে বাড়িয়া গিয়াছিল তাহা বুঝা যায়। ১৮৮০—৮৩ হইতে ১৯০০—১৪ পর্যন্ত ৪০ বৎসর সময়ের মধ্যে জারীয় রাশিয়ার সৈনিকব্যয় ৭০% বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; ফ্রান্সের ৩০%, ব্রিটেন ও ইতালীর ৬১% এবং জর্মনীর সকলের চেয়ে বেশী, ১১৪%। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯০৭ সনে জার-শাসিত রাশিয়ার সৈনিকব্যয় দেশের মোট বাজেটের :৮% ছিল, ১৯১২ সনে এই ব্যয়ের হার আরও বৃদ্ধি পাইয়া ২৬% হয়, এবং যুদ্ধ ঘোষিত হইবার পর ১৯১৪ সনে উহা মোট বাজেটের ২৮% অতিক্রম করে। ফ্রান্সে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ১৯১০ সনে মোট সৈনিকব্যয় ছিল একশ' ত্রিশ কোটি

ফ্রাঙ্ক ; ১৯১৪ সনে উহা দুইশ' কোটি ফ্রাঙ্ক বা মোট বাজেটের প্রায় ৩৮% হইয়া গিয়াছিল।

(গ) **আবার যুদ্ধোদ্যোগ**—প্রথম মহাযুদ্ধের পরই ১৯২৪ সনে জর্মনী তাহার সৈনিকখাতে খরচ করে প্রায় ৪৬ কোটি মার্ক। ১৯৩০ সনের মধ্যে এই ব্যয় বৃদ্ধি হইতে হইতে ৭৫ কোটি মার্কের সীমান্ত স্পর্শ করে। ১৯৩১ সনে এই ব্যয় আরও বৃদ্ধি পায়, সে বৎসর সৈনিকখাতে জর্মনীর খরচ হয় ১২৫ কোটি মার্ক। ১৯৩৩ সনের ৩০শে জানুয়ারী হিটলার ক্ষমতায় আরূঢ় হইবার পর জর্মনীর ধ্বনি হইল 'মাখনের বদলে বন্দুক'। কিন্তু তখন হইতে বন্দুকের আর হিসাব পাওয়া গেল না, জর্মনীর যুদ্ধব্যয় এক নিরন্ধ্র গোপনতায় চাপা পড়িয়া গেল। তবু ১৯৩৯ সনে জর্মনীর যুদ্ধখাতে ব্যয় যে পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বেশি হইয়াছিল তাহা পরোক্ষভাবে বুঝিতে পারা যায়। অন্যান্য দেশে ১৯৩৯ সনে যুদ্ধের প্রস্তুতি কি পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে তাহা নীচের সূচী হইতেই সুস্পষ্ট হইবে *—

	বিমান	ট্যাঙ্ক	কামান	মেশিনগান	সৈনিক
জর্মনী	?	?	?	?	?
ফ্রান্স	৫০০০	৪৫০০	২০০০	১৬,০০০	৭,৬০,০০০
ব্রিটেন	৫০০০	৬০০	১৯০০	১০,০০০	৫,২৯,০০০
ইতালী	৪০০০	১০০০	১৯০০	১৪,০০০	৪,০০,০০০
যুক্তরাষ্ট্র	৩৭০০	৪০০	৩৩০০	২৫,০০০	৩,৮৪,০০০
জাপান	২৭০০	২৭০	৬০০	৬,০০০	৩,২৮,০০০
পোল্যাণ্ড	১৬০০	৭০০	১৩৫০	৭,০০০	৩,০২,০০০

কোন দেশের যুদ্ধব্যয়ের সহিত সেখানকার অস্ত্রকারখানার মালিকদের স্বার্থ কিভাবে জড়িত, তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। জর্মনীর অস্ত্রকারখানাগুলির মধ্যে ক্রুপের কারখানাই সকলের চেয়ে বড় ছিল। ১৮৭০—৭২ সনে ফ্রান্স-জর্মনীর যুদ্ধের সময় সেখানে ৯,০০০ লোক কাজ করিত। ১৮৮৫ সনে সেখানে কর্মচারীর সংখ্যা হয় ২২,০০০ এবং ১৯০২ সনে ৪৪,০০০ ; আর প্রথম মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে, ১৯১৩ সনে ঐ সংখ্যাই ৮৮,০০০ হইয়া গিয়াছিল।

১৮৮৫ হইতে ১৯১৩, এই ২৮ বৎসরের মধ্যেই ক্রুপের কর্মচারী সংখ্যা চতুর্গুণ হয় ; সাম্রাজ্যবাদী যুগের যুদ্ধোদ্যোগ এবং তাহার সহিত অস্ত্রব্যবসায়ের পরস্পর-সম্পর্কের ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণ। ১৯৩৯ সনের প্রথমদিকে ক্রুপের

* 'Deutsch Wehr', ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯।

অস্ত্রকারখানায় এক লক্ষ লোক কাজ করিত। রাষ্ট্র-ক্ষমতা লাভের পূর্বে হিটলার ছিল এই ক্রুপদেরই বৃত্তিভোগী—তাই হিটলারের ক্ষমতাকালে ক্রুপের ব্যবসায়-স্ফীতি খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ১৯৩৪ সনের ৩০শে জুন হিটলার ক্রুপের বাড়ীতে থাকাকালে নাৎসী দলের অর্ধ-সমাজবাদী অংশটির নির্মূলন হয়। হিটলারের ক্ষমতারোহণ এবং নাৎসীবাদের প্রসারে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই প্রসঙ্গে ১৮৭০ হইতে ১৯৩৯ পর্যন্ত উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধিও লক্ষ্য করিবার মত।

চেম্বারলেন পরিবারের স্মল আর্মস্ লিমিটেডের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। স্মল আর্মস্ লিমিটেডের পর অস্ত্রব্যবসায়ী হিসাবে ব্রিটেনের ভিকার মেক্সিম কোম্পানীর নাম করিতে হয়। ইহার চালক-পরিচালক-বর্গের মধ্যে স্মল আর্মসের মত সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অভাব ছিল না। ভিকার মেক্সিম কোম্পানীর পুঁজি বৃদ্ধির পরিমাণ হইল—

সন	পাউণ্ড
১৮৭০	১,৬৫,০০০
১৯০৭	৬২,০০,০০০
১৯১২	৮৫,০০,০০০

অস্ত্রব্যবসায়ীর ব্যবসায় বাস্তবিক যুদ্ধ এবং অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধের আতঙ্কের উপর নির্ভর করে। মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইবার পর ব্রিটিশ কোম্পানীর ডাইরেক্টরকে তাঁহার ডাইরেক্টরী ছাড়িয়া দিতে হয়—তাই বলিয়া ব্যবসায়ের মুনাফা, তাঁহার ন্যস্ত পুঁজির লভ্যাংশ তিনি ছাড়িয়া দিবেন এমন হইতে পারে না। ১৯০৯ সনে হারকর্ট ইংলণ্ডের উপনিবেশ-মন্ত্রী ছিলেন, এই কারণে হবহাউস প্রভৃতি কোম্পানীতে তাঁহার অংশীদারত্ব নষ্ট হয় নাই। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের সাজসাজ রবের মধ্যে আর্মস্ট্রং কোম্পানী মুনাফা দিয়াছিল ৮২%, ভিকার আরও বেশি, ৮৪%। এই কোম্পানীর অংশীদারদের মধ্যে ৬ জন লর্ড এবং ফৌজী অফিসার ও এম. পি. ২০ জন ছিল,—ইহা ছাড়া পত্রিকা-মালিক ৮ জন, ১৫ জন ব্যারন, এবং স্যার উপাধিওয়ালা মানী ব্যক্তিও ছিল ২০ জন। আর ইহারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপে পরবর্তী মহাযুদ্ধে যে মহা নরসংহার হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নরূপ—

	মৃত	আহত ও নিখোঁজ
ব্রিটেন	২০,৮৯,৯১৯	২৪,০০,৯৮৮
ফ্রান্স	৩,৯৩,৩৭৮	৪,৯০,০০০
আমেরিকা	২০,৫০,৪৬৬	৪২,০২,০৩০
জর্মনী	১,১৫,৬৬০	২,০৫,৭০০

প্রথম মহাযুদ্ধে মোট খরচের হিসাব করা হইয়াছে চারশ' কোটি পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা। ১৭৯৭ হইতে ১৯০৫ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধের খরচও চারশ' পনর কোটি পাউণ্ড হইতে বেশি নহে। ইহাতে দেখা যায়, গত একশ' বছরে সমস্ত যুদ্ধে যে ব্যয় হইয়াছে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ব্যয় তাহার সমান সমান। আর নরহত্যার ব্যাপারে, গত একশ' বছরে যুদ্ধে যত মানুষ মরিয়াছে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুদ্ধে মরিয়াছে তাহার দশগুণ।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বাজার আর কাঁচামালের লোভে পৃথিবীর পুনর্বিভাজনের জন্যই এই লোকক্ষয়ী যুদ্ধ; কিন্তু এত অপার অর্থব্যয়, এই বিপুল জনহানি, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল—পৃথিবীর বিভাজন পূর্ণ হইল না; পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ ছাড়া সমস্ত ভূভাগ গ্রাস করিয়াও পুঁজিপতির লালসা অতৃপ্ত রহিয়া গেল; তাই আবার যুদ্ধ, আবার ধনজনের অপরিমিত হানি,—এই অশুভ লক্ষ্যের দিকেই পুঁজিবাদ অগ্রসর হইয়া চলিল।

(২) দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সূচনা

(ক) জাপান—এইবার নূতন বাঁটোয়ারার জন্য জাপানকেই প্রথম অস্ত্রধারণ করিতে দেখা গেল। ১৯২২ সনে ব্রিটেনের সহিত জাপানের যে পূর্ব-সম্পাদিত মৈত্রী ছিল তাহার অবসান ঘটিল। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা, সর্বত্রই এক উৎকট স্বার্থসঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি হয়। জাপানের পক্ষে ইহা এক পরম সুযোগ—এই সুযোগে জাপান ১৯৩২-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর মাঞ্চুরিয়ার উপর চড়াও হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর পুনর্বিভাজনের জন্য ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা—এবং সেই প্রচেষ্টার নায়ক সাম্রাজ্যবাদী জাপান। মাঞ্চুরিয়ার সোয়া চার লক্ষ বর্গমাইল ভূমি এবং তিন কোটি অধিবাসীকে পদানত করিয়াও জাপানের ক্ষুধা মিটিল না; ১৯৩২ সনে জাপানের হাতে চীনের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য-বন্দর সাংহাই ধ্বংস হইয়া গেল। ব্যাপার খারাপ দেখিয়া চিয়াংকাইশেক জাপানকে তুষ্ট করিতে গেল,—পাঁচ বৎসর তেমন কোন উৎপাতও হইল না;—কিন্তু পুঁজিবাদীর হিংস্র লোভ, তাহার বাজারের লোভ, কাঁচামালের লোভ, দুর্বলের অনুরোধে নিবৃত্ত হইয়া যাইতে পারে না। ১৯৩৭ সনের ৩রা জুলাই চুংকিং-এ জাপানী সিপাহীদের গুলি-চালনার ব্যাপারে চীন-জাপানের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৯৪০-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চীন-জাপানের যুদ্ধে ৬ লক্ষ জাপানী এবং ১৩ লক্ষ চীনা সৈনিক হতাহত হয়। ইতিমধ্যে চীনের প্রায়

সমস্ত সমৃদ্ধ ভূভাগ জাপানের হাতে চলিয়া আসিলেও, দুঃখের দহনে চীন মৃত্যুঞ্জয় হইয়া উঠিয়াছে। মানব-স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী সোভিয়েত রুশও তখন চীনের একান্ত বন্ধু, তাহার সমর্থক ও সহায়ক। অন্যদিকে ইংলণ্ড আমেরিকাও আর নিশ্চুপ বসিয়া থাকিতে পারিতেছে না,. তাহারাও চীনকে সহায়তা করিতে আগাইয়া আসিল;—কারণ, চীন ডুবিলে ইংলণ্ডের ৪৫ কোটি পাউণ্ডের দেশান্তরিত পুঁজিও ডুবিয়া যায়, আমেরিকারও ৪০ কোটি ডলারের ন্যস্ত পুঁজি নষ্ট হয়।

(খ) **ইতালী**—ইতালী প্রথমে অষ্ট্রিয়া-জর্মনীর দলভুক্ত থাকিলেও মহাযুদ্ধ বাধিলে নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া চলিল। পরে ব্রিটিশ-ফ্রান্সের দিকে পাল্লা ভারী বুঝিয়া ইতালী তাহাদের দলে ভিড়িয়া পড়িল—কিন্তু তাহা হইলেও যুদ্ধের পর লুটের বাঁটোয়ারার সময় ইতালী তেমন আমল পাইল না। এই ক্ষোভ, আর অন্যদিকে সাম্যবাদের ক্রমবর্ধিত বিভীষিকা, এই দুই কারণে মুসোলিনীর সুদিন আসিল। ইতালীয় পুঁজিপতিদের সহায়তায় ১৯২৬ সনে মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত দল সেখানকার শাসন দখল করে। ফ্যাসিস্ত শাসনে ইতালী জাপানের মতই পৃথিবীর আর একটি বিভাজনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ১৯৩৫ সনের ২রা অক্টোবর ইতালী সত্যসত্যই একটি অনুন্নত নিরস্ত্র দেশ আবিসিনিয়াকে আক্রমণ করিয়া বসে। এই যুদ্ধে বিষবাষ্পের সহায়তায় ইতালী আবিসিনিয়ার সাড়ে তিন লক্ষ বর্গমাইল ভূমি দখল করিয়া লয়। সেখানকার ৭৫ লক্ষ অধিবাসী তখন অনন্যগতি হইয়া ফ্যাসিস্ত অত্যাচারের নিকট মাথা পাতিয়া দিল। ১৯৩৬ সনের ৭ই মে ইতালী আবিসিনিয়াকে তাহার অধিকৃত রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করে—কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বৎসর যাইতে না যাইতে পশ্চিম য়ুরোপের অন্য রাষ্ট্রও ইতালীর লুণ্ঠনকে স্বীকার করিয়া লয়। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এইভাবে প্রথম সূত্রপাতের পর হইতে আর এক পাদ আগাইয়া আসে।

(গ) **স্পেন**—যুদ্ধ ও বুভুক্ষার হাত হইতে ত্রাণ পাইবার একটি মাত্রই উপায় আছে—তাহা হইল পৃথিবীর ধনতান্ত্রিকতাকে একেবারে শেষ করিয়া দেওয়া। সোভিয়েত শাসনে রুশদেশে এই ধনতন্ত্র লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে শুধু রুশদেশের জনসাধারণই উপকৃত হইয়াছে এমন নয়—অন্যান্য দেশের নিপীড়িত জনতাও সোভিয়েতের দৃষ্টান্তে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হইয়াছে। জর্মনী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারীতেও সমাজতন্ত্রী শাসন প্রতিষ্ঠার কিছু কিছু প্রচেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু পুঁজিবাদীরা পূর্ব হইতেই সতর্ক হইয়া এই প্রয়াস অচিরে

ব্যর্থ করিয়া দেয়। স্পেনের পার্লামেণ্টারী নির্বাচনে ফ্রাঙ্কোর পূর্বে মজুর কিসানের দল গরিষ্ঠতা লাভ করিতেছিল; ইহাতে সামন্ত, মোহান্ত ও স্পেনের পুঁজিপতির দল বিষম আতঙ্কিত হইয়া পড়ে—এই আতঙ্ক ক্রমে পার্শ্বসীমার রাজ্য ইতালী, জর্মনী প্রভৃতিতেও বিস্তৃত হয়; এমনকি, ফ্যাসিস্ত মতবাদে অবিশ্বাসী ব্রিটেন-ফ্রান্সের শাসকেরাও ইহাকে ভাল চোখে দেখিতেছিল না।

আমরা জানি, পুঁজিবাদের স্বার্থে পৃথিবীর পুনর্বিভাজনের জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন হয়; যুদ্ধের বিরোধিতা করিলে পুঁজিপতির স্বার্থেরও হানি ঘটে—ইহাতে তাহার সুখবিলাসের জীবনের নিশ্চয়তা কমিয়া যায়; এইজন্য পুঁজিপতি যুদ্ধকে কখনও থামাইয়া রাখিতে চায় না, স্পেনীয়রাও চাহে নাই—ইতালী-জর্মনীর প্রত্যক্ষ সহায়তা পাইয়াই ফ্রাঙ্কো ১৯৩৬-এর ১৮ই জুলাই যুদ্ধে সাহসী হইল; ফ্রাঙ্কোর পিছনে ইংলণ্ড-ফ্রান্সের সহায়তাও কম ছিল না—তবে উহা অপ্রত্যক্ষ, উহার রূপও নিষ্ক্রিয়, অর্থাৎ গণতন্ত্রের খোলসের ভিতর থাকিয়া যতটুকু সম্ভব ততটুকুই। এইভাবে পুরা তিন সাল* যুদ্ধ করিবার পর ফ্রাঙ্কো স্পেনের নির্বাচনী শাসন ধ্বংস করিয়া তরবারি শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

(ঘ) **জর্মনী**—বড় পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে একমাত্র জর্মনীরই কাঁচামাল ও বাজারের উপর ইজারাদারী ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী যুগে আসিয়াও আহত প্রতারিত জর্মনী কলোনী-সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত ছিল। এইজন্য যুদ্ধ ও ভূমি-বণ্টনের জন্য জর্মনীর যত উৎসাহ ছিল, তত আর কাহারও ছিল না। জর্মনী রাষ্ট্রদূত প্রিন্স মেটরনিখ একদিন লণ্ডনে এই ক্ষোভের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"১৮৬৬ হইতে ৭০-এর মধ্যে জর্মনী এক মহান শত্রুজয়ী রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু এখন জর্মনীর বিজিত রাষ্ট্র ইংলণ্ড, ফ্রান্স সারা পৃথিবী নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইয়াছে—ইহারা সামান্য উচ্ছিষ্ট ভুক্তাবশেষ ছাড়া জর্মনীর জন্য আর কিছু অবশিষ্ট রাখে নাই;—আমার মনে হয়, আজ পৃথিবীর সম্মুখে ন্যায্য দাবি লইয়া উপস্থিত হইবার সময় আসিয়াছে।"

জর্মনীর পৃথিবীর সম্মুখে স্থাপিত এই 'ন্যায্য দাবি'ই প্রথম মহাযুদ্ধের কারণ হইয়াছিল; আর কয়েক বৎসর পর এমন আর একটি 'ন্যায্য দাবি'ই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও কারণ হইয়াছে।

(১) **হিটলারের আবাহন**—প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত হইবার পর জর্মনীতে পুঁজিবাদী-প্রথা নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। দেশ-বিদেশের

* স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ১৯৩৬-এর ১৮ই জুলাই হইতে ১৯৩৯-এর ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত।

পুঁজিপতিরা যুদ্ধের এই আতঙ্কিত ফল দেখিয়া বিষম চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহারা সকলে তখন এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া জর্মনীর পুঁজিবাদকে চালু রাখিবার চেষ্টা করে। জর্মনীর জনতান্ত্রিক সমাজবাদীরা এই কাজে পুঁজিবাদীদের সহায়ক হইল; তাহাদের ধুয়া ছিল, পুঁজিবাদীকে এমন আচমকা ধাক্কা দিও না; ধীরে ধীরে সব ঠিক করিয়া দিব, পুঁজিবাদীই ক্রমে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হইবে। কিন্তু পুঁজিবাদের এই ক্রমবিবর্তবাদে জনসাধারণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না; হিটলার জনতার এই অসন্তোষের সুযোগ লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল; তাহার আদর্শ হইল রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ, রাষ্ট্রের ধনজন সমস্তই রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়া যাইবে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ গাল-ভরা কথা হইলেও বাস্তবে তাহা ফ্যাসিস্তবাদ; উহা ধনতন্ত্রবাদেরই উগ্র, উৎকট ও অসহিষ্ণু রূপ, এবং অন্তিম পর্যায়ে তাহার রক্ষক।

যাহাই হউক, দেশ-বিদেশে পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্রের ফলে হিটলার জর্মনীতে পাকা হইয়া বসিল। ১৯৩৩ সাল, গত মহাযুদ্ধের দিনগুলি হইতে ১৫ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—মানুষের স্মৃতিতে মহাযুদ্ধের দুঃখ, কষ্ট ও মহাসংহারের কথা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। জর্মনীর পুঁজিপতিরা দেখিল বিপ্লব-বিরোধী সমাজবাদী দলের প্রভাব ক্রমে ক্রমেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে—তাহার স্থলে বিপ্লবী সমাজবাদী দল অর্থাৎ কম্যুনিস্টরা জনমনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য, দেশের জমিদার, পুঁজিপতি, ইহাদের সমর্থন বরাবরই হিটলারের পিছনে ছিল; হিটলারের পিছনে আর একটি পরম শক্তি ছিল ক্রুপথাইসেনের মুক্ত কোষাগার। কিন্তু তাহা হইলেও ১৯১৮ অবধি প্রকৃতপক্ষে হিটলারের কোন প্রভাবই ছিল না; ২৮ সালের নির্বাচনে হিটলার ১২ জন মাত্র সদস্য রাইখস্টাগে* পাঠাইতে পারিয়াছিল—তখন তাহার দলের প্রাপ্ত ভোট-সংখ্যা হইয়াছিল ৮ লক্ষ, জর্মনীর মোট ভোটার সংখ্যার তুলনায় খুবই নগণ্য। ইহার পর ১৯২৯ সনে বিশ্বব্যাপী এক বিষম অর্থসঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছিল; বাজারের দিকে না তাকাইয়া অপরিমিত পণ্য উৎপাদনের জন্য জর্মনীও তখন মার খায়; জর্মনীর সাম্যবাদী আন্দোলন হইতে শেষবারের মত আর একবার উদ্বেল হইয়া উঠে; থলিওয়ালারা আবার দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করে; অবশেষে তাহারা উপলব্ধি করে যে, হিটলারই তাহাদের রক্ষাকর্তা,—হিটলারের পিঠ চাপড়ানো ছাড়া জর্মনীর পুঁজিপতির আর গতি নাই।

---

* জর্মনীর পার্লামেন্ট।

পুঁজিবাদের এই সর্বাত্মক আত্মরক্ষার মধ্য দিয়া হিটলার জর্মনীতে প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠিল—১৯৩০-এর নির্বাচনে হিটলারের দল ভোট পাইল ৬৪ লাখ, আর রাইখস্টাগে তাহাদের সদস্য হইল ১০৭। পনর বৎসর সংস্কারক সমাজবাদীদের উপর বিশ্বাস রাখিয়া জনতা নিরাশ হইয়া গেল। এমন সময় দেশীয় পুঁজির সহায়তায় হিটলার ভার্সাই চুক্তির বিরোধিতা আরম্ভ করে; মার্ক্সবাদ, প্রজাতন্ত্র এবং ইহুদি—এই তিন বস্তুও হিটলারের আক্রমণের লক্ষ্য হয়। অবশেষে এই প্রবল প্রচার, সন্ত্রাস ও ঔদ্ধত্যেরও একটা রাজনীতিক ফল ফলিল। পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে হিটলারের দলের স্বপক্ষে বিপুল ভোট-সংখ্যা দেখিলেই তাহা বুঝা যায়—

১০ই এপ্রিল, ১৯৩২ — ১,৩৪,০০,০০০

(হিণ্ডেনবার্গের বিপক্ষে নির্বাচনে)

৩১শে জুলাই, ১৯৩২ — ১,৩৭,০০,০০০

(ঐ সনের সাধারণ নির্বাচনে)

এইবার সর্বাপেক্ষা বড় দলের নেতা হইয়া হিটলার চ্যান্সেলর* পদের প্রার্থী হইল; কিন্তু হিণ্ডেনবার্গ এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়া দেওয়ায় হিটলার অসুবিধায় পড়িল; কিন্তু লোক হিটলারের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিল, এবং তাহার ফলে পরবর্তী নির্বাচনে ফল হইল—

৬ই নভেম্বর, ১৯৩২ — ১,১৭,০৯,০০৯ ভোট

১৯৩২-এর ডিসেম্বরে এই পংক্তিগুলির লেখক যখন জর্মনীতে ছিল, তখন হিটলারের ভাগ্যরবি অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। রেল এবং ভূগর্ভ রেলের স্টেশনগুলিতে তখন হিটলারের দলের তকমা-আঁটা চেলাদিগকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া লোকে নাক সিঁটকাইত। অন্যদিকে জর্মনীর অর্ধ-দেউলিয়া জমিদার, ইস্পাতের রাজা, ব্যাঙ্কার ও কারখানাওয়ালা জনমনে কম্যুনিজমের প্রভাব দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। ভূতপূর্ব চ্যান্সেলর ফান পাপেন তখন নিজে উদ্যোগী হইয়া শ্রোইডর নামক এক ব্যাঙ্কারের কোলোন-স্থিত বাড়ীতে জর্মনীর পুঁজিপতিদের এক সভা ডাকেন। জর্মনীর জমিদার ও পুঁজিপতির দল অবশ্য চিরকালই হিটলারের আনুগত্যের উপর বিশ্বাস পোষণ করিত; তাহারা জানিত যে, হিটলারকে করগত রাখা তাহাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইবে না। কোলোনের সভার পর জর্মন পুঁজিপতি, জমিদার ও কারখানার মালিকবর্গ হিটলারকে চ্যান্সেলর করিতে চাহিল। হিণ্ডেনবার্গ নিজেও

* মুখ্যমন্ত্রী

সামন্ত জমিদার পরিবারের লোক ছিলেন, তাই সামন্তস্বার্থের দিকে চাহিয়া এবার তিনি অমত করিলেন না। এইভাবে খ্রীষ্টীয় ১৯৩৩ সনে, ৩৩ সনের ৩০শে জানুয়ারী, হিটলার জর্মনীর চ্যান্সেলরের পদ অধিকার করিয়া বসিল।

(২) **হিটলারের রাষ্ট্রশাসন**—হিটলারের হাতে ক্ষমতা আসিবার পর তাহার প্রধান কাজই হইল কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রচার করা। কম্যুনিস্টদের উপর আক্রমণের অছিলা সৃষ্টির জন্য হিটলার রাইখস্টাগ ভবনে আগুন দেওয়াইয়াছিল। ইহার পর জর্মন পার্লামেন্টে বহুমত পাইবে মনে করিয়া, হিটলার এক সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করে। কিন্তু ১৯৩৩-এর ৫ই মার্চের নির্বাচনে হিটলারের স্বপক্ষে ১,৭২,৭০,০০০ অর্থাৎ মাত্র ৪৪% ভোট গৃহীত হইয়াছিল। রাষ্ট্রবাদী দলের সহায়তা না পাওয়ায় এই সময় হিটলারের ৮% ভোট নষ্ট হয় এবং জর্মন পার্লামেন্টে বহুমত লাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অন্যান্য দেশের পুঁজিবাদী শাসনের সহিত সংঘর্ষশীল হইলেও, হিটলারের শাসনও মূলত পুঁজিবাদী শাসন। এই পুঁজিবাদী বা থলিবাদী শাসন নিজের নিজের থলির পরিস্ফীতির জন্যই পৃথিবীর পুনর্বিভাজন কামনা করে। ইহাতে দেশের মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত, তাহার সৈনিক ও সাধারণ মানুষ, পুঁজিপতির লোভের যূপে বলি হয়। এই থলির শাসনে বুভুক্ষু ও বেকারের খানা-কাপড়ের বন্দোবস্ত করা হিটলারের পক্ষেও স্বভাবতঃই অসম্ভব হইল। তখন শূন্যগর্ভ প্রচার আর ভবিষ্যৎ বিজয়ের আশা এই দুইটিমাত্র বস্তু ছাড়া হিটলারের আর কোন সম্বল রহিল না। যাহাই হউক, একটা অনাগত সুখের দিনের অলীক স্বপ্নে হিটলার জর্মনীর মানুষকে ভুলাইতে, মত্ত করিতে সক্ষম হইল। ক্রমে জর্মনীর সৈনিকশক্তি প্রবল হইয়া উঠিল—ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার পুঁজিপতিরা বাধা দিল না। কারণ জর্মন জমিদার ও পুঁজিপতির মত সাম্যবাদের আতঙ্কে উহাদেরও তখন নিদ্রাবিঘ্ন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় হিটলার তাহাদের গোপন বন্ধু, তাহাদের ভবিষ্যতের আশা, বর্তমানের আশ্বাস—হিটলারের চেষ্টায় যদি জর্মনীর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব হইতে সাম্যবাদ লুপ্ত হইয়া যায়, তবে ক্ষতি কি? হিটলার বিশ্বপুঁজিবাদের এই পরোক্ষ সমর্থনকে আপন প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য কাজে লাগাইতে পারিল। কিন্তু দেড় বছরের হিটলারী হুকুমতের রূপ দেখিয়া হিটলারের প্রাক্তন সমাজবাদী সাথীরা বিরূপ হইতে আরম্ভ করিল। তাহারা বুঝিতে পারিল, প্রোপাগাণ্ডার ঢক্কারে বিভ্রান্ত হইয়া উহারা ভুল পথে বহুদূর চলিয়া আসিয়াছে—হিটলারের রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ আসলে সমাজবাদ নয়, উহাতে

সমাজ-সাম্যের কোন কথাই নাই ; পুরাতন পুঁজিপতি ও জমিদাররা হিটলারের কাঁধে ভর করিয়া গত অর্থসঙ্কটের ধাক্কা কাটাইয়া উঠিয়াছে—ইহাই হিটলারী সমাজবাদ, রাষ্ট্রীয় সমাজবাদের ইহাই রূপ, ইহা পুঁজিবাদের সংরক্ষক, তাহার চরম বিপর্যয়ে পরম আশ্রয়। এইভাবে সমাজবাদী বন্ধুদের অসন্তোষ হিটলারের প্রতিপত্তির মূলে আঘাত হানিতে আরম্ভ করিল। ১৯৩৪-এর জুন মাসে হিটলার জর্মনীর ইস্পাতের রাজা ক্রুপের এসেন-স্থিত আবাসে বাস করিতেছিল। সেইখানে ৩০শে জুন তাহার প্রতিষ্ঠা স্থাপনাকালের পূর্ব-সহায়ক এক হাজার সাথীকে হিটলার হত্যা করে। হিটলারের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ক্যাপ্টেন রোয়েম, বহু নাৎসী-অনাৎসী নেতা, এমনকি ভূতপূর্ব চ্যান্সেলর ফন শ্লাইখেরও তখন নিহত হন।

এইরূপ দুই বৎসরের উগ্র প্রস্তুতির পর হিটলার ভার্সাই চুক্তির নিন্দা করিয়া পাগড়ী উল্টাইয়া বাঁধিতে লাগিল ; ১৯৩৫ সনের মার্চ মাস হইতে ভার্সাই-এর সন্ধিশর্তের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতায় হিটলারের সৈনিকসজ্জা সুরু হইল। ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকায় ইহাতে তেমন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা গেল না। গত বিশ্বমন্দার ধাক্কা তাহারা সবে সামলাইয়া উঠিয়াছে ;—এখন দম নিবার সময়, যুদ্ধোদ্যোগের কথা তাহাদের ভাল লাগিতেছে না। তাহার উপর নানা রাষ্ট্রের অন্তবিরোধ বা মালিকানার ঝগড়াও আছে। তাই হিটলারকে প্রতিহত করিতে হইলে তখন একক অগ্রসর হইয়া আসিত হয়। কিন্তু তাহাও কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে,—এমনকি উহার কল্পনাও অবাস্তব ; তাই উটপাখীর ঝঞ্ঝা-নিবৃত্তির মত সকলেই বালুতে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। কিন্তু আর এক বৎসরের সমরসজ্জার পর ১৯৩৬-এর ৭ই মার্চ হিটলার রাইন-ল্যাণ্ড প্রান্তে সৈন্য পাঠাইয়া দিল। ইহা লোকার্নো চুক্তির বিরোধী, কিন্তু হিটলার জানিত, ফ্রান্স মৃদু আপত্তি করিলেও বলডুইন সরকার তাহাতে বাধা দিবে না। হিটলারের যুদ্ধোদ্যোগের ফলে জর্মনীর শস্ত্রকারখানাগুলির কাজ বাড়িয়া গেল ; তাহাতে বহু বেকারের অন্ন-সংস্থান হইল ; এবং স্ত্রীলোকদিগকে রন্ধনশালায় ফেরৎ পাঠাইয়া দেওয়ায় ঐ সূত্রেও অনেকের চাকুরি জুটিল ; এইভাবে শ্রমিক ও সৈনিকের সংখ্যা বাড়িল এবং 'মাখনের স্থানে বন্দুক' এই ধ্বনি তুলিয়া হিটলার জর্মন উৎপাদন-উদ্যোগকে এক যুদ্ধযন্ত্রে পরিণত করিয়া ফেলিল।

(৩) **ব্রিটিশের কূটনীতি**—লোহা ও অস্ত্র-কারখানার মালিক বলডুইন সরকার হিটলারের যুদ্ধোদ্যোগে সর্বদাই উৎসাহ যোগাইয়া আসিয়াছে।

বলডুইন সরকারের ধারণা ছিল, হিটলারের ছোট পেট ভরিতে এক সোভিয়েত দেশই পর্যাপ্ত হইবে। তাহার উপর ফ্রান্স আছে, স্পেন আছে, বেলজিয়ম আছে, ভূমধ্য অঞ্চলে ইহাদের সাম্রাজ্য-বিস্তারও কম নহে। এই সব রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য যতদিন বর্তমান আছে, ততদিন ইংলণ্ডের ভয় করিবার, অন্তত বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। এই নীতি অনুসরণ করার ফলে আমেরিকার সঙ্কেত পাইয়াও জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের বিপক্ষে ইংলণ্ড হাত উঠাইল না। ১৯৩৭ সনের ৩১শে আগস্ট বলডুইনের শূন্যগদিতে আরোহণ করিয়া নেবিল চেম্বারলেন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রির দায়িত্ব লইলেন। চেম্বারলেন থলিস্বার্থের আদর্শ পুরুষ, তাঁহার ধ্যান জ্ঞান সবই থলি, দিনদিন পরিবর্ধিত ও পরিস্ফীত থলি ছাড়া তিনি আর কিছু বুঝিতেন না, বুঝিতে চাহিতেনও না; দূরদর্শিতার এতবড় দুশমন পৃথিবীতে খুব কমই ছিল—চেম্বারলেনের কোন কাজে দূরদর্শিতার যৎসামান্য চিহ্ন থাকিলে, তাহাও থলির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সম্ভব হইয়াছে; চেম্বারলেনের রাষ্ট্রহিতের অর্থও ছিল থলির হিত, তাহার সময় পার্লামেণ্টেও থলিপতিদেরই বহুমত ছিল—আর নেবিল চেম্বারলেন ছিলেন এই থলিচক্রের হিটলার—হিটলার হয়ত ঠিক নয়, থলিচক্রের বাণিয়া রাজা—কারণ তাঁহার পাঁজরের তলায় হিটলারের মত আগুনসেঁকা পুরু কলেজা ছিল না।*

ইংলণ্ডে চেম্বারলেন প্রভৃতি থলিস্বার্থবাদীদের প্রভুত্বে হিটলারের পক্ষে একটা চমৎকার সুযোগ আসিয়া গিয়াছিল। হিটলার এই সুযোগকে কাজে লাগাইতে বিলম্ব করে নাই, ১৯৩৮ সনের ১২ই মার্চ হিটলার অষ্ট্রিয়া দখল করিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ইহাতে প্রথমত একটু হকচকাইয়া গেলেও, ব্রিটেন হিটলারের পিঠ চাপড়ান বন্ধ করিল না। অবস্থা দেখিয়া ফ্রান্স মুসোলিনীকে তোয়াজ করিতে লাগিল, ফলে আবিসিনিয়া আক্রমণকালে ব্রিটেন প্রতিবাদও করিতে পারিল না। ঐ দিকে অষ্ট্রিয়ার ব্যাপারে ফ্রান্স আশা করিল যে, মুসোলিনীই হয়ত একটা কিছু করিতে চাহিবে। কিন্তু সামান্য অষ্ট্রিয়া আবিসিনিয়া লইয়া বিশ্বযুদ্ধের উদ্যোগপর্বে দুইটি ভবিষ্যৎ মিত্র রাষ্ট্র পরস্পর বিপদ বাধাইয়া বসিবে কেন?

এইভাবে হিটলার বিশ্ববিজয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ পৃথিবীর উপর জর্মন থলিপতির অকণ্টক রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। পৃথিবীর পুনর্বিভাজন চেষ্টায় পূর্বের

* চেম্বারলেনের অস্ত্রকারখানা ও অন্যান্য মালিকী স্বার্থের কথা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বার জর্মনী অসফল, হতস্বার্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল—তাই বিশ বৎসর পর বিপুল সমরসজ্জার সঙ্গে আবার সেই পুনর্বিভাজনের জন্যই সে উদ্যোগী হইল। অষ্ট্রিয়া দখলের পর ছয় মাস যাইতে না যাইতে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার নিকট সুদেতান প্রান্ত দাবি করিয়া বসিল। যুদ্ধ আরম্ভ হয় হয় এমন সময় চেম্বারলেন দুইবার উড়িয়া আসিয়া হিটলারের দরবারে ধর্ণা দিলেন; অবশেষে মুসোলিনী, দালাদিয়ে ও চেম্বারলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার অসম্মতিতেই, হিটলারের হাতে তাহার বলিপত্র তুলিয়া দিল।* কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ইহার পর দশদিনও পার হইল না, হিটলারের সৈন্যবাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। হিটলার মিউনিকে কথা দিয়াছিল, ভবিষ্যতে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার তাহার কোনরূপ ইচ্ছা নাই। ব্রিটিশ কূটনীতি জর্মন থলিপতির প্রতিনিধি হিটলারের কথায় তখন মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল। মূর্খদের নিশ্চিন্ততা এই বিষয়ে এত গভীর ছিল যে, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সহিত পরামর্শের কথাও তাহারা ভাবিতে পারে নাই।

যাহাই হউক, হিটলারের দিক হইতে তাহার কাজের পিছনে অছিলার কখনও অভাব ছিল না। ১৯৩৯-এর ১৫ই মার্চ শান্তি ও সুব্যবস্থার নামে হিটলার সারা চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিয়া লইল; তারপর সপ্তাহ না ঘুরিতে, মার্চের ২২শে তারিখ, লিথুনিয়ার অঙ্গ হইতে মেমেলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হয়। এইভাবে অন্য রাষ্ট্রের চোখের উপর দিয়া জর্মনী একা একা পৃথিবীর পুনর্বণ্টনের কাজ সম্পন্ন করিতে থাকে। ইংলণ্ড ফ্রান্স আমেরিকার থলিদারেরা এইবার চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া বিষয়টা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিল। হিটলার এবারও তাহার পূর্ব উক্তি, অষ্ট্রিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাসের সময়কার কথারই পুনরাবৃত্তি করিল; হিটলার ঘোষণা করিল, জর্মনীর হৃত ভূমির পুনরুদ্ধার হইয়া গিয়াছে, আর তাহার বিজয়-বাসনা নাই।

(৪) **হিটলারের প্রহার**—কিন্তু চার মাসও অতিক্রান্ত হইল না, ১৯৩৯-এর ৩০শে আগস্ট হিটলার ডানজিগ ও পোলিশ করিডরের জন্য পোল্যাণ্ডকে চরমপত্র দান করিল; ইহার দুইদিন পর সেপ্টেম্বরের প্রথম তারিখে ডানজিগের উপর দিয়া হিটলারের সাঁজোয়া বাহিনী পোল্যাণ্ডে পৌছিয়া গেল। ফ্রান্স ব্রিটেন যে ইহাতে খুব একটা বিচলিত হইল, প্রথমত এমন কিছু মনে হইল না; কারণ তাহারা ভাবিত, হিটলারের সমরায়োজন যদি

* ১৯৩৮ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর।

সোভিয়েতের উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে, তবে ক্ষতি কি? বহুদিন হইতে, বিশেষ করিয়া চেম্বারলেনের সময় হইতে, ইংলণ্ডের ইহাই কামনা ছিল—জর্মনবাহিনী পশ্চিম দিকে না ফিরিয়া পুর্ব মুখে মোড় ফিরিলে ইংলণ্ডের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় না; বরং থলিস্বার্থের দিক হইতে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের বিপর্যয়ে ইংলণ্ডের লাভই সুরক্ষিত হয়—এই চিন্তা করিয়া হিটলারের পুর্বমুখ অভিযানকে ইংলণ্ডের শাসকগোষ্ঠী কখনও নিরুৎসাহিত করিত না। কিন্তু হিটলার তাহার নিজের বিপদ বুঝিতে পারিত, সোভিয়েতের সেনাবাহিনী গত অর্ধ-শতাব্দীর রণ-বিজ্ঞানের প্রতিটি খুঁটিনাটি যে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, ইহা হিটলারের অজানা ছিল না;—তাহার উপর সোভিয়েতবাসী থলির প্রভাবমুক্ত শাসনতন্ত্রের মাহাত্ম্য জানে, তাই স্বভূমি রক্ষার জন্য ইহার প্রত্যেক অধিবাসীই যে এক এক করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবলি দিতে কুণ্ঠিত হইবে না, ইহাও হিটলার বুঝিত;—তাই তাহার পূর্বমুখ অভিযান পোল্যাণ্ড সীমান্ত অতিক্রম করিয়াই সেইবারের মত বন্ধ হইয়া গেল, হিটলার যুদ্ধ না করিয়া ১৯৩৯ সনের ২৩শে আগস্ট সোভিয়েতের সহিত অনাক্রমণমূলক সন্ধি করিয়া ফিরিয়া আসিল। ব্রিটেন-ফ্রান্সের থলিবাদী কূটনীতি এবার সত্যসত্যই প্রমাদ গণিল, হিটলারের পূর্ব অভিযান রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; এখন পোল্যাণ্ড একা একা বিধ্বস্ত হইলে তাহার পর নাৎসী সমর-সরীসৃপ মোড় ফিরিয়া পশ্চিমমুখী হইয়া পড়িবে; কে জানে, হয়ত ইহার পর ফ্রান্সেরই পালা আসিবে, ব্রিটেনেরও আসিতে পারে, অন্য রাষ্ট্রেরও হইতে পারে; তাই ইংলণ্ড-ফ্রান্স হিটলারের পরিতোষণ ত্যাগ করিয়া ১৯৩৯-এর ৩রা সেপ্টেম্বর তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

এইভাবে কাঁচামাল ও বাজারের দখল লইয়া পৃথিবীর পুনর্বিভাজনের জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের তুলনায় এইবার সকল পক্ষের রণসজ্জাই অধিক, অবিশ্বাস্য রকমে অধিক; বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কৃত বহু তত্ত্ব ও তথ্যের উপর এই যুদ্ধের বিপুল আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন ভাবিতেও আশ্চর্য লাগে যে, এক সময় মানুষ কাঠপাথরের হাতিয়ার লইয়া যুদ্ধ করিত—তখন বিজ্ঞান উন্নত ছিল না, তাই যুদ্ধে ব্যক্তির শারীরিক বল ও বীরত্বের মর্যাদা ছিল। তারপর মানুষ ধনুর্বাণ আবিষ্কার করে, তামার তলোয়ার ক্রমে যুদ্ধায়ুধরূপে ব্যবহৃত হয়—যুদ্ধাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুযুৎসু সৈনিকেরও ধীরে ধীরে সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছিল; তাম্রযুগের যুদ্ধ-বিগ্রহে এক এক পক্ষে হয়ত হাজার কয়েক মাত্র সৈন্য যুদ্ধ করিত—তখন যুদ্ধমাত্রেই ছিল সম্মুখযুদ্ধ, ধনুকের তীরের গতি অপেক্ষা অধিক ব্যবধান থাকিলে যুদ্ধ হইত

৫০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ কমপক্ষে সাত কোটি টাকা হইবার কথা। পুঁজি আহরণের এই সিংহদ্বারটি ক্রমে ক্রমে আরও প্রশস্তই হইয়াছে—এমন কি এখনও ইহাতে যে অর্গল পড়িয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পৌঁছিয়া কোম্পানীর পুঁজি প্রেরণের একটু হিসাব দেখুন—

সন	পাউণ্ড	টাকা
১৮৩৫—৩৯	৫৩,৪৭,০০০	৩,০০,০০,০০
১৮৫৫—৫৯	৭৭,৩০,০০০	১০,০০,০০,০০০

অবশ্য ইহা শুধু কোম্পানীর হিসাব, ব্যক্তিগত আদায় ওশুল ইহার বাহিরে।

এইভাবে পুঁজি চালানোর ফলে ব্যাপারবাদী ইংলণ্ড পুঁজিবাদী দেশে পরিণত হইয়া গেল। তাহার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া নূতন নূতন কারখানা বসিল, নূতন পুঁজিতে নূতন শিল্পোদ্যোগ আরম্ভ হইল; ইহাতে ভারতের কাঁচামাল নিবার প্রয়োজনীয়তা যে পরিমাণে বাড়িল, তৈয়ারী মাল নিবার প্রয়োজনীয়তা ঠিক সেই অনুপাতেই কমিয়া গেল—ইংলণ্ডের তৈয়ারী মালই তখন হইতে ভারতের বাজারে অধিক হইতে অধিকতর রপ্তানি হইতে লাগিল। নিম্নে কাপড়ের আমদানি রপ্তানির একটি হিসাব দেখুন—

সন	ভারত হইতে ব্রিটেনে (থান হিসাবে)	ব্রিটেন হইতে ভারতে (গজ হিসাবে)
১৮১৪	১২,৬৬,৬০৮	৮,১৮,২০৮
১৮২১	৫,৩৪,৪৯৫	১,৯১,৩৮,৭২৬
১৮২৮	৪,২২,৫০৪	৪,২৮,২২,০৭৭
১৮৩৫	৩,০৬,০৮৬	৫,১৭,৭৭,২৭৭

ইহার অর্থ এই যে, এই একুশ বৎসরে ভারত হইতে ব্রিটেনে কাপড় রপ্তানির পরিমাণ ১/৪ হইয়া যায়; এবং সেইস্থলে ব্রিটেন হইতে ভারতে আমদানির হার ৬০ গুণ হইতেও বেশি হয়।† উনিশ শতাব্দের মধ্যভাগে পৌঁছিয়া ভারতীয় তৈয়ারী মাল ইংলণ্ড যাওয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর হইতে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের পুঁজিপতিদের কাঁচামালের যোগানদার

† এই হিসাব রেশম-বস্ত্র ও পশম-বস্ত্র সম্পর্কে।

মাত্র হইয়া রহিয়াছে। নীচে ইংলণ্ডে প্রেরিত তুলা, পাট ও অন্যান্য কাঁচামালের কয়েক বৎসরের হিসাব দিলাম—

সন	তুলা (মূল্য পাউণ্ডে)	পাট (মূল্য পাউণ্ডে)	অন্যান্য (মূল্য পাউণ্ডে)
১৮৪৯	১৭,৭৫,৩০৯	৬৮,৭১৭	৮,৫৮,৬৯১
১৮৫৮	৪৩,০১,৭৬৮	৩,০৩,২৯২	৩৭,৯০,৩৭৪
১৯০১	১,০১,২৯,৭১৭	১,০৮,৭৭,৭৫৬	১,৪০,৬৯,৫০৯

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ পাদেও ইংলণ্ডীয় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের রূপ পরিগ্রহ করে নাই। তখন ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের জন্য কাঁচামাল উৎপন্ন করিত, আর তাহার তৈয়ারী মালের বাজার হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ইহার পর ইংলণ্ডের পুঁজিবাদ ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদের অভিমুখ হইয়া পড়ে; তখন তাহার ইজারা দারীয় পুঁজির দৌলতে ভারতে নিত্যনূতন-কলকারখানার স্থাপনা হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতবর্ষে কাপড়ের কল কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল দেখুন—

সন	মিল	মিল ব্যবহৃত তাঁত	পুঁজি (কোটি টাকার অঙ্কে)
১৮৭৬		৯,১৩৯	
১৯১৩	১৭২	৯৪,১৩৬	
১৯৩২	৩৪০	১,৮৬,৪০৭	
১৯৩৪	৩৮০		৩৬ ১৬
১৯৩৮	৩৮৪		৩৭·৯০

ভারতবর্ষে কাপড়ের উৎপাদন ক্রমে ক্রমে কিরূপ বাড়িয়াছে তাহার নমুনা দেখুন—

সন	পরিমাণ (পাউণ্ডের ওজনে)
১৮৯৯	১০ কোটি ৪০ লক্ষ
১৯১৪	২৭ কোটি ৪০ লক্ষ
১৯৩১	৫৯ কোটি

সঙ্গে সঙ্গে জুট মিলগুলির এবং উহাদের উৎপাদনক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধির বেগও দেখুন—

সন	মিল	ব্যবহৃত তাঁত	ব্যবহৃত টাকু
১৮৭৬—৮০	২২	৪,৪৯৬	৭০,৮৪০
১৯১৩—১৪	৬৪	৩৬,০৫০	৭,৪৪,২৮৯

সন	মিল	ব্যবহৃত তাঁত	ব্যবহৃত টাকু
১৯৩০	১০০	৬১,৮৩৪	১২,২৪,৯৮২
১৯৩৫	১০০	৬৩,০০০	১২,৭৯,০০০
১৯৩৮	১০৫	৬৭,০০০	১৩,৩৮,০০০

এখন লোহার, কয়লার হিসাবটা একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লওয়া যায়। জামশেদপুরে টাটার কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল ইংরেজী ১৯০৭ সনে—১৯১৫ সনে 'স্টিল কর্পোরেশন অব্ বেঙ্গল' ইহার সঙ্গে মিলিত হয়—তদুপরি মহীশূরের ভদ্রাবতী লৌহ ইস্পাত কারখানাও ইহাদের সঙ্গে সংবদ্ধ ছিল। টাটার কারখানার উৎপাদন ছিল—

সন	কাঁচা লোহা (টনের ওজনে)	ইস্পাত (টনের ওজনে)
১৯১৪	২,৪০,০০০	৭০,০০০
১৯৩০	১১,৪০,০০০	৬,১৬,০০০
১৯৩৯	১৮,৩৮,০০০	২৮,৭৮,০০০

আর কয়লার পরিমাণ ছিল—

সন	পরিমাণ (টনের ওজনে)
১৯১৩	১ কোটি ৬২ লক্ষ
১৯১৯	২ কোটি ২৬ লক্ষ
১৯২৯	২ কোটি ৩০ লক্ষ
১৯৩৯	২ কোটি ৭৭ লক্ষ

জুট মিলের মত কয়লার ব্যবসায়ও ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া ইংরেজ কোম্পানীগুলিরই একচেটিয়া। ১৯১৬ সনে ভারতবর্ষে বিলাতী পুঁজির পরিমাণ ছিল সাড়ে ছাব্বিশ কোটি পাউণ্ড—টাকার হিসাবে ইহার সংখ্যা পৌনে চারশত কোটি টাকার মত হয়; ১৯৩১-৩২ সনে ন্যস্ত বিলাতী পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় এগার শ' কোটি টাকা, অর্থাৎ পূর্ব সংখ্যার প্রায় তিনগুণ। ১৯৩৪ সনে ভারতবর্ষের কল-কারখানায় যে পুঁজি ন্যস্ত ছিল তাহার অর্ধেকই ইংরেজী পুঁজি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতবর্ষে ইংরেজী পুঁজি কি হারে বাড়িয়া গিয়াছে দেখুন—

সন	কোম্পানী	পুঁজি (কোটি পাউণ্ডে)
১৯২২-২৩	৭২০	৪৮'৭
১৯৩১-৩২	৯১১	৭৫'৬*

* ৭৫'৬ কোটি পাউণ্ড টাকার অঙ্কে এক হাজার কোটি টাকা হইতেও কিছু বেশি।

এই হাজার কোটি টাকার পুঁজি ১৯৩২ ৩৩ সনে যে সব কোম্পানীতে ন্যস্ত ছিল তাহার বিবরণ—

কোম্পানীর বিবরণ	কোম্পানীর সংখ্যা	ন্যস্ত পুঁজি (কোটি পাউণ্ডে)
ব্যাঙ্ক ও লগ্নি	২৯	৯ ৯৩
বীমা	১৪৩	৮'০৪
জাহাজ	১৮	৪ ১৩
রেল	১৮	২'৪৮
ব্যাপার বাণিজ্য	৩৫৯	৩০'৯৮
চা	১৮০	২ ৮২
খনি	৩৪	১১'৩৪
জুট	৫	'২৮

একজন আমেরিকান অধ্যাপক ভারতবর্ষে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—*

"ভারতবর্ষের সার্বজনিক ঋণের† অধিকাংশই ইংরেজ পুঁজিপতির হাতে; বর্তমানে ইহার পরিমাণ সাড়ে তিন শ' কোটি ডলারের× কম হইবে না। ভারতে যে ৫১৯৪টি বিদেশী কোম্পানী আছে, তাহারও অধিকাংশই হইতেছে ইংরেজ কোম্পানী—বিদেশী কোম্পানীর মোট পুঁজির পরিমাণ ভারতবর্ষে আড়াই শ' কোটি ডলারের মত; ইহা ছাড়া, ভারতবর্ষে সংগঠিত কোম্পানীর সংখ্যাও ৫১৬৪ হইবে, ইহাদের একত্রিত পুঁজির পরিমাণও একশত কোটি ডলার ছাড়াইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই বিরাট পুঁজির 'সিংহাংশ'ও ইংরেজ মালিকের করতলগত।

"ইহার সহিত ব্যাপার বাণিজ্যের মুনাফাটাও যোগ করা যাউক। ইংরেজ ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর এক শ' কোটি ডলারের মাল বিক্রয় করে। ইহা ইংলণ্ডের সারা নির্যাত ব্যাপারের এক-দশমাংশ হইবে। ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড মাল খরিদ করে বৎসরে প্রায় চল্লিশ কোটি ডলারের—কিন্তু ইহার অধিকাংশই কাঁচামাল, তবু ভারতের নির্যাত ব্যাপারের ইহা নয়-দশমাংশ।..."

* Imperialism and World Politics (Parker T. Moon—1933). p. 281.

† এই অর্থ এশিয়া ও আফ্রিকার যুদ্ধগুলিতে ইংরেজের স্বার্থরক্ষার জন্য খরচ করা গিয়াছে।

× অর্থাৎ প্রায় সোয়া দুই হাজার কোটি টাকা।

"ইংলণ্ডের কাপড়ের মিলের মালিকরা ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে সাড়ে বাইশ কোটি ডলার মুনাফা করে। লোহা, ইস্পাত, মোটর, রেলওয়ে এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি হইতে বাৎসরিক মুনাফা হয় প্রায় দশ কোটি ডলার। ইহা ছাড়া, বারো কোটি ডলারের চা, কয়েক কোটি ডলারের জুট, কার্পাস, চামড়া বিলাতে পাঠাইবার ঠিকাদারও ইংরেজী কোম্পানী।..."

ব্যবসায় ও মুনাফার জন্য ইংরেজ কিভাবে রাজ্যবিস্তার করিয়াছে সেই সম্বন্ধে মুন বলিতেছেন—

"সিপাহী বিদ্রোহের* পর নিঃসন্তান রাজার রাজ্য দখলের রীতি বন্ধ হইয়া যায়। তাহা হইলেও সামন্ত রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া ভূমি দখল করা অব্যাহতই ছিল।

যেমন—

সন	ভূমি দখল (বর্গমাইল হিসাবে)
১৮৬১—৭১	৪,০০০
১৮৭১—৮১	১৫,০০০
১৮৮১—৯১	৯০,০০০
১৮৯১—১৯০১	১,৩৩,০০০

"১৯০২ সন হইতে ব্রিটিশের রাজ্যসীমা বৃদ্ধির চেষ্টা অনেকটা নূতনতর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।...মহারাজা, রাজা, নিজাম এবং অন্যান্য সামন্ত শাসক এতদিন ভগবানের প্রতিভূ হইয়া রাজ্য শাসন করিতেন। এখন ভগবানের দয়া বা তাঁহার প্রতিভূত্বের স্থলে ইংলণ্ডের দয়া ও ইংরেজের প্রতিভূত্বই বড় হইয়া উঠিল।"

"...প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ ইহাদিগকে তাহার রাজ্য শাসনের জন্য একটি পরম উপযোগী যন্ত্র হিসাবে পাইয়াছিল।...আজ এই কথা বলা চলে, ভারতবর্ষে সামন্ত শাসকদের নিরঙ্কুশ শাসন একান্তভাবে ইংরেজ-সহায়তার উপর নির্ভরশীল।"

"...১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদের নবোদিত যুগসূর্য ডিস্‌রেলি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 'ভারত সাম্রাজ্ঞী' উপাধি দিতে পার্লামেণ্টকে রাজী করান। ইহাতে ইংলণ্ডের রাণী যে প্রাচ্যখণ্ডের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দেশের স্বামিনী এই বিজ্ঞাপন প্রচার ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ১৯১১ সনে রাজা জর্জ

* ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ।

ও রাণী মেরীর ভারত আগমন এবং প্রাচ্য দেশীয় অবরঙ্গজিমার সহিত উঁহাদের অভিষেক একই উদ্দেশ্য বহন করে।—তবে ইহাকে সেই উদ্দেশ্যের আরও অগ্রবর্তী অবস্থা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। এই দরবার বা সিংহাসনারোহ উৎসবে যে চক্ষু ধাঁধানো ধূমধাম করা হইয়াছিল তাহার আরও একটি সুস্পষ্ট অর্থ আছে। ইহা দ্বারা ভারতীয়দিগকে দিল্লীশ্বর মুঘলের রাজ্যাধিকার যে তখন ইংলণ্ডের হাতে চলিয়া গিয়াছে তাহা বুঝান হইয়াছিল। কিন্তু পার্লামেণ্টারী শাসনের জন্মভূমি, রাজনীতিক স্বতন্ত্রতার কেন্দ্রস্থল, ইংলণ্ডের মত দেশও যে মৃতপ্রায় প্রাচ্য স্বেচ্ছাচারের বাহ্যরূপকে আবার পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবে, ইহা ১৯১১ সনের দিল্লীর দরবারের অনেক দর্শকের নিকটই যথোচিত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।"

ইংরেজ শাসকেরা নিজেদের ভারত হিতৈষণা সম্পর্কে নিত্য যে ঢেঁড়া পিটিয়া থাকেন সে সম্পর্কে মুন বলিতেছেন—

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বড় অভিমান যে গত মহাযুদ্ধে* ভারতবর্ষ ১৫ কোটি পাউণ্ড অর্থসাহায্য করিয়াছে, ৮ লক্ষ সিপাহী যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াছে, কাজ করিবার জন্য ৪ লক্ষের অধিক মজুর দিয়াছে—এই সবই সত্য কথা, এবং খুবই উল্লেখনীয় কথা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা হইলেও একেবারে দিশাহারা হইয়া ইহাকেই শেষ কথা মনে করিলে চলিবে না—কারণ, যুদ্ধের জন্য সকল লোকই ভারতের ফৌজী জাত ও ফৌজী শ্রেণী হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল, সহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইহার সহিত কোন যোগাযোগ ছিল না,—আর যে অর্থসাহায্য, তাহাও ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী-শাসন-কবলিত ভারতবর্ষ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল, ইহা ভুলিলেও চলিবে না।"...

"তবে কিছু কিছু দেশীয় রাজা মহারাজা যে যুদ্ধব্যয়ের জন্য মুক্তহাতে দান করিয়াছিলেন, ইহাও সত্য কথা। ইহার কারণ এ. জে. ম্যাকডোনাল্ডের ভাষায় বলা যাইতে পারে, 'ইহাদের স্বেচ্ছাচারী শাসনের অস্তিত্ব যে ব্রিটিশ আধিপত্যের উপর নির্ভরশীল তাহা ইহারা অনুভব করিতে পারিত'।"

পুঁজিবাদী ব্রিটেন ভারতবর্ষকে কিভাবে শোষণ করিত তাহার বর্ণনা শেষ করিবার সময় তাহার শাসন-ব্যয় সম্পর্কে একটু আলোচনা দরকার। কারণ, পূর্বে ভারতবর্ষের সঙ্গে যখনই কোন রূপ মীমাংসার প্রশ্ন উঠিয়াছে, তখনই ইংলণ্ডের আর্থিক স্বার্থ ও দেশীয় রাজরাজড়ার রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে ইংরেজ

* প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪—১৮)।

চাকর-নোকরের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারটাও সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। ১৮৭৬ হইতে ১৯২৯ পর্যন্ত ইংরেজের শাসন-ব্যয় এদেশে কিরূপ বাড়িয়াছে তাহার তালিকা দেখুন—

সন	ফৌজ জনসংখ্যার অনুপাতে মাথা-পিছু ব্যয় (টাকার হিসাবে)	সমজে-কল্যাণ জনসংখ্যার অনুপাতে মাথা-পিছু ব্যয় (টাকার হিসাবে)
১৮৭৬	১'৮	'২
১৮৮৬	২'১	'২
১৮৯৬	২'১	'২
১৯০৬	২'৫	'৩
১৯১২	২'৫	'৬
১৯২১	৪'৫	'৫
১৯২৯	৪'২	'৮

ভারতবর্ষের শাসন ও সৈন্যবিভাগের যত বড় বড় চাকর তাহার প্রায়ই ছিল ইংরেজ; ইহা ছাড়া সৈন্যবিভাগীয় জিনিসপত্রও প্রায় সমস্তই তখন ইংলণ্ড হইতে আসিত। এই অবস্থায় শাসন-ব্যয় ব্যাপারটি যে ব্যয় হইলেও পরোক্ষে আয়, এবং কাহার আয়, কাহাদের আয়, তাহা বোঝা কঠিন নয়।

(৪) **সাম্রাজ্যবাদের কারণ ও তাহার সহায়ক**—সাম্রাজ্যবাদ যে য়ুরোপে খুব তর্কবিতর্ক ও বিচারবিবেচনার পর গৃহীত হইয়াছিল এমন নহে। নানা আর্থিক কারণ এবং তাহার সহিত সম্পর্কিত রাজনৈতিক অবস্থাবলী মিলিয়া সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়।

(ক) **যন্ত্র**—যন্ত্রের আবিষ্কারে সমাজের উৎপাদন-উদ্যোগে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছিল, আর এই বিপ্লবকে প্রথম কাজে লাগাইয়াছিল ইংলণ্ড। অন্যান্য দেশের মানুষ তখনও হাতের শ্রমেই উৎপাদনের কাজ চালাইতেছিল, কিন্তু ইংলণ্ডে বাষ্প ও যন্ত্রের উপযোগ ততদিন পুরাপুরি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই কারণে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের যে সুবিধা ছিল, তাহা আর কাহারও ছিল না। অন্যান্য রাষ্ট্রে যন্ত্রের উপযোগ আরম্ভ হইতে বহু বিলম্ব হয়—ইহার কারণ অন্যদের ইংলণ্ডের মত পুঁজি ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংলণ্ডের শিল্পোদ্যোগ সারা পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ জুড়িয়া ছিল—এই বিপুল উৎপাদন-উদ্যোগের সম্মুখে অন্যদের ছোটখাট উদ্যোগ স্বভাবতঃই

খুব নগণ্য ও নিষ্প্রভ মনে হইত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড গোটা দুনিয়ার সমগ্র লৌহ-আহরণ-কাজের অর্ধেক একাই সম্পন্ন করিত। কার্পাস-জাত যে সব পণ্য তখন তৈয়ার হইত, তাহারও সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের অর্ধেক ইংলণ্ডেই উৎপন্ন হইত। ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্য তখনই পৃথিবীর যে-কোন প্রতিদ্বন্দী রাষ্ট্রের দ্বিগুণ হইতে অধিক ছিল।—কিন্তু এই অবস্থা চিরদিন সমান রহিল না, উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বে অন্য রাষ্ট্রও মাথা তুলিল। জর্মনী, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র একে একে আসরে আসিল, য়ুরোপের অন্যান্য দেশও শিল্পোদ্যোগে মনোযোগী হইল। ইংলণ্ডের লোহার উৎপাদন তখন ধীরে ধীরে কমিয়া আসিল, শতাব্দী যাইতে না যাইতে লোহার বাজারের রাজা হইল যুক্তরাষ্ট্র। নিম্নের তালিকা হইতে ব্রিটেন, জর্মনী, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্যের কাঁচা লোহার উৎপাদন তুলনা করুন—

(লক্ষ টনের হিসাব)

সন	ব্রিটেন	যুক্তরাষ্ট্র	জর্মনী
১৮৭০	৫৯'৬০	১৬'৭০	১৩'৯০
১৮৯৬	৮৬'৬০	৮৬'২৩	৬২'৬০
১৮৯৭	৮৭'৯৬	৯৬'৫৩	৬৭'৬০
১৯০৩	৮৯'৩৫	১৮০'০৯	৯৮'৬০

অর্থাৎ, ১৮৭০ হইতে ১৯০৩ এই তেত্রিশ বৎসরে ইংলণ্ডের লৌহ উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র বাড়িয়াছে ; কিন্তু জর্মনীর উৎপাদন বাড়িয়াছে শতকরা ৬০৯ ভাগ, এবং যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৯৬৬ ভাগ।

এইভাবে কাপড়ের বাজারেও আমেরিকা আর জাপান ব্রিটেনের প্রতিদ্বন্দী হইয়া পড়ে। নিম্নের হিসাব হইতে কাপড়ের ব্যবসায়ের আনুপাতিক হ্রাস বুঝা যাইবে—

সন	ব্রিটেন	যুক্তরাষ্ট্র	য়ুরোপ
১৮৭০-	১৯	৯০	৩৩
১৮৮০—৯০	১৮	৪২	৫৩
১৮৯০—১৯০০	৬	৫০	২৫

১৮৭০ হইতে ১৯০০ অব্দ পর্যন্ত এই ত্রিশ বৎসরে ইংলণ্ড তাহার রপ্তানি বাণিজ্যেও তেমন উন্নতি করিতে পারে না। আমেরিকার রপ্তানি এই সময়ে চতুর্গুণ হয়, জর্মনীর হয় দ্বিগুণ,—কিন্তু ব্রিটেনের মাত্র ৪৫%, অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম উন্নতি ঘটে।

এতক্ষণ আমরা ব্যাপারবাণিজ্যের যে সব লক্ষণ বর্ণনা করিলাম তাহার প্রত্যক্ষ ফল দাঁড়াইল পণ্যের বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক বড় বড় রাষ্ট্রই তখন উৎপাদন বাড়াইয়া নিজ নিজ ব্যবহারের অতিরিক্ত কাপড়, লোহা ও অন্যান্য পণ্য প্রস্তুত করিতেছে। ইহাতে প্রত্যেকের নিকট অতিরিক্ত মাল যেমন জমিয়া যাইতেছে, তাহাকে বহির্বাজারে বিক্রয় করিবার তাগিদও বাড়িতেছে। কিন্তু কোন শিল্পোদ্যোগী রাষ্ট্রই তখন অন্যের উপজাত পণ্য নিজ রাষ্ট্রসীমার মধ্যে বিক্রীত হইতে দিতে চাহিতেছে না। একমাত্র ইংলণ্ড ছাড়া অন্য সকল দেশই এই অবস্থায় নিজ নিজ রাষ্ট্রসীমা ঘিরিয়া শুল্কের প্রাচীর তুলিয়া দিল—প্রতিযোগিতায় বিদেশী পণ্যের দর চড়াইয়া দিয়া তাহার বাজার মাটি করিবার ইহাই কৌশল। গৃহযুদ্ধের পর দেশের সদ্যোজাত শিল্পোদ্যোগকে রক্ষা করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক প্রবর্তন করে; তারপর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ১৮৯০ সনে, ১৮৯৩ সনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার উপর্যুপরি দুইবার তাহার শুল্কের হার আরও বাড়াইয়া দেন।

রুশদেশ আরও পূর্বে, ১৮৭৭ হইতেই বিদেশাগত পণ্যের উপর শুল্কের হার বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল। জর্মনীতে শুল্কবৃদ্ধি শুরু হইয়াছিল ১৮৭৯ সন হইতে, এবং গ্রীসে ১৮৮১ হইতে। য়ুরোপখণ্ডের অন্যান্য দেশেও তখন পূর্বেকার শুল্ক প্রাচীর আরও উঁচু করিয়া দেওয়া হইতেছে।

ফরাসী মহামন্ত্রী ফেরী ১৮৮৫ সনে এই অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"আমাদের মহাশিল্পোদ্যোগচেষ্টা আজ এমন পর্যায়ে পৌছিয়াছে যে, পণ্যের আর কোন অভাব নাই—এখন আমাদের অভাব শুধু বাজারের, নিত্য নূতন ক্রমবিস্তারশীল বাজারের,… কিন্তু ঐদিকে জর্মনী তাহার সীমা ঘিরিয়া শুল্কের দেওয়াল উঁচু করিয়া দিয়াছে—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ক্রমেই কঠিন হইতে কঠিনতর শুল্কাবরোধ সৃষ্টি করিতেছে।…"

এইরূপ ক্রমঘন অন্ধকারে পুঁজিবাদীর একমাত্র আলোকস্তম্ভ ছিল তাহার উপনিবেশ, তাহার অধিকৃত দেশসমূহ অর্থাৎ কলোনি। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ফ্রেডরিক লগার্ড ১৮৯৩ সনে তাঁহার 'পূর্ব আফ্রিকার সাম্রাজ্যের উত্থান' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন—

"আমাদের নীতি হইল মুক্ত ব্যাপারের নীতি—তাই বাজার খুঁজিয়া বাহির করা ছাড়া আমাদের উপায় নাই।…বাণিজ্য-প্রতিরোধী শুল্ক ক্রমেই

আমাদের পুরাতন বাজার বন্ধ করিয়া দিতেছে। আমাদের মালের ক্রেতা অধীন দেশগুলিও এখন আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছে।...”

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে য়ুরোপ যে সাম্রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছিল তাহার মূল কারণ অতিরিক্ত মাল বিক্রয়ের জন্য বাজার দখল করা। কিন্তু এই ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার ফলে পৃথিবীতে ছোট-বড় সাম্রাজ্যগুলি কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে নিম্নের সূচী হইতে তাহা বুঝা যাইবে *—

সাম্রাজ্য	উপনিবেশসমূহ (হাজার বর্গমাইলে)			
	আফ্রিকা	এশিয়া	প্রশান্ত সাগর	আমেরিকা
ব্রিটিশ	৪২০৩	২১৬	৩২৭৯	৪০০৮
ফরাসী	৩৭৭৩	৩১৭	১০	৩৬
পোর্তুগীজ	৯২৭	৭	২	
বেলজিয়ন	৯৩১	৭		
যুক্তরাষ্ট্র	৩৭		১২২	৭৫২
ডাচ (হল্যাণ্ড)			৭৩৪	৫৫
ইতালিয়ন	৭৮০			
স্পেনিশ	১৩২			
জাপানী		৮৩	২৮	

উপরের সূচী হইতে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের অধিকৃত উপনিবেশগুলির মোট বর্গফল যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা হইল—

সাম্রাজ্য	উপনিবেশ (বর্গফল মাইল হিসাবে)
ব্রিটিশ	১,৩৬,১৬,০০০
ফরাসী	৬৪,০০,০০০
পোর্তুগীজ	৯,৩৬,০০০
বেলজিয়ন	৯,৩৭,০০০
যুক্তরাষ্ট্র	৯,১১,০০০
ডাচ (হল্যাণ্ড)	৭,৮৯,০০০
ইতালিয়ন	৭,৮০,০০০
স্পেনিশ	১,৩২,০০০
জাপানী	১,১৪,০০০

* এই সূচী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দিনের আগেকার।

এইভাবে বাজারের খোঁজে পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় তিন কোটি বর্গ-মাইল* স্থান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপনিবেশে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন উপনিবেশের জনসংখ্যা অর্থাৎ কত মানুষ সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধার শিকার হইয়াছে তাহাও বিচার করিয়া দেখিবার মত—

সাম্রাজ্য	উপনিবেশ সমূহ (জনসংখ্যা লক্ষের অঙ্কে)			
	আফ্রিকা	এশিয়া	প্রশান্ত সাগর	আমেরিকা
ব্রিটিশ	৬৫০	৩৩৩০	৮০	১১০
ফরাসী	৩৫০	১৩০	—১০	—১০
ডাচ (হল্যাণ্ড)			৫০০	—১০
জাপানী		১৯০	৪০	
যুক্তরাষ্ট্র	১৫		১১৪	৯০
বেলজিয়ন	১১৫			
পোর্তুগীজ	৮০		—১০	—১০
ইতালিয়ন	১৯			
স্পেনিশ	১০			

উপনিবেশগুলির জনসংখ্যা একদৃষ্টিতে বুঝিবার জন্য উপরের তালিকার যোগফলটুকুও একবার দেখিয়া লওয়া দরকার—

সাম্রাজ্য	উপনিবেশে মোট জনসংখ্যা
ব্রিটিশ	৪১,৭০,০০,০০০
ফরাসী	৫,৯৯,০০,০০০
ডাচ (হল্যাণ্ড)	৫,০০,০০,০০০
জাপানী	২,৩০,০০,০০০
যুক্তরাষ্ট্র	২,২০,০০,০০০
বেলজিয়ন	১,১৫,০০,০০০
পোর্তুগীজ	৯০,০০,০০০
ইতালিয়ান	২০,০০,০০০
স্পেনিশ	১০,০০,০০০

* ২,৮৭,৪২,০০০ বর্গমাইল।

সাম্রাজ্যবিস্তারের গতি কিরূপ ছিল তাহা বুঝিবার জন্ত ইংলণ্ডের উদাহরণটিকে আমরা বিশ্লেষণ করিতে পারি। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অধিকৃত উপনিবেশের পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ বর্গমাইল এবং তাহার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ কোটি—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ মাত্র ৪০ বৎসরের মধ্যে তাহা ৯৩ লক্ষ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া বিস্তার লাভ করে এবং জনসংখ্যা তখন ৩১ কোটির মত হয়। আজ* এই অবস্থার আরও পরিবর্তন হইয়াছে, এখন ইংলণ্ডের অধিকৃত দেশের বিস্তার ১৩৬ লক্ষ বর্গমাইল, আর তাহার লোকসংখ্যা পৌনে বিয়াল্লিশ কোটিরও বেশি। এইরূপ ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবিস্তারের বিবরণীতেও দেখি—

সন	ক্ষেত্রফল (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা
১৮৬০	২,০০,০০০	৩৪,০০,০০০
১৮৮০	৭,০০,০০০	৭৫,০০,০০০
১৯০০	৩৭,০০,০০০	৫,৬৪,০০,০০০
১৯১৮-এর পর	৬৪,০০ ০০০	৫,৯০,০০,০০০

মহাযুদ্ধের পর† পরাজিত রাষ্ট্রের উপনিবেশগুলি লইয়া যে 'বাঁদর বাঁট' হইয়াছিল তাহারও বড় ভাগ পাইয়াছিল ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। ইহার কিছু পূর্বে তুর্কী-অধিকৃত দেশের মধ্যে প্যালেস্টাইন ও ইরাক ইংরেজের এবং সিরিয়া ফরাসীর অধিকারে চলিয়া গিয়াছিল। আর অন্য বাঁটোয়ার সূচী নিম্নরূপ—

আফ্রিকা

অঞ্চল	কাহার ভাগে পড়িল	ক্ষেত্রফল (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা
তোগোল্যাণ্ড	ব্রিটিশ	১২,৬০০	১,৮৫,০০০
	ফরাসী	২২,০০০	৭,৪৭,৯০০
কেমেরন	ব্রিটিশ	৩১,০০০	৫,৫০,০০০
	ফরাসী	১,৬৬,০০০	২৭,৭১,০০০
জর্মন পূর্ব আফ্রিকা	ব্রিটিশ	৩,৬৫,০০০	৪১,২৫,০০০
	বেলজিয়ন	২১,২৩৫	৩০,০০,০০০
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা		৩,২২,০০০	২২,৮০,০০০

* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের কথা। † প্রথম মহাযুদ্ধ।

(দক্ষিণ সাগর)

অঞ্চল	কাহার ভাগে পড়িল	ক্ষেত্রফল (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা
দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপ	জাপান	৮০০	৪২,০০০
নিউ গিনি	অস্ট্রেলিয়া	৮৯,০০০	৪,০০,০০০
পশ্চিম সেমোয়া	নিউজিল্যাণ্ড	১,২৫০	৩৮,০০০
নেরু দ্বীপ	ব্রিটিশ	১০	২,২০০

(খ) **যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা**—য়ুরোপীয় পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরিগ্রহ করার মধ্যে যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা একটি অন্যতম সহায়ক কারণ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে যানবাহনের খুব উন্নতি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াতপথেরও অশেষ বিস্তার ঘটে। অধিকৃত দেশের উপজ দ্রব্য, তাহার কাঁচামাল হইতে লাভবান হইতে হইলে বাষ্পীয় পোতের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়; অপরদিকে এশিয়া আফ্রিকার দূরতম অঞ্চলগুলিতে মাল ও সেনা পৌঁছাইতে হইলে রেলপথ ছাড়াও চলে না; ইহার উপর অধিকৃত দেশের সঙ্গে অধিকারী দেশের সংবাদ আদান-প্রদানের শীঘ্রতার জন্য তারের দরকার পড়ে। এই রেলইঞ্জিন, তার, বাষ্পীয় পোত সবই অবশ্য বহু পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম পাদে ইহার যেরূপ বিস্তার ঘটে পূর্বে আর কখনও তেমন হয় নাই। নিম্নের সূচী হইতে আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিব—

সন	রেলপথ (বিস্তার হাজার মাইলে)	তার (বিস্তার হাজার মাইলে)	বাষ্পপোত (জাহাজের শতকরা হারে)
১৮৫০	২৪	৫	...
১৮৭৩	...	...	২৫
১৮৮০	২২৪	৪৪০	...
১৮৯০	...	...	৫৯
১৯০০	৫০০	১১৮০	৭৭

(গ) **কাঁচামালের চাহিদা**—পৃথিবীর গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলি হইতে কাঁচামাল সংগ্রহের তাগিদ সাম্রাজ্যবাদের আর একটি সহায়ক কারণ। ভারতবর্ষ হইতে কাঁচামাল রপ্তানির পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছিল তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এক সময় লম্বা আঁশের

কার্পাসের জন্য ইংলণ্ড সম্পূর্ণতঃ আমেরিকার উপরই নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু আমেরিকা নিজ স্বতী কাপড় তৈয়ার আরম্ভ করিলে মিশরী কার্পাসের মান হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মিশরে কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছিল ৩৪৮ হাজার মণ—ইহার পঁচিশ বৎসর পরে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার পরিমাণ পূর্বেকার নয়গুণ হয়। কাঁচামালের মধ্যে রবার, কোকো, চা, চিনি, নারিকেল ইত্যাদিরও প্রচুর চাহিদা ছিল—কঙ্গো, মালয়, জাভা, সিংহল ও অন্যান্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপের পরাধীনতার ইহাই কারণ। প্রবাদ আছে, হরিণী তাহার নিজের মাংসের জন্য জগতের বৈরী হয়, সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশগুলির সম্পর্কে চিন্তা করিলে এই বৈরিতার স্বরূপ বুঝিতে পারি। ফ্রান্স যে উত্তর আফ্রিকার উপনিবেশগুলি আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে, তাহার কারণ সেখানকার খনিজাত ফসফেট; চীনের দক্ষিণ অঞ্চলের উপর অধিকার বিস্তার করিয়া রাখার কারণ সেখানকার টিন ছাড়া আর কিছু নয়; ট্রান্সভালের খনিগর্ভে যে সোনা আছে, তাহার লোভই ব্রিটিশকে সেই রাজ্যজয়ে উৎসাহী করিয়াছে। চীনের কার্পাস, লোহা ও কয়লা সাম্রাজ্যবাদী জাপানকে লুব্ধ ও হিংস্র করিয়া তুলিয়াছিল। আন্তর্জাতিক লুব্ধতার আর একটি অত্যাধুনিক বস্তু তেল। তেল কাঁচামালের বড় মাল; আধুনিক যুদ্ধে-বিগ্রহে-শিল্পে-যাতায়াতে সব কাজেই তেলের প্রয়োজন, তাই ইহা লইয়া অন্তর্রাষ্ট্রীয় ঝগড়ার অন্ত নাই; মোসেল, ইরাণ ও বর্মার তেলের খাত নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত এই লোভের নিবৃত্তি হইবে না; বিশেষত আত্মরক্ষায় অসমর্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ বলিয়া ইহারা আন্তর্জাতিক দলাদলির কেন্দ্রভূমি হইয়া থাকিবে।

(ঘ) **পুঁজির বহির্গমন**—পুঁজিবাদের একটি বিশেষ স্তরে পৌঁছিয়া পুঁজি কিভাবে বিদেশে চালান হয় তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। পুঁজির এই বহির্গমন, তাহার দেশান্তরী হওয়া, সাম্রাজ্যবাদের লক্ষণ, তাহার সহায়ক এবং অন্যতম কারণ। লেনিন সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশের পরস্পর-সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত প্রতিযোগিতায় কলোনি-ই ইজারাদারীর ভবিষ্যৎ সফলতার গ্যারান্টি।...পুঁজিবাদ যত বিকাশ লাভ করে ততই কাঁচামালের চাহিদা বাড়ে, প্রতিযোগিতা যত শক্ত হয় কাঁচামালের তালাশও তত ব্যাপক হয়, আর ততই কলোনি দখলের সংঘর্ষও প্রখর হইয়া উঠে।"

পুঁজিবাদীরা ইজারাদারী ও সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কারণ দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে, শুল্ক বাঁচান, বাজার দখল বা

কাঁচামালের উপর অধিকার, সবই কলোনি দখলের গৌণ কারণ; মুখ্য কারণ নিম্ন জাতির উপর উচ্চ জাতির যে অধিকার ও কর্তব্য, তাহা রক্ষা করা ও পালন করা। ফ্রান্সকে আফ্রিকা হইতে দাসপ্রথা দূর করিতে হইবে, ইংরেজকে ভারতে সতীদাহ নিরোধ করিতে হইবে। ভগবান যে স্বয়ং এই মহৎ কর্তব্য তাহাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী কবির অভিমত *—

"শ্বেত মানুষের দায়িত্ব লও তুলে
পাঠাও দূরে বীর ছেলেদের আজ;
নির্বাসনে সাত সাগরের কূলে—
সাধতে হবে বন্দীজনার কাজ।
থাকবে সেথা বর্ম সদাই পরা,
মানুষ হোথা অধীর ভয়ঙ্কর—
নূতন-বাঁধা ক্ষুব্ধ পশু ওরা,
আধা মানুষ আধেক বর্বর।"†

কিন্তু কিপলিঙ কবিতা লিখিয়া পুঁজিবাদী উচ্চ আদর্শের ঢেঁড়া পিটিলেও ব্যাপার অন্য রূপ। ১৯২০—২২-এর মধ্যে ইংলণ্ড ভারতের বাজারে কি পরিমাণ মাল বেচিয়াছে তাহা একবার দেখুন—

তৈয়ারী মাল	পাউণ্ডে মূল্য
সূতা, কাপড়	৫৩,৩৫,৭৭,০০০
লোহা, ইস্পাত, ইঞ্জিন, মেসিন	৩,৭৪,২৩,০০০
গাড়ী, লরী, মোটর	৪২,৭৪,০০০
কাগজ	১৮,৫৮,০০০
পিতল, কাঁসার দ্রব্য	১৮,১৩,০০০
পশমী কাপড়, পশম	১৬,[illegible]০,০০০
তামাক, সিগারেট ইত্যাদি	১০,৬০,০০০
অন্যান্য	১০,২৬,০০০
	৫৮,২৬,২৮,০০০

(অর্থাৎ প্রায় আট শত কোটি টাকা)

---

* কিপলিঙ ১৮৯৯ সনে এই কবিতা লেখেন।

† "Take up the white man's burden
Send forth the best ye breed
Go bind your sons to exile
To serve your captive's need;
To wait in havy harness
On fluttered folk and wild
Your new caught, sullen peoples
Half devil and half child."

কাঁচা ও তৈয়ারী মালের ব্যাপারী, শস্ত্রব্যবসায়ী এবং ব্যাঙ্কওয়ালা প্রত্যেকেই সাম্রাজ্যবাদী মুনাফার সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কিন্তু লুটেরা জানে, সেই লুট-করা মাল দশে মিলিয়া বাঁটিয়া খাইলে উহাতে নিরপত্তা বেশি, এবং লাভও বেশি। তাই দ্বিতীয় উইলিয়ম, দ্বিতীয় নিকোলাস বা লো বেঙ্গুলার মত রাজাদিগকে ব্যাপারীরা উহাদের কারবারে সামিল করিয়া লয়। রাজবংশীয় ডিউক এবং দেশের মন্ত্রী-মহামন্ত্রীর আত্মীয়কুটুম্বগণ সর্বদাই অধিকৃত কলোনির রেল, জাহাজ ও অন্য ব্যবসায়ে সরিক থাকে। কোন রাষ্ট্রপতির শালাসম্বন্ধী বা বন্ধুইকে মেক্সিকোর তেলের ব্যবসায়ে সামিল করিতে না পারিলে ব্যাপারীর মুনাফা সুরক্ষিত থাকে না। রাজা লো বেঙ্গুলার রাজ্যে* রোড্‌স কোম্পানীর অধিকার স্বীকার করিতে মহামন্ত্রী লর্ড সেলিসবেরী ঘোর আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু রোড্‌স যখন ফাইফও এবেরকোর্নের ডিউককে কোম্পানীর সভাপতি ও উপসভাপতি করিয়া দিলেন তখন সব চুকিয়া গেল। এই সেসিল রোড্‌স দক্ষিণ আফ্রিকার হীরার রাজা এবং ইংরেজ মহা-পুঁজিপতিদের প্রধান পাঁচজনের অন্যতম ছিলেন। এক সময় রোড্‌স পার্লামেন্টের উদারনীতিক দলের অর্থকোষে যে অমিত অর্থ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, উহার কারণ মিশরে ব্যবসায়িক নিরাপত্তা। রোড্‌স পরে আমাদের হিন্দুস্থান টাইম্‌সের মালিকদের মত একটি প্রতিষ্ঠাশালী সংবাদপত্রও খরিদ করিয়াছিলেন। ইহাতে সাধারণভাবে পুঁজিবাদের জয়গান এবং বিশেষ ভাবে রোড্‌সের প্রভু, অর্থাৎ পার্লামেন্টের ক্ষমতারূঢ় দলের স্তাবকতা চলিত। রোড্‌স হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, এবং বড় বড় গ্রন্থাগারে যে দান করেন তাহাও তাঁহার ব্যবসায়েরই অঙ্গ, উহারই বিজ্ঞাপনবাজী।

পুঁজিপতি তাহার শোষণের মহাযন্ত্রটি পরিচালনার জন্য সমাজের উচ্চস্তর হইতে বহু রকমের লোককে সামিল করিয়া লইয়াছে—

(১) সৈন্যদলের উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি, পেন্সনার প্রভৃতি পুঁজিবাদী শোষণ-ব্যবস্থায় কিভাবে সহায় হইয়াছে তাহা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। শস্ত্রব্যবসায়ীর মুনাফার জন্য সৈন্যবাহিনীর বিস্তার, সৈনিক খাতে মোটা ব্যয় এবং নিয়ত যুদ্ধাবস্থা জীয়াইয়া রাখা উহাদের সাহায্য ছাড়া হয় না।

(২) সেইরূপ বড় বড় রাজদূত, কলোনীর বড় চাকর, বড় বড় হোমরা চোমরা সকলেই নিজ স্বার্থে পুঁজিপতির অনুগত। কারণ কলোনিতে

* বর্তমানে রোডেশিয়া।